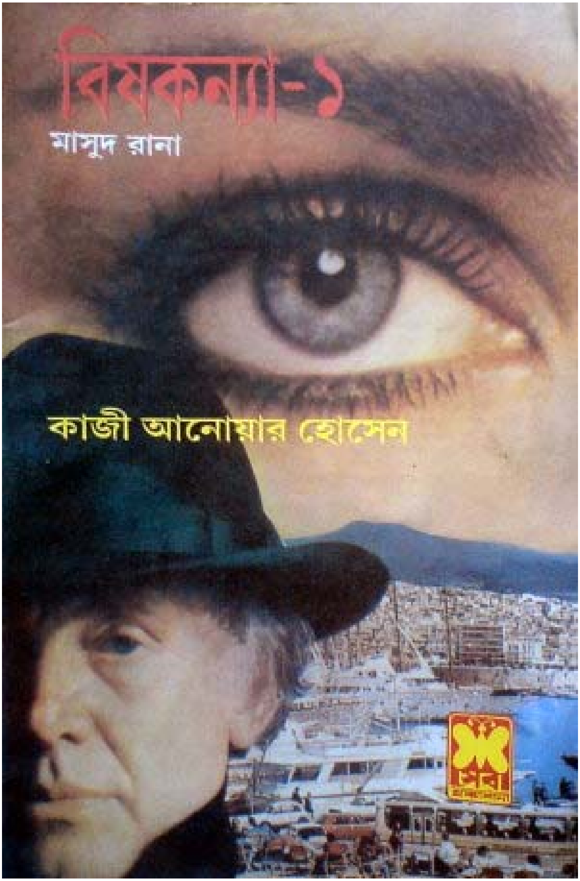
বিষকন্যা-১
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

বিষকন্যা-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

অপর গাড়িটা মার্সিডিজ, শামুকের মত ধীরগতিতে এল। গাঢ় রঙ; কালো হতে পারে, কিংবা নীল। কোস্টাল হাইওয়ে ছেড়ে সরু পথটার ওপর নামল। এদিকেই আসছে।

জলপাই ঝোপের আড়ালে রয়েছে মাসুদ রানা, আরও বড় একটা ঝোপের পিছনে রয়েছে ভাড়া করা সিমকা। দ্বিতীয় গাড়িটা ওর পিছু নিয়ে এসেছে, তা নাও হতে পারে। রোডস টাউন ছাড়ার পর সতর্ক ছিল ও, পিছনে ফেউ লাগার কোন লক্ষণ চোখে পড়েনি। ভোর রাতে রওনা হয়েছে ও, আলো ফোটার আগেই পৌঁছে গেছে নির্জন পাহাড়ে। তবু, জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে পিছু নিয়ে কেউ এসে থাকলেও, এখানে ওকে দেখতে পাবে না।

নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা, একটা চোখ থাকল গাড়িটার দিকে। সিমকা থেকে নামাল রাবারের ভেলা, ডাইভিং ইকুইপমেন্ট আর দশঘোড়ার একটা আউটবোর্ড।

মার্সিডিজ থামল না, তবে হেডলাইট নিভে গেল। দ্বীপের ওপর আকাশ প্রতি মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। এঞ্জিনের কোন শব্দ

পাচ্ছে না রানা, ভোরের পাখিরা চারদিকে কিচিরমিচির করছে।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে শ্লথ হলো মার্সিডিজের গতি। জানালাগুলোর কাঁচ আয়নার মত চকচকে, ভেতরে দৃষ্টি চলে না।

চট করে বাম দিকে একবার মুখ তুলল রানা। লাল টালির বড়সড় ভিলার কোথাও কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সিঁড়ির ধাপের মত উঠে গেছে বাগানগুলো, চওড়া একটা ধাপের ওপর তৈরি করা হয়েছে সুইমিংপুল। শেষ ধাপে ভিলাটা। রানার কাছ থেকে দুশো কি আড়াইশো গজ দূরে।

চোখ নামিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোল রানা, সাথে বোঝা থাকায় হাঁটার ভঙ্গিটা আড়ষ্ট। খানিকক্ষণ হেঁটে খোলা একটা হেডল্যান্ডে বেরিয়ে এল ও, ঈজিয়ান সাগর থেকে একশো ফুট ওপরে। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে সী গাল, বজ্রপাতের শব্দে পাথরে আছাড় খাচ্ছে একের পর এক ঢেউ। দিগন্তে এইমাত্র উঁকি দিল সূর্য, পুবের আকাশে যেন আগুন ধরে গেছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। কেউ নেই।

মার্সিডিজে করে যে-কেউ এসে থাকতে পারে। কত লোকই তো সূর্যোদয় দেখতে চায়। ভিলার কোন অতিথিও হতে পারে। সি.আই.এ. বা কে.জি.বি হওয়াও বিচিত্র নয়।

রাত শেষ হলেও, বাতাস এখনও কনকনে ঠাণ্ডা, বেদিং সুট পরে হি হি করছে রানা। ঘাস মোড়া কিনারার দিকে ঝুঁকল ও। কচি রোদ মাখা ঢালের রঙ শেয়ালের গায়ের মত লালচে। উত্তর দিকেও একটা হেডল্যান্ড দেখা গেল, সরু ও দীর্ঘ একফালি পাথুরে মাটি সাগরের ওপর গিয়ে পড়েছে। রোদ লেগে চকচক করছে ওখানে প্রাচীন একটা গ্রীক মন্দির। সাগরে, বহুদূরে, এক ঝাঁক মাছ ধরার বোট দেখা গেল, রাতের কাজ সেরে বাড়ির দিকে

ফিরছে জেলেরা। লাল, সবুজ, হলুদ আর নীল, একেকটা বোটের রঙ একেক রকম, খেলনার মত।

মেয়েটাকে প্রথমে দেখতে পায়নি রানা।

হুস করে পানির ওপর মাথা তুলল সে, তার চারপাশে নৃত্যরত সফেন সাগর ঝিকমিক করে উঠল। সরু, আধখানা চাঁদ আকৃতির সৈকতের দিকে এগোল মেয়েটা। রানার সরাসরি নিচে ওটা।

পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর উপলব্ধি করল রানা, নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে ও। আশপাশে কেউ থাকলে ধরা পড়ে যেত, চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে ওর। নারী, বিশেষ করে সুগঠিত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারিণী যুবতী, কাকে না আকর্ষণ করে। তবে নিজেকে নিয়ে রানার একটা গর্ব আছে–কোন মেয়ে, তা সে যত সুন্দরীই হোক, তার কোন বৈশিষ্ট্য ওকে বিশেষভাবে নাড়া না দিলে ওর মনোযোগ কাড়তে পারে না। তাছাড়া, মেয়েদের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে কোন সুযোগ নেয়ার মানসিকতাও ওর নেই।

এই মেয়েটার মধ্যে কি এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে এমন মুগ্ধ হয়ে গেল ও? আপনমনে হেসে ফেলল রানা, নিজের কাছে স্বীকার করল, অপূর্ব একটা শরীর ছাড়া আর কিছু ওর নজরে পড়ছে না। তবে, সেটাই যথেষ্ট। এরকম দৈহিক গঠন আগেও দু'একটা দেখেছে রানা, যার সাথে শুধু কচি পুঁই ডগার তুলনা চলে। অস্বাভাবিক লম্বা মেয়েটা, রোগা, কিন্তু কোথাও হাড় বেরিয়ে নেই। নাক-চোখ পরিষ্কার ঠাহর করা গেল না, তবে মুখের আকৃতি গ্রীক দেবীদের মত। তার নগ্ন বাহু আর পিঠ সোনালিবরণ, সেই সোনা রঙের ওপর দীর্ঘ কালো চুল সাপের মত মোচড় খাচ্ছে।

ঘাস মোড়া কিনারায় বসল রানা। কিনারা থেকে প্রথম কয়েক ফুট ঢাল প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে, খুব সতর্কতার সাথে নামতে

হবে ওকে। পা দুটো নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিল ও। এই সময়, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, চওড়া কাঁধ নিয়ে বেঁটে এক লোক হঠাৎ কোত্থেকে যেন উদয় হলো, সৈকতের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঝট করে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল, তারপর চিৎকার করে কি যেন বলল মেয়েটাকে।

পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। সে-ও পাল্টা চিৎকার করল। তার সুন্দর মুখে আড়ষ্ট একটা ভাব লক্ষ করল রানা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল গলা ফাটানোর প্রতিযোগিতা। তারপর, সম্ভবত হেরে গিয়ে, রিভলভারটা মেয়েটার দিকে তাক করল ভিলেন। আর কিছু করার না পেয়ে পায়ের কাছ থেকে একটা পাথর তুলে ছুঁড়ল রানা।

ঢালের ওপর পড়ল পাথরটা, গড়াতে গড়াতে নামছে। হকচকিয়ে মুখ তুলল লোকটা। রানাকে দেখেই ঝট করে আধপাক ঘুরে দৌড় দিল। লোকটা পালাচ্ছে, নাকি তার প্রস্থান স্রেফ অস্থিরতার প্রকাশ, ঠিক বুঝতে পারল না রানা। বড় বড় কয়েকটা পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

লাফ দিল রানা, ঢালে পড়ল, তাল সামলে নিয়ে সবেগে নিচের দিকে নামতে শুরু করল।

বুক সমান পানি থেকে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। সাঁতরাল কিছুক্ষণ, তারপর ছোট্ট একটা সমতল পাথরের গায়ে থামল। পানির ওপর মাথা তুলে রয়েছে পাথরটা, লম্বায় তিন ফুটের বেশি নয়। কিনারায় হাত রেখে লাফ দিল যুবতী, পাথরের ওপর উঠে পড়ল। রানার দিকে ফিরে দু'কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল সে। সোনালি গা থেকে পানি ঝরছে।

সৈকতে নেমে পানির দিকে এগোল রানা। শুধু শরীর বা

যৌবন নয়, মেয়েটার দাঁড়াবার আকর্ষণীয় ভঙ্গি লক্ষ করে বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করেছে ওর। অনেক কষ্টে নিজেকে সচেতন রাখল ও, পিছন থেকে বিপদ আসতে পারে।

মেয়েটা সম্পর্কে যা কিছু জানে ও, সবই ডাচ জর্জের কাছ থেকে শোনা। ছাব্বিশ বছর বয়েস, লেখাপড়া শিখেছে এথেন্স আর সুইটজারল্যান্ডে, এককালে ওদের পারিবারিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল। বাবা ছিলেন এয়ারফোর্সে, মেজর। সামরিক অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেন ভদ্রলোক, ফলে জেলখানায় নিহত হন। তাঁর সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রাণভয়ে মায়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যায় মেয়েটা, দু'বছর পর সরকারের পতন ঘটলে একাই ফিরে আসে গ্রীসে।

ডাচ জর্জের সাথে মেয়েটার পরিচয় হয়েছে বছর দু'য়েক আগে রঁদেভো ক্লাবে। ওখানে গান গায় সে।

'এদিকে কি?' সাপের মত ফোঁস করে উঠল মেয়েটা, রানাকে পানির কিনারায় পৌঁছুতে দেখে বুঝতে পারছে তার কথা শোনা যাবে। 'যাও, নিজের চরকায় তেল দাও।'

'অবলা নারীকে সাহায্য করা আমার একটা ব্রত,' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'আমার এই ব্রত থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে বিচ্যুত করতে পারেনি।' বোঝাগুলো বালির ওপর নামিয়ে রাখল রানা।

'হ্যাঁ, বলেছি বটে তোমার একটা উপকার করব, কিন্তু তারমানে এই নয় যে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার দেয়া হয়েছে তোমাকে!' জেদ আর রাগের সাথে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, ভঙ্গিটা ভারি সুন্দর লাগল রানার চোখে। কথা আর ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল ব্যাপারটা, স্বাধীনচেতা মেয়ে। 'তুমি

মাসুদ রানা, তাই না?'

'আর তুমি মিলি, তাই না? মিলি পুলটিস?' কথা শেষ করে পানিতে নামল রানা।

'দাঁড়াও ওখানে!' ঝাঁঝের সাথে বলল মিলি, তবে ঠিক নির্দেশের মত শোনাল না। সমতল পাথর থেকে নিখুঁতভাবে ডাইভ দিল সে, ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে, ডুব সাঁতার দিয়ে চলে এল সৈকতের কিনারায়।

বালির ওপর উঠে এসে আবার ঝাঁঝের সাথে বলল, 'নড়বে না!'

মিলির পরবর্তী আচরণ হতবাক করে দিল রানাকে। এত দিন ওর ধারণা ছিল, এ-ধরনের আচরণ শুধু পুরুষদেরই মানায়। রানাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল সে, চোখে তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টি, যেন অত্যন্ত দামী একটা চিত্রকর্ম নকল কিনা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। খানিকটা অস্বস্তিবোধ করল রানা, খানিকটা কৌতুক। দু'বার চক্কর দিয়ে রানার সামনে দাঁড়াল মেয়েটা। শেষ একবার চোখ বোলাল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। 'তোমার সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না,' বলল সে। 'সম্ভবত আমি একটা বোকা, কারণ তোমাকে আমার ভালমানুষ বলে মনে হচ্ছে।'

'হয়তো আমার সম্পর্কে জানার সুযোগ তোমার হবে,' বলল রানা। 'রিভলভার হাতে লোকটা কে ছিল?'

'কোস্টাস? আমার বয়ফ্রেন্ড।'

'বন্ধু? বন্ধু হলে রিভলভার বের করবে কেন? আমার তো মনে হলো, লোকটা তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল।'

খিল খিল করে হেসে উঠল মিলি। 'আরে না! এটা ওর একটা নেশা! সব সময় আমাকে খুন করার হুমকি দিচ্ছে। সত্যি কথা

বলব? ব্যাপারটা আমি দারুণ উপভোগ করি।'

'কোস্টাস অ্যারোনাফিস,' বিড় বিড় করে বলল রানা। 'সাবেক গ্রীক ডিপ্লোম্যাট? অমিশুক, ঘরকুনো কোটিপতি?' ভিলাটা তার, জানে রানা।

মাথা ঝাঁকাল মিলি। 'কোস্টাস খুব সতর্কতার সাথে বন্ধু বাছাই করে। আমাকে দেখে বুঝছ না?' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।

তার অর্ধনগ্ন শরীরটার ওপর আরেকবার চোখ না বুলিয়ে পারল না রানা। 'আর তুমি?'

চোখ নামিয়ে নিল মিলি। 'আমিও খুব খুঁতখুঁতে।' পটলচেরা কালো চোখ দুটো তুলে বড় বড় পাথরগুলোর দিকে তাকাল সে, থমথমে হয়ে উঠল চেহারা, নিচু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'কেউ যেন মনে না করে আমি তার কেনা হয়ে গেছি। আমি কোন পণ্য নই যে বিক্রি হতে পারি। এটাই বুঝতে চায় না কোস্টাস। তার অভিযোগ, এত সকালে এখানে আমি এসেছি নিশ্চয়ই কারও সাথে দেখা করতে। কি হলো, যদি এসেই থাকি?'

ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল রানার। 'আমাদের কথা জানে সে?'

'সম্ভবত আন্দাজ করে নিয়েছে...অসম্ভব ঈর্ষাকাতর লোক।' মুখ তুলল মিলি, চোখে অদ্ভুত একটা জেদ ফুটে উঠল। হঠাৎ রানার দিকে এগোল সে। 'এসো, ওর গায়ে যাতে আগুন ধরে তার ব্যবস্থা করি।' বলে হাত দুটো মেলে দিয়ে রানাকে আহ্বান জানাল।

'কি...না, মানে...ধন্যবাদ, এখন নয়,' বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে শান্ত সুরে বলল রানা। কর্মজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও, খুন লোভনীয় কোন জিনিস সাধনা ছাড়াই পাওয়া

যাচ্ছে দেখলে সতর্ক হতে হয়। লোভ, লালসা চরিতার্থ বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে ফাঁদ পাতা হলে সে-ফাঁদে রানা পা দেবে না। মিলি মেয়েটা সম্পর্কে খুব কম জানে ও, তাকে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, গাঢ় রঙের মার্সিডিজটার কথা মনে আছে ওর। ওপরে কোথাও আছে সেটা।

রানা প্রত্যাখ্যান করায় অবাক হয়ে গেল মেয়েটা। অপমান বোধ করল এক সেকেন্ড পর। ইতিমধ্যে রানার গায়ে সেঁটে এসেছে সে, ভিজে ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক। তার মুখের ভেতরটা বিড়ালের মত, ফ্যাকাসে লাল। 'কি হারাচ্ছ জানো?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল সে। জেদ আর চ্যালেঞ্জ ফুটে উঠল চেহারায়। 'নাকি অপাত্রে দান করতে চাইছি? চুমো খাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে তোমাকে আমি সম্মান দেখিয়েছি, সেটুকু বোঝার ক্ষমতাও কি তোমার নেই?'

'যদি সত্যি সম্মান দেখিয়ে থাকো, আমি কৃতজ্ঞ,' বলল রানা। 'তবে তুমি একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছ, তাই না? আমাকে তুমি ব্যবহার করতে চেয়েছ।'

'তুমি বলছ অভিনয়টা সত্যি অতটা নিখুঁত হয়েছে? এত নিখুঁত যে মুখে যা বলেছি তাই তুমি বিশ্বাস করেছ? আসলে আমি একটা অজুহাত খুঁজছিলাম। কোস্টাসকে ঈর্ষাকাতর করে তোলার জন্যে আয়োজনের দরকার হয় না, এমনিতেই সারাক্ষণ জ্বলছে সে। তাই বলে ভেবো না যে তোমাকে দেখেই আমি মজে গেছি।' হঠাৎ দুষ্ট হাসি দেখা গেল মিলির চোখে। 'তবে, মনে হলো, আমার সামনে এটা কি? জাদু, স্বপ্ন, নাকি সত্যি? তাই একটু ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল।'

'সত্যি দুঃখিত,' বলল রানা। 'কি জানো, সব জিনিসেরই

একটা সময় আছে। তোমার বন্ধু আসলে আমাকে নার্ভাস করে তুলেছে, ব্যাপারটা আমি এনজয় করব না। ভাল কথা, তুমি বা মি. অ্যারোনাফিস বোধহয় আরও কোন অতিথির অপেক্ষায় ছিলে, তাই না?'

'এত ভোরে? ধ্যেৎ!'

উদ্বিগ্ন হলো রানা, তবে চেহারায় হাসি-খুশি ভাব এনে বলল, 'যাক, আশংকামুক্ত হলাম। চলো, ভেলাটা ভাসিয়ে এখান থেকে সরে যাই।'

পনেরো মিনিট পর ছোট্ট আউটবোর্ডের এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, হাত বাড়িয়ে টোকা দিল মিলির কাঁধে। ঘাড় ফেরাল মিলি, চুলে জড়ানো কালো নেটের প্রান্ত সরাল চোখ থেকে। 'ভাল করে দেখে বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখানেই কি তুমি জলপরী মেমোটা পেয়েছিলে?'

'জলপরী?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মিলি। 'মানে?'

'তুমি পেয়েছ ওটা, তাই তোমার নামে নাম রাখা হয়েছে।'

হেসে উঠল মিলি। 'আমি জলপরী? বাহ্।' পরমুহূর্তে রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। 'কিন্তু ওটা তো শুধু একটা পাতা ছিল, লগের একটা ছেঁড়া...'

'হ্যাঁ,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু পাওয়া গেছে কয়েকশো মাইল অফ-কোর্সে।'

'এ-ব্যাপারে বিদেশী একজন লোক কেন এত আগ্রহী হতে যাবে?'

'কারণ জাহাজটায়, নেমিসিসে, একজন ভি.আই.পি. ছিলেন।'

'কে?' খোলামেলা কৌতূহল নিয়ে রানার দিকে তাকাল মিলি। তার কালো বেদিং সুটের ওপরের অংশটা দিয়ে খুব বেশি হলে

একজোড়া বড় আকারের চোখ ঢাকা যাবে, তার বেশি ঢাকতে গেলে টান পড়বে কাপড়ে।

অনেক কষ্টে সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে আনল রানা, আপনমনে মাথা নাড়ল একবার, তারপর বলল, 'প্রয়োজনের বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

'ভি.আই.পি. ভদ্রলোকের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? কেন ভাবছ, এ-সব আমার জানার প্রয়োজন নেই? গ্রীক সরকার কেন তদন্ত করছে না?'

'আপাতত তোমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'তুমি ডাচ জর্জকে চেনো, তাকে বিশ্বাস করো, কাজেই তার পাঠানো লোককেও তোমার বিশ্বাস করতে হবে।'

চেহারায় প্রতিবাদ নিয়ে রানার দিকে দ্রুত তাকাল মিলি, কিন্তু কি মনে করে কিছু বলল না। দু'বার ঠোঁট কামড়াল সে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড়প্রাচীরের দিকে তাকাল।

ঘন সবুজ ঝোপ, সার সার পামগাছ আর বাঁশঝাড়গুলো চিহ্নিত করছে কোস্টাস অ্যারোনাফিসের ভিলাটা। মিলির দৃষ্টি সরে গেল বামের হেডল্যান্ডের দিকে, সেখান থেকে বিধ্বস্ত মন্দিরটার ওপর স্রেফ পাথরের একটা স্তূপ আর সোনালি দুটো স্তম্ভ, মনে করিয়ে দেয় ট্রোজান ওঅর-এর কথা। 'আমি ডাইভ দিচ্ছিলাম,' বলল মিলি। 'দিনের ঠিক এই সময়টায়। হ্যাঁ, এই সেই জায়গা।'

রানার চোখের কোণে হঠাৎ কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠল, যেন বহুদূরে কাঁচের ওপর রোদ লেগেছে। এয়ার-ট্যাংকের হারনেস গলায় পরার সময় কাঁধ ঝাঁকাল ও, বলল, 'তোমার মনে হয়, মি. অ্যারোনাফিস তাকিয়ে আছেন এদিকে?'

‘কে গ্রাহ্য করে?’

‘কেউ নিশ্চয়ই করে।’

‘তাহলে আমার বোধহয় বিবস্ত্র হওয়া উচিত।’

‘তা হতে অল্পই তো বাকি।’

‘বাকিটুকু সরিয়ে নিলে কানা হয়ে যাবে ওরা।’

‘কিংবা ওদের হার্ট অ্যাটাক করবে।’

নিচের ঠোঁটের প্রান্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল মিলি, হাসছে সে। কিন্তু রানা হাসতে পারল না। চারদিকে বৈরী সাগর ফুঁসছে, বিপুল জলরাশির মাঝখানে নগ্ন লাগছে নিজেকে ওর। আন্দাজ করল, বন্দুকের গুলি ওর নাগাল পাবে না। তবে অস্ত্রটা যদি হাই-পাওয়ারড, স্কোপ-সাইটেড হান্টিং রাইফেল হয় তাহলে কি ঘটবে বলা যায় না।

আউটবোর্ডের কিনারা থেকে পানিতে নামল রানা।

‘বী কেয়ারফুল,’ সতর্ক করল মিলি।

‘আমাকে ফেলে পালিয়ে যেয়ো না,’ বলল রানা। ‘আউটবোর্ডটা ব্যবহার করো, তা না হলে স্রোতের টানে পজিশন থেকে সরে যাবে।’

‘পালিয়ে যাব?’ হেসে উঠল মিলি। ‘সে চেষ্টা সাধারণত তোমরাই করো, অন্তত আমার কাছ থেকে।’

‘আমরা?’

‘পুরুষরা।’

চল্লিশ ফুট নিচে পাথুরে সাগরতল, ঢাকা পড়ে আছে ঝাঁক ঝাঁক মাছের তৈরি রঙচঙে পর্দায়। সাগরের তলাটা রানার ডানদিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, আলোহীন বিশাল একটা গহ্বর যেন

হাঁ করে আছে ওদিকে, দশ হাজার ফুট গভীর। শীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে স্রোতের চাপ ভৌতিক স্পর্শের মত লাগল। সবুজাভ আলোয় আগুপিছু করল রানা। ঠিক জানা নেই। কি পাবে বলে আশা করছে ও। কে জানে আদৌ কিছু পাবে কিনা। রহস্যময় লগের আরও দু'একটা পাতা, প্রবালের সাথে আটকে আছে? উল্টে থাকা কোন কার্গো? নেমিসিস জাহাজটার কাত হয়ে থাকা খোল...?

আধ ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দেয়ার অবস্থা হলো রানার। ডান দিকে বিশাল গহ্বর থেকে উঠে আসা কনকনে ঠাণ্ডা কাঁপুনি ধরিয়ে দিল শরীরে। ক্লান্ত হবার সাথে সাথে স্রোতের চাপ আরও বেড়েছে, গভীর সাগরে তলিয়ে যাওয়া ঠেকাবার জন্যে প্রতি মুহূর্তে লড়তে হচ্ছে ওকে। ফিরে আসবে, এই সময় দেখতে পেল ব্যারেলটা।

পাথুরে ঢালের ওপর, বড় আকারের একজোড়া বোল্ডারের মাঝখানে পড়ে রয়েছে ওটা। সামুদ্রিক আগাছা প্রায় ঢেকে রেখেছে বলে এতক্ষণ চোখে পড়েনি। ঢাকনিটা খুলে গেছে, তবে পুরোপুরি নয়। স্রোতের ছায়াগুলো বিবর্ণ সাগরতলের গায়ে ধূসর বেগুনি, তার মাঝখানে ব্যারেলের আধখোলা মুখটা ঠিক যেন হাঙ্গরের বীভৎস হাসি হাসছে।

তির্যক একটা পথ ধরে নামছে রানা, ওর ব্রিদিং অ্যাপারেটাস হিসহিস করে উঠল। দূর থেকে ভেসে আসা আউটবোর্ডের ভোঁতা ভট ভট শব্দ শুনতে পেল ও। সাগরের উঁচু-নিচু মেঝেতে ধাক্কা খেয়ে আরও জোরাল হয়ে উঠেছে স্রোত, রানার দিকে ধেয়ে এল অকস্মাৎ উথলে ওঠা একটা নদীর মত। স্রোতের চাপে সামুদ্রিক আগাছাগুলো মেঝেতে সেঁটে গেছে। কালো লতাগুলো কিলবিল করছে সাপের মত। ব্যারেলটা ধরে স্রোতের বিরুদ্ধে সিধে হয়ে

দাঁড়াল রানা, টর্চ জ্বেলে ভেতরে আলো ফেলল। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মিহি হলুদ একটা পদার্থ। তার নিচে বালি, স্টীল কন্টেইনারটা যেন পলিমাটি দিয়ে ভরা হয়েছে।

ঢাকনিটা ধরে অনেক টানাটানি করল রানা, কিন্তু সবটুকু খুলতে পারল না।

ওয়াটারপ্রুফ ক্রোনোমিটার চেক করল ও। পিঠে আটকানো ট্যাংকে আর দশ মিনিটের বাতাস আছে।

ঢাকনি খুলতে না পেরে পিছিয়ে এল রানা, ব্যারেলের গায়ে কিছু লেখা আছে কিনা পরীক্ষা করল। এই সময় পানিতে ঠিক শব্দ নয়, মৃদু একটা কাঁপন অনুভব করল ও। গুরুত্ব দিল না। দেখল, ব্যারেলের গায়ে কোন লেখা বা মার্কিং নেই। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ব্যারেলের ভেতর একটা হাত ঢোকাল।

কাদার মত জিনিসটা, ঘন ও কোমল। হাতটা বের করে আনার পর আঙুলে লেগে থাকল হলুদ মাখনের মত।

কাঁপনটা ইতিমধ্যে আরও বেড়েছে। এবার ওটাকে একটা শব্দ বলে চিনতে পারল রানা। হলুদ পদার্থটা দুই আঙুলের মাঝখানে নিয়ে ঘষল ও। মনের কোণে একটা উদ্বেগ মাথাচাড়া দিতে শুরু করল। পানির স্রোতে পরিষ্কার হয়ে গেল হাতটা। শব্দটা বাড়ছে।

হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠল রানা। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে সৈকতের দিকে তাকাল ও। কানে এখন ভারি লাগছে শব্দটা, চিনতেও অসুবিধে হচ্ছে না। বোট প্রপেলারের আওয়াজ।

এক মুহূর্ত পর কালো খোলটা দেখতে পেল রানা। বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। সোজা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে জাহাজটা।

সাগরের নিচে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা। জাহাজটাকে চিনতে পারার পর হঠা ঝপাৎ করে শব্দ হলো পানিতে। মুখ তুলে

দেখল এক রাশ বুদ্বুদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে মিলির আকৃতিটা। তার মুখ যেন আতঙ্কে বিকৃত একটা মুখোশ, ধেয়ে আসা জাহাজের পথ থেকে সরে আসার জন্যে এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে সে।

কিন্তু পালাবার কোন পথ খোলা নেই। চেহারায় নগ্ন বিস্ময় আর হতাশা নিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা, এখনও মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। কালো হয়ে গেল মাথার ওপরটা, জাহাজের খোলে ঢাকা পড়ে গেল আলোকিত আকাশের আভাটুকু। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা, ফুটবলের মত ঘন ঘন বাড়ি খেলো পাথুরে মেঝেতে। মৃত্যু ভয় জাগল মনে, সেই সাথে তীব্র হয়ে উঠল বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। পানির এলোমেলা স্রোত নির্দয় শত্রুর মত ওকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে, দিক্‌ভ্রান্ত ও আচ্ছন্ন বোধ করল রানা, তা সত্ত্বেও ব্রিদিং-মাউথপীসটা হাত দিয়ে দুই চোয়ালের মাঝখানে আটকে রাখার বুদ্ধিটা লোপ পেল না। চারদিকের পানি ঘোলা হয়ে গেল, তবে আবছাভাবে আশপাশটা চেনা যাচ্ছে এখনও।

ওর চারপাশে চিক চিক করছে বালি আর পলিমাটি। ঝাঁক ঝাঁক বুদ্বুদ্ বেরিয়ে আসছে বিধ্বস্ত ভেলাটা থেকে, বিশাল কালো গহ্বরটার দিকে ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে গেল সেটা। কাছাকাছি মাকড়সার জালের মত মিলির কালো চুল, কিছু একটা ধরার জন্যে ঘন ঘন হাত বাড়াচ্ছে সে, মুঠোর ভেতর কিছুই পাচ্ছে না।

ডুবে যাচ্ছে মেয়েটা।

প্রশ্নটা আপন অস্তিত্ব রক্ষার, ভাল-মন্দ দিকগুলো এক নিমেষে উপলব্ধি করল রানা। বিপদে পড়লে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতে

নেই। তীর থেকে অনেক দূরে রয়েছে ওরা, কাছে পিঠে ভাসমান বস্তু বলতে ছিল শুধু ভেলাটা, বাঁচতে হলে সাঁতার কেটে সৈকতে পৌঁছুতে হবে। মাছ ধরার বোটগুলো এখান থেকে অনেক দূরে, দুর্ঘটনা বা হামলাটা চাক্ষুষ করেনি জেলেরা। ভেলাটাকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের পথে চলে গেছে জাহাজটাও, পানিতে এখন আর প্রপেলারের কোন কম্পনও নেই। আতঙ্কে অস্থির একটা মানুষ, বিশেষ করে একটা মেয়ে, সাঁতার কেটে সৈকতে পৌঁছুতে পারবে না। তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করা মানে, সহজ হিসেবেই, নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া। তাছাড়া, আরও চিন্তা করল রানা, আজই মাত্র খানিক আগে পরিচয় হয়েছে মেয়েটার সাথে, তার প্রতি ওর কোন দুর্বলতা নেই। বুদ্ধিমানের কাজ হবে পানির ওপর উঠে সাহায্য পাওয়া যায় কিনা দেখা, তারপর সৈকতের দিকে এগোনো। মাথা ঠাণ্ডা রাখলে, স্রোতের সাহায্য পেলে, এ-যাত্রায় নিজের চেষ্টায় বেঁচেও যেতে পারে ও।

পরিস্থিতির বাস্তবতা কেন জানি অগ্রাহ্য করল রানা। সাগরের মেঝেতে পায়ের ধাক্কা দিয়ে মিলির পাশে চলে এল ও। মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে নিজের মাউথপীসটা খুলে গুঁজে দিল মেয়েটার দুই ঠোঁটের মাঝখানে।

ঘসা কাঁচের মত পানির সারফেসটাকে হাজার মাইল দূরে বলে মনে হলো। পায়ে লম্বা ফিন না থাকলে পানির ওপর মাথা তোলা সম্ভব হত না। বাতাসে মুখ তোলার সাথে সাথে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল আটকে রাখা নিঃশ্বাস। নিজেকে এক মুহূর্ত সময় দিল না রানা, বাতিল ডাইভিং ইকুইপমেন্ট গা থেকে খুলে ফেলে দিল। রানাকে খামচে ধরল মিলি, নরম আর মাংসল একজোড়া ঊরু পেঁচিয়ে ধরল রানাকে। দু'জন একসাথে ডুবছে।

আবার পানির নিচে নেমে এল ওরা। কনুই আর হাঁটু চালিয়ে নিজেকে ছাড়াল রানা। স্রোতের টানে সরে যাচ্ছে মিলি, দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তার চুল ধরে ফেলল ও। তারপর টেনে তুলল পানির ওপর।

কাশতে কাশতে মাথা তুলল মিলি, পানির ওপর গড়ান দিল দু'বার, আবার হাত বাড়াল রানাকে খামচে ধরার জন্যে। দ্রুত তার নাগালের বাইরে সরে এল রানা। 'পিঠের ওপর ভাসো,' চিৎকার করল ও।

'আমাকে ফেলে যেয়ো না!' বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে মিলি, গলার স্বরে করুণ আর্তি। 'আমাকে বাঁচাও!'

'কথা বললে হাঁপিয়ে যাবে,' বলল রানা, দেখল ওর কথামত পানির ওপর পিঠ দিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে সে।

বেদিং সুটের ওপরের অংশ, ব্রেসিয়ারটা, হারিয়েছে মিলি। দূরে তাকিয়ে কালো জাহাজটা দেখতে পেল রানা। অনেক দূরে চলে গেছে, ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই। ওটার পিছনের অংশ তীক্ষ্ণ, রেখাগুলো সরু দেখে রানার ধারণা হলো, কারও ব্যক্তিগত মোটর ইয়ট হবে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কুয়াশার ভেতর ঝাপসা হতে হতে হারিয়ে গেল জাহাজটা।

এবার সবুজ পাহাড় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বীপটার দিকে তাকাল রানা। বিস্ফোরিত ঢেউয়ের জলকণাগুলো দ্বীপের নিচের দিকটাকে অস্পষ্ট করে রেখেছে। বিপদের গুরুত্ব আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছে রানা, পানিতে ওঠার পর চাক্ষুষ করল সেটা–স্রোতের তীব্র টান গভীর সাগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে। সৈকত আর ওদের মাঝখানে ক্রমশ, প্রতি মুহূর্তে চওড়া হচ্ছে সাগর।

সময় বয়ে চলল। সেই সাথে পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। স্রোতের

টান বাড়ছে আরও। আগের চেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে ঢেউগুলোকে সামলানো। একের পর এক ঢেউয়ের মাথায় উঠছে ওরা, কোন কোন ঢেউ ওদেরকে চাপা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, বা ওদের ওপর ভেঙে পড়ছে।

পানির সাথে যুদ্ধ না করে শুধু ভেসে থাকার চেষ্টা করছে রানা। প্রায় ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে যাবার পর মনে মনে স্বীকার করল, বাঁচার আশা নিতান্তই ক্ষীণ। অবশ্য ওর পেশায় পুঁজি বলতে ক্ষীণ আশাকেই বোঝায়। তবে, মেয়েটাকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে বিরতিহীন চেষ্টা করতে হচ্ছে বলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে রানা। ও যদি একা হত, আরও আশাবাদী হওয়ার যুক্তি ছিল।

ধীরে ধীরে আড়ষ্ট হয়ে এল হাত আর পায়ের পেশী। লোনা পানিতে চোখ জ্বালা করছে, মাঝে-মধ্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চিন্তা-ভাবনা। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ, কত হাজার হাজার লোক ডুবে মরেছে এই সাগরে। ওদের নিচে পানির গভীরতা দশ নাকি বিশ হাজার ফুট?

ছোট ছোট, সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলছে মিলি। কথা বললে শক্তি নষ্ট হবে, রানার নির্দেশ মত তাই চুপ করে আছে সে। তবে রানা কি ভাবছে আন্দাজ করতে পারল। বলল, ‘এ আমি জানতাম, নিজের প্রাপ্যটুকু মানুষ পায় না…’

‘কথা নয়!’ সাথে সাথে বাধা দিল রানা।

কিন্তু থামল না মিলি, ‘প্রাচীন দেবতারা আজও অলিম্পিয়ায় আছেন, তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো। তাঁরা সবাই নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি আর রেষারেষি নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের কথা ভাবার সময় কোথায়!’

কয়েক সেকেন্ড পর, আকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে, পানির নিচে তলিয়ে গেল মিলি।

ধরার জন্যে তাড়াতাড়ি হাত বাড়াল রানা। শরীরের আড়ষ্ট ভাব হতভম্ব করে দিল ওকে। হাত বা পা ওর নির্দেশ মানতে অস্বাভাবিক দেরি করছে। মনের জোর খাটাতে চেষ্টা করল রানা, হাতটাকে লম্বা করে দিল, আর তাতেই ফুরিয়ে গেল অবশিষ্ট শক্তিটুকু।

অবিশ্বাস্য লাগল রানার। হঠাৎ একি হলো!

শেষবার দূরে তাকাবার চেষ্টা করল ও। তীর বহুদূরে, দেখা যায় কি যায় না। মনে পড়ল, লন্ডনে ছিল ও, ঢাকা থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয় ওর সাথে। একে একে সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

তারপর পানির তলায় নেমে গেল মাথাটা।

দুই

বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে নির্দেশ পেল মাসুদ রানা।

'এম.আর. নাইন?'

'বলছি,' লন্ডন থেকে কথা বলছে রানা।

‘হেডকোয়ার্টার ডি.। অলিম্পিক এয়ারওয়েজের পাঁচশো তেইশ নম্বর ফ্লাইটে আপনার জন্যে একটা সীট রিজার্ভ করা হয়েছে।’

‘শালার মাথা খারাপ’ বলে চেঁচিয়ে ওঠার ঝোঁকটা দমন করল রানা। অপর প্রান্তে বন্ধুবর সোহেল আহমেদ থাকলেও, আন্ত র্জাতিক লাইনে এমন কিছু বলা উচিত নয় যার দরুন ওদের পরিচয় বা সম্পর্ক ফাঁস হয়ে যেতে পারে। ‘কেউ নিশ্চয়ই গুলিয়ে ফেলেছে,’ বলল ও। ‘আমার জানা মতে, অলিম্পিকের কোন ফ্লাইট আদ্দিস আবাবায় যায় না।’

‘এথেন্সে যায়,’ বলল সোহেল।

এবার শুধু বিরক্ত নয়, মনে মনে রেগে গেল রানা, শুকনো গলায় বলল, ‘তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, আমাকে কিছু না জানিয়েই বদল করা হয়েছে প্ল্যান?’

‘মেজর জেনারেল রাশেদুল হাসান আপাতত সামলে নিয়েছেন পরিস্থিতি, অস্ত্র চোরাচালানীরা তাদের ট্রাক বহর নিয়ে সীমান্ত পেরোবার চেষ্টা বাদ দিয়েছে। ইথিওপিয়ায় এই মুহূর্তে আপনার না গেলেও চলবে।’

অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আদ্দিস আবাবায় যাবার জন্যে দু'হপ্তা ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছে রানা। মুহূর্তের নোটিসে মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলতে হলো ওকে, গ্রীস সম্পর্কে যা কিছু জানে স্মরণ করার চেষ্টা করল। ‘কখন ছাড়বে আমার প্লেন?’ জানতে চাইল ও।

‘আপনার হাতে সময় আছে,’ অপরপ্রান্তে বিরতি নিল সোহেল, সম্ভবত হাতঘড়ি দেখছে, ‘ঠিক সাঁইত্রিশ মিনিট।’

‘ইমার্জেন্সী মনে হচ্ছে?’

‘জেড ক্লিয়ার‍্যান্স দেয়া হয়েছে আপনাকে, এম.আর.নাইন।

এথেন্সে আপনাকে ব্রিফ করবে চন্দন সরকার।’

গভীর কোন চিন্তায় বা সংকটে পড়লে প্রায়ই যেমন হয়, রানার চোখের কালো অংশটুকু আরও গাঢ় হয়ে উঠল। ব্যাকব্রাশ করা কালো চুলে আঙুল চালাল ও। জেড ক্লিয়ার‍্যান্স মানে হলো, যে-কোন দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা আছে, আত্মরক্ষার জন্যে যে-কোন ব্যবস্থা নিতে পারে রানা—এমনকি সন্দেহবশত খুন করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে ওকে। এই অনুমতি কখনোই লিখিতভাবে দেয়া হয় না। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর মাত্র তিনজন এজেন্ট কালেভদ্রে এই অনুমতি পায়, তাদের মধ্যে রানা একজন। জেড ক্লিয়ার‍্যান্স-এর আরেকটা অর্থ হলো, কোন অবস্থাতেই ধরা পড়া চলবে না। এই অনুমতি একজন এজেন্টকে আইনের ঊর্ধ্বে তুলে দেয়।

দশমিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল রানা।

দক্ষিণ এথেন্সের এলিনিকন এয়ারপোর্ট, রাত ন’টার খানিক আগে পুব টার্মিনালের কাছাকাছি ল্যান্ড করল প্লেনটা। আরোহীদের সাথে নেমে এল প্রায় ছ’ফুট লম্বা সুদর্শন এক যুবক। লাগেজগুলো লকারে জমা রেখে কিছু টাকা ভাঙাল সে, ডলারের বিনিময়ে নিল ড্রাকমা। পেশায় এসপিওনাজ এজেন্ট, মুহূর্তের নোটিসে কোত্থেকে কোথায় ছুটতে হয় তার ঠিক নেই, তাই সাথে সব সময় মার্কিন ডলার রাখে সে।

টার্মিনাল ভবন থেকে বেরোবার সময় চোখ-কান খোলা রাখল যুবক। চারদিকে প্রচুর লোকজন। কেউ লাগেজ নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে, একদল লোক বুকস্টলে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ছে, আবার কেউ লাউঞ্জের সোফায় বসে অলসভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে।

অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যুবকের দিকে। তাকাল, কিন্তু চিনতে পারল কি, ইউরোপিয়ান পোশাক পরা এই স্মার্ট যুবকটি আসলে জীবনানন্দ দাশ আর জসিম উদ্দিনের রোদনক্লিষ্ট বাংলা মায়ের এক দামাল সন্তান। চিরতরুণ মাসুদ রানা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে। বুক ভরা দেশপ্রেম আর গোটা অস্তিত্ব জুড়ে রোমাঞ্চের নেশা, তারই সংক্ষিপ্ত নাম এম.আর.নাইন। সর্বগ্রাসী হতাশার অন্ধকারে রানা যেন একটা আশার শিখা।

গোটা সমাজ যখন বিশৃংখলার শিকার, নৈতিকতা যখন পদদলিত, দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে দেশ, তখনও কিছু মানুষ লোভ আর পাপের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে পারেন, তারই জলজ্যান্ত একটা দৃষ্টান্ত মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফসল। সারা দেশে তল্লাশী চালিয়ে মেধা আর প্রতিভা খুঁজে বের করেন তিনি, নিজের হাতে গড়ে তোলেন সৎ ও নির্ভীক বি.সি.আই. এজেন্ট।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও দরিদ্র হলেও, তার শত্রুর কোন অভাব নেই। বাংলাদেশের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র কোথায় না চলছে। সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে সুযোগ্য বি.সি.আই. এজেন্টরা। মেজর মাসুদ রানা তাদেরই একজন।

দুনিয়ার যে-কোন দেশে, যে-কোন পরিবেশে নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে রানা। প্রায় এক ডজন ভাষায় চমৎকার দখল রয়েছে ওর। লোলচর্মসর্বস্ব অথর্ব বুড়ো, জাপানী যুবরাজ বা শ্বেতাঙ্গ মাস্তান সাজা ওর জন্যে কোন সমস্যা নয়,

ছদ্মবেশ ধারণের সমস্ত কৌশল ওর জানা। সব ক'টা মহাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় থাকায় যে-কোন জনগোষ্ঠির সাথে অনায়াসে এক হয়ে মিশে যেতে পারে ও।

এথেন্সের জরাজীর্ণ সিনটাগমা স্কয়্যারে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা। রাস্তার ওপারে হেলেনিক পার্লামেন্ট বিল্ডিং, এক সময়কার রয়্যাল প্যালেস। অজ্ঞাতনামা সৈনিকদের সমাধির চারপাশে পাহারায় রয়েছে গার্ডরা, মাথায় ঐতিহ্যবাহী ফেজ, পরনে কড়া ভাঁজের স্কার্ট, জুতো আর পোশাকের অনেক জায়গায় রঙিন সুতো আর পালক দিয়ে তৈরি অলংকার। চারপাশে দেশী-বিদেশী প্রচুর দর্শক ভিড় জমিয়েছে, কিন্তু গার্ডদের চোখে পলক পড়ছে না, অনড়-অটল দাঁড়িয়ে আছে তারা, ভাবলেশহীন চেহারা।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল রানা। শান্ত, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চৌরাস্তাটা দেখে নিল একবার।

সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। ওর সম্ভাব্য শত্রুদের গতিবিধি বিবেচনার মধ্যে রেখে হেডকোয়ার্টার ঢাকার অত্যাধুনিক কম্পিউটার জানিয়ে দিয়েছে, রাস্তায় বেরিয়ে নিরাপদ চারদেয়ালের ভেতর ফেরত আসার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ, যদি পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকতে পারে ও। সিকিউরিটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার সময় বলেছে, রানা যে আজও বেঁচে আছে সেটাই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

চারপাশটা দেখে নিয়ে স্বস্তিবোধ করল রানা। কেউ পিছু নিয়েছে বলে মনে হলো না।

নিউজস্ট্যান্ডের লাগোয়া বুদ থেকে চন্দন সরকারকে ফোন করল ও। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিপলু মোসাড এজেন্টদের হাতে খুন হবার পর এথেন্স কন্ট্রোল হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে চন্দন সরকার।

এর আগে তার সাথে মাত্র একবার দেখা হয়েছে রানার।

'আপনাকে কিছু জানানো হয়েছে, মাসুদ ভাই?' প্রশ্ন করল চন্দন।

'না।'

'দেখা-সাক্ষাতের সময়টা একটু পিছিয়ে দেয়া হয়েছে,' বলল চন্দন। 'সবাই নির্দিষ্ট সময়ে এক জায়গায় জড়ো হতে পারবে না জানতে পেরে...'

তার সব কথা শুনল না রানা, পাল্টা কিছু বললও না। বুদের বাইরে লোকজনের গতিবিধি লক্ষ করছে ও। ফুটপাতের কিনারা ঘেঁষে একটা গাড়ি থামল, ভেতরটা অন্ধকার, কিন্তু কেউ নামল না। বুদের দু'পাশে দোকানদাররা অ্যাথেনার প্লাস্টিক মূর্তি থেকে শুরু করে তেলে ভাজা পিঠা, লাইটার, ট্র্যানজিসটর রেডিও ইত্যাদি বিক্রি করছে।

'মাসুদ ভাই, আপনি বরং আমার বাড়িতে চলে আসুন। প্রীতি বলছে, ডিনারটা আপনি আমাদের সাথে খাবেন।'

'ধন্যবাদ, চন্দন। না।'

'না কেন, মাসুদ ভাই? হাতে তো অনেক সময়। অ্যাক্রোপলিস-এ আরেক পার্টির সাথে আমাদের দেখা হবে রাত এগারোটায়। অ্যাক্রোপলিস খোলা থাকে মাঝরাত পর্যন্ত। আজ চাঁদ থাকবে, কাজেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারব আমরা। মাঝখানের সময়টা আপনি...'

'আমি এখানেই অপেক্ষা করব,' শান্তসুরে বলল রানা, আউটডোর কাফেতে বসা ট্যুরিস্টদের ওপর চোখ বোলাচ্ছে ও। লোকজনের ভিড় থাকায় জায়গাটাকে নিরাপদ বলে মনে হলো ওর। প্রতিপক্ষ, তাদের পরিচয় যা-ই হোক, এত সাক্ষী রেখে

কোন ঘটনা ঘটাতে সাহস পাবে না। অন্ধকার গাড়িটা থেকে জড়াজড়ি করে নামল একজোড়া ছেলেমেয়ে, চুমো খাচ্ছে।

হতাশ সুরে চন্দন বলল, 'তাহলে আমিই আসছি। মিটিং শুরু হবার আগে আপনার সাথে কথা হওয়া দরকার।'

'বেশ,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

চৌরাস্তার এক ধার দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

গাছপালা আর আলোকিত কৃত্রিম ঝর্নার মাঝখানে রাস্তা ও ফুটপাত। মৃদুমন্দ বাতাস থাকলেও বেশ গরম লাগছে ওর। ঝর্না থেকে ভেসে আসা পাউডারের মত পানির কণাগুলো ঠোঁটে আর মুখে শীতল পরশ বুলিয়ে দিল। বগলের নিচে .৩৮ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা না থাকলে জ্যাকেটের বোতামগুলো খুলতে পারত ও। ওর মুখের সামনে, প্রায় হামলা করার ভঙ্গিতে, পাঁচ-সাতটা চকচকে ছোরা নাচাল এক ফেরিওয়ালা। মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল ও, 'লাগবে না!'

ফুটপাতের ওপর নেমে এসেছে অনেক রেস্তোরাঁ, খানিক ঘোরাঘুরি করার পর খালি একটা টেবিলে বসল রানা। হোটেলের প্রবেশপথে ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে বারবণিতারা, খোলা দরজা থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের নধর নগ্ন পা।

আশপাশের টেবিলে সবাই মদ নিয়ে বসেছে। কফির অর্ডার দিল রানা। প্রয়োজনের চেয়ে এক মুহূর্ত বেশি তাকিয়ে থাকল ওয়েটার ওর দিকে, তবে কোন মন্তব্য বা প্রশ্ন করল না। পর পর দু'কাপ কফি শেষ করল রানা, চন্দন পৌঁছুল পৌনে এক ঘণ্টা পর। মনে মনে একটা ব্যাখ্যা আশা করছে রানা। এত দেরি হলো কেন?

রানার মতই ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল তার, গোঁফ জোড়া

লালচে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো এত উজ্জ্বল যে মনে হয় সব সময় হাসছে। আচরণ ও চেহারা, দুটোই কোমল, কিন্তু প্রয়োজনে নির্দয় কঠোর হয়ে উঠতে জানে। ধূসর সুট আর সাদা শার্ট পরে এসেছে সে, টাইটা নীলচে কালো। গ্রীকদের মতই ঢক ঢক করে মদ খেতে অভ্যস্ত চন্দন, কিন্তু এই মুহূর্তে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে সে-ও। রানার সামনে মদ তো দূরের কথা, সিগারেটও খায় না।

আশপাশের টেবিল আর লোকজনের ওপর চোখ রেখে কথা বলল রানা, 'সাথে কোন ছায়া নিয়ে আসোনি তো? ভাল করে দেখেছ?'

বিনয় আর শ্রদ্ধার সাথে জবাব দিল চন্দন, 'দেখেছি, মাসুদ ভাই। কেউ ফলো করেনি। দেরি হওয়ার জন্যে দুঃখিত। প্ল্যানটা আবার বদল করতে হয়েছে।' রুমাল দিয়ে হাতের তালু মুছল সে। 'মিটিঙের সময় প্রথমে পিছিয়ে দিতে চাইছিল ওরা, এখন তাড়াহুড়ো করছে।'

'আমি তৈরি,' বলল রানা। 'অ্যাক্রোপলিস বেশি দূরে নয়, হেঁটেই যেতে পারি আমরা।'

'হাতে খানিকটা সময় আছে। মাসুদ ভাই, আপনি নিকোলাই প্যাসিমভ-এর নাম শুনেছেন?'

রানার চোখ দুটো ছোট হলো। 'রুশ ভিন্নমতাবলম্বীদের নেতা?'

'জ্বী।'

'নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর পণ্ডিত। পঞ্চাশ বা একান্ন বছর বয়স। চিরকুমার। সাদা পতাকা নামে একটা বিজ্ঞান গবেষক সমিতির চেয়ারম্যান। সর্বশেষ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গবেষণার কাজে ও সামরিক ব্যবহারে সমিতির বিজ্ঞানীরা হাই-এনার্জি,

সাবঅ্যাটোমিক পার্টিকেলস-এর সফল প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছেন। অসংখ্য কাজে লাগবে এই আবিষ্কার। এ-ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ এগোতে পারেনি। নিকোলাই প্যাসিমভকে অনেক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। নোবেল প্রাইজের জন্যেও মনোনয়ন দান করা হয়েছে তাকে। কিন্তু তারপর…'

'তারপরই সব এলোমেলো হয়ে যায়,' বলল চন্দন। 'তিনি মনে করলেন, বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে কথা বলার অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু রাজনীতিকরা তাঁকে মুখ খুলতে দিতে রাজি হলেন না।'

'শুনেছি, তাঁর কথা হলো, বিজ্ঞানকে শুধু শান্তির কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই নীতি প্রচারের জন্যে ইউরোপ যেতে চেয়েছিলেন তিনি। আমেরিকা তাঁকে লোভ দেখিয়ে দলে ভিড়িয়ে নিতে পারে, এই ভয়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁকে দেশ ত্যাগের অনুমতি দেয়নি। তাছাড়া, রাশিয়ায় তাঁর ভালই দিন কাটছে বলে শুনেছি। নতুন কি ঘটল?'

'তিনি বেরিয়ে আসছেন,' বলল চন্দন।

'তাঁকে নিশ্চয়ই বহিষ্কার করা হয়নি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল চন্দন। 'রাষ্ট্রীয় অনেক গোপন রহস্য জানেন তিনি, রাশিয়ানরা তাঁকে বহিষ্কার করার কথা ভাবতেই পারে না।'

'তারমানে কি, তিনি স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করছেন? পালিয়ে আসছেন রাশিয়া থেকে?' কঠোর হলো রানার চেহারা। 'তা যদি হয়, তাঁকে সাহায্য করার মানে দাঁড়াবে পশ্চিমাদের সাহায্য করা। নীতিগতভাবে আমরা তা করতে পারি না।'

'ব্যাপারটা সে-পর্যায়ে নেই, মাসুদ ভাই,' শান্তসুরে বলল চন্দন। 'বেরিয়ে আসার জন্যে তাঁর কোন সাহায্য দরকার নেই,

কারণ এরই মধ্যে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। শুধু...'

'শুধু কি?' বিরক্তি ও অস্বস্তিবোধ করছে রানা।

'দুঃখিত। ঠিক আছে।' দু'হাত এক করে ঘষল চন্দন, দ্রুত চারপাশে চোখ বোলাল। 'তিনি হারিয়ে গেছেন, মাসুদ ভাই। কেউ জানে না কোথায় আছেন তিনি বা কি ঘটেছে তাঁর কপালে।'

'মানে?'

'একটা ফ্রেইটার-এ ছিলেন তিনি। জাহাজটার নাম নেমিসিস, মালিক একজন গ্রীক। জাহাজটা ওডেসায় থাকতে চুপিসারে তাতে ওঠেন তিনি। পুরো জাহাজটাই নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'কিন্তু আমরা কেন মাথা ঘামাচ্ছি?' চাপা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'আমাদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে, মাসুদ ভাই,' বলল চন্দন।

'কারা সাহায্য চেয়েছে?' জানতে চাইল রানা। 'কে.জি.বি.?'

'একা শুধু কে.জি.বি. নয়,' বলল চন্দন। 'সাহায্য চেয়েছে সি.আই.এ-ও। তবে বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার কে.জি.বি. বা সি.আই.এ. সম্পর্কে ততটা ভাবছে না। ভাবছে হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস-এর আবেদন সম্পর্কে। নিকোলাই প্যাসিমভকে খুঁজে বের করার জন্যে তারা আমাদের সাহায্য চেয়েছে। হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস সম্পর্কে জানেন আপনি, মাসুদ ভাই? ওটা একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন।'

ওয়েটারকে ডেকে নিজের জন্যে ওয়াইনের অর্ডার দিল রানা। সব কথা পরিষ্কার করে বলছে না চন্দন, কিংবা হয়তো ভেবেছে কিছু ব্যাপার পরে ব্যাখ্যা করবে। সি.আই.এ-র কথা আলাদা, কিন্তু হেডকোয়ার্টার কে.জি.বি-র আবেদনে সাড়া দেয়ার কথা ভাবছে না কেন? হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস-এর কথা শুনেছে

রানা। আন্তর্জাতিক একটা সংস্থা, দাতাদের চাঁদায় কাজ চালায়। মানবাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে কাজ করছে। ইউরোপ ও তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশে ওদের শাখা আছে। গত বছর চিলিতে একটা আন্দোলন গড়ে তোলে এইচআরসি, ফলে চিলি সরকার বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। 'আমার ধারণা ছিল,' বলল রানা, 'ওরা শুধু তৃতীয় বিশ্বেই কাজ করে। আমেরিকা বা ইউরোপের সাথে রাশিয়ার উত্তেজনা বাড়ে, এমন কিছুতে নাক গলাতে গেল কেন? আমি ধরেই নিচ্ছি, ওদের প্ররোচনাতেই রাশিয়া ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন নিকোলাই প্যাসিমভ।'

'হ্যাঁ, ওরা সাহায্য করেছে।'

'আমরা যখন জানি, ধরে নিতে হয় রাশিয়ানরাও জানে,' বলল রানা।

'ধরে নিতে হয়,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল চন্দন।

'হারিয়ে গেছেন ভদ্রলোক? হারিয়ে গেছেন, সেই সাথে হাসির খোরাক হয়েছেন,' রাগের সাথে বলল রানা। 'সি.আই.এ. কি বলতে চায়?' জানতে চাইল ও।

'স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটার পর প্রকাশ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইছে না সি.আই.এ,' বলল চন্দন।

'ভাব দেখাচ্ছে, নিকোলাই প্যাসিমভের ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আগ্রহ নেই। সরাসরি নাক গলাতে পারছে না, তাই তারা প্রস্তাব পাঠিয়েছে ঢাকায়–বাংলাদেশকে গার্মেন্টস-এর কোটা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে কংগ্রেসকে অনুরোধ করবে তারা, বিনিময়ে নিকোলাই প্যাসিমভকে বি.সি.আই. তুলে দেবে তাদের মনোনীত এজেন্টের হাতে।'

'নিশ্চয়ই খুব কড়া ভাষায়...'

'তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে,' বলল চন্দন।

'তারমানে অবশ্য এই নয় যে মাঠ থেকে সরে যাবে ওরা,' চিন্তিতসুরে বলল রানা।

'না, তা যাবে না,' বলল চন্দন। 'এই অ্যাসাইনমেন্টে ওদেরকে আপনি শত্রুর তালিকায় রাখতে পারেন।'

'সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে কে.জি.বি-ও,' বলল রানা। 'এ-ব্যাপারে আমরা কিভাবে সাড়া দিচ্ছি?'

'কে.জি.বি-র প্রস্তাবটাকেও ঢাকা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি,' বলল চন্দন।

'কেন?'

'ঢাকার ধারণা হয়েছে, কে.জি.বি. আবেদন না জানালে ব্যাপারটা উদ্ভট লাগত, তাই আবেদন জানানো হয়েছে।'

'এরকম ধারণা কেন হলো?'

'দুটো কারণে,' বলল চন্দন। 'নিকোলাই প্যাসিমভ কোথায় ছিলেন, কেন পালালেন, কিভাবে পালালেন, এ-সব ব্যাপারে তারা কোন তথ্য দিতে পারেনি, বা দিতে চায়নি। আরেকটা ব্যাপার হলো, বি.সি.আই-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সহযোগিতা করার জন্যে কে.জি.বি-র তরফ থেকে তারা নির্বাচিত করেছে কর্নেল রুস্তমভকে।'

জেড ক্লিয়ার‍্যান্স দেয়ার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কর্নেল রুস্তমভ, রানার ব্যক্তিগত শত্রু। এমনকি রানা যখন বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে রাশিয়াকে সাহায্য করতে গেছে, তখনও লোকটা ওকে সহ্য করতে পারেনি। তার ধারণা, রানা আসলে আমেরিকান চর। সেনাবাহিনীর লোক সে, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ছিল, পরে

কে.জি.বি-তে যোগ দেয়। রানার সাথে কয়েকবারই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে তার, প্রতিবারই অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে রানা। শেষবার রানাকে হুমকি দিয়েছিল সে, মাটির বুকে রুস্তমভ আর রানা দু'জন একসাথে বসবাস করতে পারবে না, একজনকে বিদায় নিতে হবে। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে, ওদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি। রানার প্রতি তার অকারণ বিদ্বেষ সম্পর্কে জানতে পেরে কে.জি.বি-কে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল বি.সি.আই, ভবিষ্যতে কোন সহযোগিতা দরকার হলে তারা যেন কর্নেল রুস্তমভকে প্রতিনিধিদলে স্থান না দেয়।

দেখা যাচ্ছে, বি.সি.আই-এর অনুরোধ কে.জি.বি. কানে তোলেনি।

কেন? কারণটা কি? তারমানে কি নিকোলাই প্যাসিমভকে খুঁজে পাবার জন্যে আসলে বি.সি.আই-এর সাহায্য দরকার নেই কে. জি.বি-র?

পরিস্থিতিটা জটিল লাগল রানার। চিন্তা-ভাবনা করছে, তবু লক্ষ করল লটারির টিকেট নিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে এক লোক। হাত নেড়ে তাকে তফাতে থাকার ইঙ্গিত দিল ও। নিকোলাই প্যাসিমভ রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসে ভাল করেছেন কি খারাপ করেছেন সেটা বিচার করা ওর দায়িত্ব নয়। তবে ভদ্রলোকের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাঁকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিলে, শেষ পর্যন্ত মানবকল্যাণের জন্যে সেটা ক্ষতিকরই হবে। বি.সি.আই. তা ঘটতে দিতে পারে না। অন্তত সে-ধরনের কিছু যাতে না ঘটে তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে রানা। ভদ্রলোককে সাহায্য করতে হলে আগে জানতে হবে, কোথায় আছেন তিনি।

ইতোমধ্যে আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ। মাউন্ট লাইসাবেটাস-এর চূড়াটা পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার লোভে চৌরাস্তায় ট্যুরিস্টদের ভিড় আরও বেড়েছে। চারদিকে শোরগোল।

চন্দন বলল, 'এইচআরসি-র কাজে নাক না গলালেও, নেমিসিস-এর ওপর নজর রাখছিল সি.আই.এ.। জাহাজটা গ্রীক জলসীমায় আসার পর গ্রীক ইন্টেলিজেন্স-এর সাহায্য চায় ওরা। সব ঠিকই ছিল, কিন্তু করিন্থ ক্যানেল-এ জাহাজটা পৌঁছুল না। আগাম কোন লক্ষণ প্রকাশ না করে অদৃশ্য হয়ে গেছে নেমিসিস।'

'যতটুকু শুনেছি, নিকোলাই প্যাসিমভ শুধু দেশপ্রেমিক নন,' বলল রানা, 'কমিউনিজমের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা রয়েছে। কোন কারণে তিনি যদি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেও থাকেন, পশ্চিমাজগতের সাথে তিনি সহযোগিতা করতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না। এইচআরসি তাঁকে কোথায় নিয়ে রাখতে চায়, জানো?'

'সম্ভবত সুইডেনে,' বলল চন্দন। 'আপনার অ্যাসাইনমেন্ট হলো, ভদ্রলোককে খুঁজে বের করে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বি.সি.আই. সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরিস্থিতি অনুকূল বলে মনে না হলে তাঁকে আমরা কে.জি.বি-র হাতেও তুলে দেব না, সি.আই.এ-র হাতে তো নয়ই। আরেকটা কথা, মাসুদ ভাই–হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হয়েছে, সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি। এমন কি এইচআরসি-র আবেদনও আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।'

'রুস্তমভকে যতটুকু চিনি আমি,' বলল রানা, 'কথা না শুনলে নিকোলাই প্যাসিমভকে মেরে ফেলতে পারে সে।'

'ভদ্রলোককে বাঁচানোর আশা একেবারে যে নেই তা নয়,' বলল চন্দন। 'জলপরী নামে একটা মেমো এসেছে আমাদের

হাতে। অ্যাক্রোপলিসে গিয়ে আলোচনা হবে। চলুন, ওঠা যাক।'

'আমি তোমার পিছু নেব,' বলল রানা।

'জ্বী, সাবধানের মার নেই।'

সার সার এয়ারলাইন্স অফিস আর চোখ-ঝলসানো দোকানপাট পিছনে রেখে আমেরিকান এক্সপ্রেস-এর কাছাকাছি চলে এল ওরা, ব্যাংকটার পাশের একটা গলি ধরে উঠল মেট্রোপলিয়স স্ট্রীটে, রানার বিশগজ সামনে রয়েছে চন্দন। ক্যাথেড্রালটা পেরিয়ে এসেই বাঁক নিয়ে মিনিসিকলিয়স স্ট্রীটে ঢুকল সে। রাস্তাটা অত্যন্ত সরু, যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। এটা ধরে বোহেমিয়ান প্লাকা ডিস্ট্রিক্টে অর্থাৎ এথেন্সের সবচেয়ে পুরানো এলাকায় যাওয়া যায়। প্লাকা ডিস্ট্রিক্ট আর অ্যাক্রোপলিসের মাঝখানে অনেকগুলো মন্দির রয়েছে। খানিক পর পর তাঁবু আকৃতির রেস্তোরাঁ, ভেতরটা পাহাড়ী গুহার মত দেখতে, কান-ফাটানো মার্কিন পপ সঙ্গীত ভেসে আসছে বাইরে। কয়লা আর ঝলসানো অক্টোপাসের গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। আঙুর গাছের পর্দা দিয়ে ঘেরা কিছু টেরেস দেখা গেল, ওগুলোও রেস্তোরাঁ। অনেক বাড়ির খোলা ছাদেও চেয়ার-টেবিল ফেলে ব্যবসাটা জমিয়ে তোলা হয়েছে। এথেন্সবাসীদের একটা অভ্যেস, অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে, খাওয়ার ঝামেলা সারবে বাইরে। ফেরিওয়ালাদের জ্বালায় ফুটপাত ধরে হাঁটা মুশকিল। এত লোক, এত ব্যস্ততা, তবু শহরটা অত্যন্ত পরিষ্কার। গোটা পরিবেশে একটা উৎসব উৎসব ভাব রয়েছে। সুদর্শন যুবকরা ঘুরঘুর করছে নিঃসঙ্গ যুবতীর খোঁজে।

ভিড়ের ভেতর একটা ছায়ার মত এগোল রানা। সিনটাগমা স্কয়্যার থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে ওদেরকে।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে চন্দনের কাছাকাছি চলে এল রানা, আঙুলের টোকা দিয়ে খুচরো একটা পয়সা ছুঁড়ে মারল তার পিঠে। চোখাচোখি হতে পিছন দিকে ইঙ্গিত করল ও।

ছোট্ট এক রেস্তোরাঁর দিকে এগোল চন্দন, জানালায় সাঁটা মেন্যু পড়ার ভান করল। দরজার পাশে ঝলসানো হচ্ছে আস্ত ভেড়া, মশলার ঝাঁঝ জিভে পানি এনে দিল। চন্দনের পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

'ও কিছু না, মাসুদ ভাই,' বলল চন্দন। 'ও আমাদের আবুল খায়ের, দূতাবাসের সিকিউরিটি অফিসার।'

মেন্যুর দিকে চোখ তুলল রানা। 'এখানে কি করছে ও?'

'আমিই বলেছিলাম, আমাদের পিছনে যেন নজর রাখে।'

'সবাইকে জানান দিয়ে কাজটা করছে ও।'

'সামনে আরও দু'জন আছে,' বলল চন্দন। 'ভিড়ের ওপর নজর রাখছে।'

'কি ব্যাপার, এ তো দেখছি গোলাপ শাহ মাজারে সমাবেশ!'

হাসল চন্দন, তবে গলার সুরটা থমথমে, 'এইচআরসি কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন রকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না, হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ।'

'মিটিংটা তাহলে তাঁদের সাথে?'

মাথা ঝাঁকাল চন্দন। 'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেসে আমাদের চীফের অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন, মাসুদ ভাই। তাঁদের কারও কোন ক্ষতি হলে আমার ক্যারিয়ার শেষ।'

বেশ খানিকক্ষণ পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। ঠোঙা ভর্তি কাবাব না কি যেন কিনেছে আবুল খায়ের, একটা অ্যান্টিক স্টোর-এর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ নাড়ছে

আর পথচারী মেয়েদের নিতম্ব দেখছে। দোকানের শোকেসে সাজানো রয়েছে রাজ্যের ছুরি আর কাঁচি। রানা সিদ্ধান্ত নিল, আবুলকে চন্দনের দরকার মনে হয়ে থাকলে, ওরা দু'জন একসাথে থাকুক। 'এখান থেকে তুমি আমার পিছু নাও,' বলল ও, শহরটা ওর অপরিচিত নয়।

দুই প্রস্থ চওড়া পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল রানা, ডানদিকে ঘুরে একটা রাস্তায় পড়তেই প্রাচীন থিয়েটারটা দেখা গেল। একশো ষাট খ্রিস্টাব্দে হেরোড অ্যাটিকাস তাঁর স্ত্রী রেজিলার স্মরণে নির্মাণ করেছিলেন এটা। অ্যাক্রোপলিস প্রবেশ পথের নিচে অনেক ট্যাক্সি আর ট্যুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা। চাকা লাগানো রিফ্রেশমেন্ট স্ট্যান্ট আর স্যুভেনির বুদগুলো চারপাশের পরিবেশে একটা মেলার ভাব এনে দিয়েছে। চন্দনের জন্যে অপেক্ষা করল রানা। দু'জন একসাথে প্রপাইলিয়ার ভেতর দিয়ে ঢুকল, অ্যাথেনা নাইক-এর মন্দির ডানে রেখে।

অনুসরণরত ছায়ামূর্তিদের উদ্দেশে একজন ট্যুর গাইড অনর্গল কথা বলছে ফ্রেঞ্চ ভাষায়, মেয়েটার শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরে পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমি নেই। 'সংরক্ষণের স্বার্থে অনেক কিছু মেরামত করতে হয়েছে এখানে। প্রপাইলিয়া, বা মিছিল নিয়ে প্রবেশ করা পথটা খুলে দেয়া হয় খ্রিস্টপূর্ব চারশো বিরাশি সালে, ষোলোশো ছাপান্ন সাল পর্যন্ত খোলা ছিল। কিন্তু তারপর, দিমিত্রিওস-এর ছোট্ট চার্চ আর অ্যাক্রোপলিস-এর গোড়া লক্ষ্য করে কামান দাগলেন তুর্কী গভর্নর, কারণ উৎসবের শোরগোল তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। কামানের গোলা সম্ভবত প্রপাইলিয়ায় আঘাত করে, যদিও কিংবদন্তী হলো, সাধু নাকি জিয়াস-এর কাছে আবেদন জানান, প্রতিশোধ হিসেবে

বজ্রাঘাত করা হোক। তবে তুর্কীরা যে প্রপাইলিয়ায় তাদের গোলা-বারুদ রেখেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে-কোন কারণেই হোক সেখানে আগুন ধরে যায়।' সরে যাচ্ছে রানা, শুনতে পেল মেয়েটা আরও বলছে, 'আঠারোশো সাতষট্টি সালে অ্যাথেনা নাইক-এর ছোট মন্দিরটা ভেঙে ফেলে তুর্কীরা, একটা কামান বসানোর জায়গা করার জন্যে।'

অ্যাক্রোপলিস বা নগরদুর্গের বিশাল পাথুরে শরীরে অসংখ্য দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। চারদিকের মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মন্দিরের ভাঙা মার্বেল। বিভিন্ন ভাষার বিস্ময়সূচক ধ্বনি শোনা গেল। চাঁদের আলোয় পথ দেখে কয়েকশো লোক এগিয়ে চলেছে। এদিকে আলোর কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি, সিগারেটের আগুন আর নিষিদ্ধ ঘোষিত ক্যামেরার ফ্ল্যাশ দেখা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে।

দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দন, ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে বলল, 'মাসুদ ভাই, আবুলকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

'প্রশ্ন হলো, সে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে কিনা,' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা।

'চলুন, সামনে এগোনো যাক।'

ধোঁয়াটে চাঁদের আলোয় পার্থেননের ছাল ওঠা স্তম্ভগুলো বিশাল এক একটা দৈত্যের মত লাগল। পাথর কেটে তৈরি করা কিছু কিছু নকশা আজও অক্ষত রয়েছে। গোটা ভবনটা আড়াই হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

ওকে একটা পাঁচিলের কাছে টেনে নিয়ে এল চন্দন, ওপারে এথেন্স নগরী দেখা যায়—সেই লাইসাবেটাস পর্যন্ত শহরটা যেন আলো ঝলমলে একটা চাদর। এখানে অপেক্ষা করছেন এক

ভদ্রলোক, চন্দন পরিচয় করিয়ে দিল। ভদ্রলোকের নাম সোরেৎসেন বারকেইনহেইমার। এইচআরসি-র বর্তমান এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। ভদ্রলোক অস্বাভাবিক লম্বা, তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকাতে হলো রানাকে। চওড়া কাঠামো শরীরের, অ্যাথলেটিক, ষাট-পয়ঁষট্টি বছর বয়সেও তরবারির মত খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন।

নামটা আগেও শুনেছে রানা। সোরেৎসেন বারকেইনহেইমার সোনার চামচ মুখে নিয়ে সুইডেনে জন্মেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে শত বছরের পুরানো একটা স্টীল মিলের মালিক তিনি। কোন কালেই পেশাদার রাজনীতিক ছিলেন না, তবে ব্যক্তিগত যোগাযোগের কল্যাণে মন্ত্রীসভার সদস্য বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তা হবার সবিনয় প্রস্তাব দেয়া হয় তাঁকে। ইতিমধ্যে দু'বার তিনি মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছেন, বছর তিনেক জাতিসংঘে সুইডেনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, পরে বিশ্বব্যাংকের অন্যতম কর্মকর্তা হন। ভদ্রলোকের হাবভাবের মধ্যে রাজকীয় একটা ভঙ্গি আছে, যেন তাঁর অঙ্গুলিহেলনে সবাই নাচবে।

'মি. জর্জকে দেখছি না যে?' পরিচয় পর্ব সেরে জিজ্ঞেস করল চন্দন।

'সম্ভবত কাউন্টেস সেলিনাভানটিনোস তাকে আটকে রেখেছেন,' বললেন বারকেইনহেইমার, তাঁর ইংরেজি নির্ভুল। 'দোরগোড়ায় এত কথা বলতে পারেন ভদ্রমহিলা, বিশেষ করে কেউ যখন তাঁর পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে! মাঝরাতের আগে তো বিদায় নেয়ার সাহসই পায় না কেউ। তবে এ-ও সত্যি যে ভদ্রমহিলা পুরুষদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টিতে দারুণ দক্ষ—যদি বুঝে থাকেন ঠিক কি বলতে চাইছি—অনেকেরই চলে আসতে ইচ্ছে করে

না।' চাঁদের আলোয় তাঁর দীর্ঘ ঠোঁটে হাসি ভৌতিক লাগল রানার।

চন্দনের দিকে তাকাল ও।

হাসল চন্দন। বারকেইনহেইমারকে বলল ও, 'তাকে বাদ দিয়ে আমরা যদি শুরু করি, ব্যাপারটা কেমন হবে?'

'সেটাই ভাল হবে,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' তাড়াতাড়ি বললেন সোরেৎসেন বারকেইনহেইমার। 'বেশ তো। মি. রানা, আশা করি আপনি আমাদের সংস্থার লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত আছেন?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

একটা আঙুল খাড়া করলেন বারকেইনহেইমার, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন, 'যে সরকার তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। চলতি বছর আমরা নজর দিয়েছি সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে...'

'চলতি বছর?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আর গত বছর?'

'চিলি। উগান্ডা।'

'আগামী বছর?'

চট করে একবার চন্দনের দিকে তাকালেন বারকেইনহেইমার। রানার হাবভাব ও কণ্ঠস্বর অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে চন্দনকে। 'যেখানে আমাদেরকে ডাকা হবে,' বললেন এইচআরসি কর্মকর্তা।

চন্দনের দু'জন সিকিউরিটি এজেন্ট কয়েক ফুট দূরে হাঁটাহাঁটি করছে, ট্যুরিস্টরা কেউ তিন জনের ছোট্ট দলটার কাছাকাছি চলে এলে তাদের সাথে মিশে যাচ্ছে দ্রুত। আবুল খায়ের কোথায় থাকতে পারে ভেবে পেল না রানা। 'রাশিয়ান ভিন্নমতাবলম্বী

নিকোলাই প্যাসিমভ সম্পর্কে বলুন,' তাগাদা দিল ও।

'ইয়েস, ওহ্ ইয়েস!' মাথা ঝাঁকালেন বারকেইনহেইমার। 'মি. প্যাসিমভ যে-কোন মুহূর্তে গ্রেফতার হতে যাচ্ছিলেন। আমরা যে মানবাধিকার রক্ষায় আন্তরিক, সেটা শুধু কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করার এই একটা সুযোগ পাওয়া গেছে।'

'কিন্তু শুরুতেই ব্যাপারটা কেঁচে গেল, তাই না?'

উত্তর এল ওর পিছন দিক থেকে, নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর, লোকটা যেন একঘেয়েমিতে ভুগছে, 'তাই কি? তবে, তা যদি হয়ও, যদি ব্যাপারটা কেঁচেও গিয়ে থাকে, এখন আর তাতে কিছু আসে যায় না। মি. মাসুদ রানার আকৃতি নিয়ে পৌঁছে গেছে ত্রাণকর্তা। সব যে আবার ঠিক হয়ে যাবে, এ-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

ঝট করে আধপাক ঘুরে ডাচ জর্জকে দেখতে পেল রানা, সাথে চন্দনের একজন সিকিউরিটি এজেন্ট রয়েছে। লোকটা কথা বলল সামান্য চড়া গলায়। মদ খেয়েছে কিনা সন্দেহ হলো রানার। লম্বা সিগারেটে দীর্ঘ টান পড়ায় আলোকিত হয়ে উঠল ডাচ জর্জের চেহারা। সরু, লম্বাটে মুখ। সরু গোঁফ, যেন পেন্সিল দিয়ে আঁকা। ভারি, ঢুলুঢুলু চোখ, ভুরু জোড়ার একটা সামান্য উঁচু হয়ে আছে। তার মুখের তীক্ষ্ণ হাড়গুলো চেহারায় বাজপাখির মত একটা ভাব এনে দিয়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, অস্বাভাবিক লম্বা, কাঁধের দু'দিকে এমনভাবে ফুলেফেঁপে আছে ঠিক যেন পাখির একজোড়া ডানা। তবে করমর্দনের সময় টের পেল রানা, লোকটার মুঠোয় জোর আছে।

ডাচ জর্জ সম্পর্কেও কিছু তথ্য জানা আছে রানার। যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার

অভিযোগে তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে সুইডেনে আশ্রয় নেয় সে। ডাচ জর্জ যুদ্ধবিরোধী মনোভাব পোষণ করলে কি হবে, তাদের পারিবারিক কেমিকেল কোম্পানী রাসায়নিক মারণাস্ত্র তৈরি করে।

'মি. জর্জ এইচআরসি-র ভূমধ্যসাগর এলাকার কোঅর্ডিনেটর,' বললেন বারকেইনহেইমার।

'প্যাসিমভের ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক,' বলল রানা। 'ভদ্রলোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল।'

'প্লিজ!' রানার সামনে একটা হাত তুলে নাড়ল ডাচ জর্জ, ঘন ঘন কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রুত জায়গা বদল করার একটা অভ্যেস রয়েছে তার, যেন প্রাণশক্তি ধরে রাখতে পারছে না। 'প্লিজ, ভাই! তার সম্পর্কে পাস্ট টেন্স-এ কথা বোলো না! পুঁজি হিসেবে সময় আর টাকা খাটাবার পর সেটা জলে গেছে, এ আমি ভাবতে পারি না। মি. প্যাসিমভের জন্যে দুটোই ইনভেস্ট করেছি আমরা।'

বারকেইনহেইমার বললেন, 'আমাদের তরফ থেকে অপারেশন-এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মি. জর্জকে।'

জর্জ বলল, 'আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে ভদ্রলোককে সাফল্যের সাথে নেমিসিসে তুলে দেয়া হয়।'

'কি করে জানলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রেডিও মেসেজ থেকে,' বলল জর্জ। 'পাঠিয়েছে এডওয়ার্ড গ্রীন। গ্রীন আমাদের অপারেটর। জাহাজেই থাকার কথা তার। মেসেজটা অবশ্যই কোড করা ছিল।'

'তা জেনে আর লাভ কি,' বলল রানা, 'জাহাজটাই যখন গায়েব হয়ে গেছে।'

'তুমি হতাশাবাদী, এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?' বিস্ময়

প্রকাশ করল জর্জ।

'আশাবাদী হওয়ার কারণ দেখাও,' আহ্বান জানাল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, সিগারেটের ছাই ঝেড়ে জায়গা বদল করল ডাচ জর্জ। 'দায়িত্বটা তো তোমার, তুমি আমাদেরকে আশার আলো দেখাবে,' বলল সে। 'আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে, বি.সি.আই. তার সেরা এজেন্টকে পাঠাচ্ছে...'

তাকে বাধা দিল চন্দন, 'জলপরী মেমোর কথাটা বলতে দিন আমাকে, মি. জর্জ। মাসুদ ভাই, ওটা নেমিসিস লগ-এর একটা পাতা। স্রোতের সাথে ভেসে রোডস আইল্যান্ডে চলে আসে।' বিরতি নিয়ে দ্রুত শ্বাস টানল সে। কৃষ্ণ সাগর থেকে ইটালি যাওয়ার কথা নেমিসিসের, রোডস-এর ত্রিসীমানায় ওটার আসার কথা নয়। তারমানে নিশ্চয়ই ওটার দিক পরিবর্তন করা হয়েছে। লগটা জাহাজ থেকে ফেলে দিয়ে থাকতে পারে, দিক বদলানোর ব্যাপারটা গোপন করার জন্যে ওটার বদলে জাল লগ ব্যবহার করা হয়েছে।'

'পেল কে?' জানতে চাইল রানা।

'পুল...হ্যাঁ, পুলটিস। মিলি পুলটিস নামে একটা মেয়ে।'

'কে সে? কি জানো তার সম্পর্কে?'

'খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। তার সম্পর্কে মি. জর্জ আপনাকে সব বলবেন, মাসুদ ভাই,' দ্রুত বলে যাচ্ছে চন্দন। 'জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ভেবে পাতাটা পুলিসের হাতে তুলে দেয় মিলি। পুলিস বিভাগে গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের লোক আছে, তারা জিনিসটার গুরুত্ব বুঝতে পারে। এইচআরসি-র তরফ থেকে আগেই গ্রীক ইন্টেলিজেন্সকে নেমিসিস রহস্য সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। লগের পাতা পাওয়া গেছে শুনে এইচআরসি আবার

আমাদের সাথে যোগাযোগ করে, আমরা যোগাযোগ করি গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের সাথে।'

'বুঝলাম, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেসের সমস্যা এখন আমাদের ঘাড়ে,' মন্তব্য করল রানা।

মুখ হাঁড়ি করে ডাচ জর্জ বলল, 'দেখো, ব্যাপারটা তোমরা এভাবে না দেখে...'

রানা তাকে থামিয়ে দিল, 'লগের পাতায় কি আছে?'

'রুটিন এন্ট্রি,' বলল চন্দন। 'তবে যেদিন ওটা পাওয়া গেছে তার আগের দিনের জাহাজের পজিশন সম্পর্কে একটা নোট আছে। পজিশনটা হলো, দ্বীপটার আটান্ন নটিক্যাল মাইল উত্তর।'

আধো অন্ধকার রাত ভেদ করে দূরে চলে গেল রানার দৃষ্টি, পশ্চিম দিকের পাথুরে পাহাড়টার ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। ওই পাহাড়টার ওপর, জানে ও, প্রাচীন গ্রীসের সবচেয়ে বড় আদালতের অধিবেশন বসত। ওখানে দাঁড়িয়ে সেইন্ট পল এথেনিয়ানদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন।

জর্জ বলল, 'পাতাটা পাওয়া গেছে, এটাই বড় কথা। জাহাজটা যে এদিকে ছিল, এটা পরিষ্কার। কে জানে, মি. প্যাসিমভ হয়তো রোডসেই আছেন।'

'এর আরেকটা অর্থ হতে পারে,' বলল রানা, 'জাহাজটা ডুবে গেছে। পাতাটা হয়তো তারই শেষ চিহ্ন।'

'কিন্তু অন্য কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি,' বলল চন্দন। 'প্লেন নিয়ে তল্লাশী চালানো হয়েছে, ফলাফল নেগেটিভ।'

বারকেইনহেইমার রানাকে বললেন, 'আমাদেরকে ধারণা দেয়া হয়েছে, ইচ্ছে করলে অ্যাসাইনমেন্টটা আপনি গ্রহণ না-ও করতে পারেন। প্লিজ, মি. রানা, সেরকম কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। মি.

প্যাসিমভকে যদি উদ্ধার করা সম্ভব না হয়, এইচআরসি-র সুনাম বলে আর কিছু থাকবে না।'

মৃদুকণ্ঠে, কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলল রানা, 'এইচআরসি তার সাধ্যের বাইরে নাক গলায়। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি, কারণ বিপদটা আসলে মি. প্যাসিমভের।' অ্যাসাইনমেন্টটা গ্রহণ করার পিছনে এটা একটা কারণ বটে, কিন্তু আরও বড় কারণ হলো গোটা ব্যাপারটার মধ্যে গোপন কি যেন একটা আছে বলে সন্দেহ হয়েছে রানার। বিশেষ করে কে.জি.বি-র ভূমিকা রীতিমত রহস্যময়।

'তোমার সম্পর্কে কিংবদন্তীগুলো তাহলে মিথ্যে নয়,' বলল ডাচ জর্জ। 'আমি জানতাম, কৃতিত্ব দেখাবার এই সুবর্ণ সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে না।'

'শুধু কৃতিত্ব বললে ভুল হবে, চাল ব্যর্থ করার সুযোগও আমি হাতছাড়া করতে চাইছি না,' ডাচ জর্জের দিকে পলকহীন চোখে তাকাল রানা।

মাঝখান থেকে কথা বলল চন্দন, 'মাসুদ ভাই, এখান থেকে সরাসরি আপনি রোডস আইল্যান্ডে চলে যাবেন। আজ রাতে, পরে এক সময়, মি. জর্জ আপনার সাথে দেখা করবেন ওখানে, খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় তখন আপনি ওর কাছ থেকে জেনে নিতে পারবেন। উনি আপনার এইচআরসি কনট্যাক্ট।'

'নো অফেন্স, তবে একা কাজ করব আমি,' বলল রানা।

'মুখে বলছ নো অফেন্স, কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল ঠিক উল্টো,' সহাস্যে বলল ডাচ জর্জ, তার হাসির শব্দে ক্ষীণ ব্যঙ্গের সুর বাজল। 'তবে আমি কিছু মনে করছি না। গুঁতো খেতে আমার ভালই লাগে।'

চন্দনের দিকে কঠিন চোখে তাকাল রানা। ‘অসহ্য!’

হাসিভরা চোখ দুটো কোটরের ভেতর ঘোরাল চন্দন। ‘আয়োজনটা এভাবেই করা হয়েছে, মাসুদ ভাই–ওপরমহল থেকে। এই পর্যায়ে তা আর বদলানো সম্ভব নয়।’

‘সবচেয়ে আগে আমি যেটা জানতে চাই,’ বারকেইনহেইমার আর ডাচ জর্জের দিকে ফিরল রানা। ‘নতুন ডেভলপমেন্ট সম্পর্কে আপনারা কাউকে কিছু বলেছেন কিনা?’

‘না!’ আঁতকে উঠে বললেন বারকেইনহেইমার।

‘কেন বলতে যাব, ডিয়ার ফেলো!’ বিস্ময় প্রকাশ করল জর্জ।

‘ভাল।’ বড় করে শ্বাস টানল রানা। ‘এটা আমাদের সিক্রেট, কেমন? তা না হলে...’

ঠিক সেই মুহূর্তে চন্দনের একজন সিকিউরিটি এজেন্ট এক পা এগিয়ে রানার সামনে চলে এল, অকস্মাৎ ঝাঁকি খেলো সে, মোচড় খেয়ে ঘুরে গেল শরীরটা, টলমল করে ছোট্ট দলটার দিকে এগোল। লোকটার মুখ নিঃশব্দে নড়ছে দেখে ঘাড়ের পিছনে শীতল একটা স্পর্শ অনুভব করল রানা। বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ দুটো অথচ দেখা যাচ্ছে শুধু চোখের সাদা অংশটুকু। তার বুকের সামনে শার্টে এবড়োখেবড়ো একটা গাঢ় দাগ ফুটছে। দ্বিতীয় গুলিটা পাঁচিল থেকে ধুলো ওড়াল। রানার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা।

প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ডাচ জর্জকে ফেলে দিল রানা, ডাইভ দেয়ার সময় চোখের কোণ দিয়ে দেখল ক্ষমা না চেয়ে চন্দনও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে বারকেইনহেইমারকে।

ডাইভ দিল রানা বাম দিকে। তিরিশ ফুট সামনে, ওদিক থেকেই এগিয়ে আসছে লোকটা। তার হাতে সাইলেন্সার লাগানো

একটা পিস্তল। লম্বা করা হাতে পিস্তলটা ধরে আছে সে। লোকটা আবুল খায়ের। দৃঢ়, সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সে, একের পর এক গুলি করছে। আকস্মিক হামলা চালিয়ে হকচকিয়ে দেয়ার সুযোগটা হারিয়েছে সে, তবু তার হাবভাবের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী একটা ভাব লক্ষ করল রানা। এলোপাতাড়ি গুলি না ছুঁড়ে যদি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করার জন্যে সময় নিত, তিনজনের একজনও এতক্ষণ বাঁচত না।

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ার আগেই .৩৮টা রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে। একবার মাত্র গড়াল ও, সিধে হলো এক হাঁটুর ওপর, অস্ত্রটা ধরে আছে লম্বা করা দু'হাতে।

রানার হাতে একবারই গর্জে উঠল অস্ত্রটা, হাঁটু দুটো ভাঁজ না করেই বসে পড়ল আবুল খায়ের। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা গেল তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা, আবার গুলি করার জন্যে তৈরি। একটা কনুইয়ের ওপর কাত হলো আবুল খায়ের, মাথা ঝাঁকাল, ঢলে পড়ে গেল মাটিতে পিঠ দিয়ে।

সমস্ত কিছু এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটেছে। নারীকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল, মহিলার ভাঁজ করা আঙুলগুলো দেবে বসেছে মুখের নরম মাংসে। অ্যাক্রোপলিসের বিশাল খোলা প্রাঙ্গণে নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হলো, চারদিকে ছুটোছুটি করছে লোকজন।

আবুল খায়েরের আধবোজা চোখের দিকে ঝুঁকল রানা। খুব বেশি সময় নেই তার। যে-কোন মুহূর্তে পুলিসও পৌঁছে যাবে। 'কে তোমাকে টাকা দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ক্ষীণ হাসি ফুটল আবুল খায়েরের ঠোঁটে, যেন বলতে চাইল উত্তর পাবার আশা করে বোকামির পরিচয় দিচ্ছে রানা।

'কেসটা অন্যভাবে সাজানো হতে পারে,' বলল রানা, 'শেষ মুহূর্তে তুমি যদি সহযোগিতা করো। নিজের আত্মীয়স্বজনের কথা চিন্তা করো। দেশের কথা ভাবো। সবাই জানবে তুমি বেঈমানী করেছ। আর যদি স্বীকার করো…'

আধবোজা চোখ পুরোপুরি খুলে গেল, অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে তাকাল আবুল খায়ের। 'আপনি কথা দিচ্ছেন?'

'দিচ্ছি,' বলল রানা। 'অন্তত তোমার দলবদলের কথা প্রচার করা হবে না। কাদের কাছ থেকে টাকা খেয়েছ তুমি?'

'কর্নেল রুস্তমভ… '

আবুল খায়েরের মাথাটা দু'হাতে ধরে খানিকটা উঁচু করল রানা। 'তারা জানল কিভাবে?'

খক্ খক্ করে কাশল আবুল খায়ের। 'আমার ছেলে আছে দেশে, সে যেন না জানে…আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি…না জানে…'

'জানবে না। কর্নেল জানল কিভাবে?'

'কর্নেলকে আমিই জানাই…'

'তুমি জানলে কিভাবে?'

'আমি আড়ি পেতে শুনে ফেলি, তারপর আমাকে বলে ও।' একটা হাত তুলতে গিয়েও পারল না আবুল খায়ের।

'তোমাকে বলে?' স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা।

'কাকে বলেনি তাই বলুন!'

চোখ বুজে এল আবুল খায়েরের, খোলা মুখ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল খানিকটা তাজা রক্ত। তার ঘাড়টা নেতিয়ে পড়ল। মারা গেছে।

মুখ তুলল রানা, চন্দনকে দেখতে পেল। এথেন্স কন্ট্রোল-এর

দুচোখ থেকে আগুন ঝরছে। ঝট করে ডাচ জর্জের দিকে ফিরল সে। 'ইউ বাস্টার্ড! শালা বেজন্মা বাচাল কোথাকার!'

'আমি শুধু দু'একজন বন্ধুকে বলেছি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবকে মানুষ গোপন কথা বলে না?' ডাচ জর্জের ভঙ্গিটা আত্মরক্ষার, কিন্তু মাফ চাওয়ার মত নয়।

মারমুখো হয়ে তার দিকে এগোল চন্দন, তাকে ঠেকাল রানা। 'ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। লোকটাকে দেখো, আবুল যাকে গুলি করেছে।'

'আগেই দেখেছি, মাসুদ ভাই,' বলল চন্দন। 'মারা গেছে।'

'দুটো লাশই মর্গে নিয়ে যাক পুলিস,' বলল রানা। 'দূতবাস পরে ক্লেইম করবে।' ডাচ জর্জের দিকে ফিরল ও। 'এসপিওনাজ জগতে চালাক হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, তোমাকে চৌকশ হতে হবে। ঝুঁকিটা প্রাণ হারাবার। বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল ডাচ জর্জ। বারকেইনহেইমার দ্রুতবেগে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালেন।

'তাহলে ছড়িয়ে পড়ো। পুলিস আসার আগেই কেটে পড়া দরকার।'

ট্যুরিস্টদের অনেকেই ইতিমধ্যে ভয় কাটিয়ে উঠেছে। পাঁচিলের কাছে পড়ে থাকা লাশটার দিকে দু'একজন করে এগিয়ে আসতে শুরু করল। দেখাদেখি তাদের পিছু নিল আরও কিছু লোক। সবাই কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে ওদের তিনজনের কোন অসুবিধে হলো না। অন্ধকারে কে কোন্ দিকে গেল কেউ লক্ষ করল না।

তিন

ঢেউয়ের নিচে দম বন্ধ করল রানা। শরীর অবশ করে দেয়া আতংক ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল মন থেকে। মিলির দীর্ঘ চুল নাগালের মধ্যে পেয়ে ধরে ফেলল, তারপর টান দিল নিজের দিকে।

ডুবে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে মিলি, নরম হয়ে গেছে পেশী, অকস্মাৎ ঝাঁকি লাগায় চৈতন্য ফিরে পেল সে, রানার কাজে সাহায্য করার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ল।

পানির ওপর মাথা তোলার চেষ্টা করছে রানা। কোথায় যেন শুনেছিল, কোন মানুষ পানিতে মরার আগে তিনবার ডোবে...আমি মাত্র একবার ডুবেছি, ভাবল ও।

শরীরটা নেতিয়ে পড়তে চাইছে। বাতাসের অভাবে ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে ফুসফুস। হঠাৎ ওর একটা হাতে বাতাস লাগল, বাঁচার আশা আর উৎসাহ শতগুণ বেড়ে গেল সেই সাথে। সমস্ত শক্তি এক করে পা ছুঁড়ল ও। চোখ মেলে দেখল ওর পাশে পানির ওপর মিলির মুখটাও ভেসে উঠেছে।

শব্দগুলো প্রথমে চিনতে পারল না রানা। কানে পানি ঢুকেছে

বলে সন্দেহ করল ও। কিন্তু ভোঁতা ভোঁ ভোঁ কোন আওয়াজ নয়, রীতিমত তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পাচ্ছে ও। অবিশ্বাস্য লাগল ব্যাপারটা। সাপের মত এঁকেবেঁকে কি যেন একটা ছুটে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল একটা রশি, শেষ মাথায় বাঁচার অবলম্বন একটা রিঙ। লাইনটা খপ করে ধরে ফেলল রানা, অপর হাতে জড়িয়ে ধরল মিলির কোমর। নিস্তেজ ভঙ্গিতে রানাকে আঁকড়ে ধরল মেয়েটা, তার নগ্ন স্তন সেঁটে গেল রানার পাঁজরে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ায় বুকটা উঁচু-নিচু হচ্ছে।

রিঙটা হাতে চলে আসায় এতক্ষণে চারদিকে তাকাবার অবকাশ পেল রানা। আনন্দের আতিশয্যে দুর্বল লাগল শরীরটা। সেই ঘরমুখো বোটগুলোর মাঝখানে রয়েছে ওরা, বোটে দাঁড়ানো জেলেরা সমস্বরে আশ্বাস আর উৎসাহ দিচ্ছে ওদেরকে। লাইফ রিঙ ধরে টানছে এক দশাসই জেলে, লাল ও নীল রঙের ছোট একটা ট্রলারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

ভিলার নিচে, পাথুরে সৈকতে, যেখান থেকে ভেলা নিয়ে আজ সকালে রওনা হয়েছিল ওরা, ঠিক সেখানেই ওদেরকে নামিয়ে দিল জেলেরা। বালির ওপর রোদের তাপ যথেষ্ট হলেও, জেলেদের দেয়া উলের তৈরি কম্বল গায়ে ঠাণ্ডায় হি হি করছে মিলি। কম্বলটা দু'ভাঁজ করে, শালের মত কাঁধে জড়িয়েছে সে। জেলেদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা, প্রস্তাব দিল ঋণ পরিশোধ করার জন্যে ওকে একটা সুযোগ দেয়া হোক। গাড়িতে টাকা আছে ওর, যাবে আর নিয়ে আসবে। প্রকাণ্ডদেহী জেলে সর্দার দলের পক্ষ থেকে সবিনয় হাসির সাথে বলল, সাগরে বিভিন্ন দুর্ঘটনার সময় তাদেরকে যে সাহায্য করা হয় তা যদি পরিশোধের প্রশ্ন ওঠে তাহলে জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্য সারা জীবন ঋণী থেকে

যাবে।

বোটগুলো চলে যাবার পর বালির ওপর হাঁটু দিয়ে বসল মিলি, হলুদ কম্বলটা তাঁবুর মত ঘিরে রেখেছে তাকে, রানার দিকে মুখ তুলে বলল, 'কেমন যেন লাগছে আমার।'

'লোনা পানি পেটে গেলে ভাল লাগার কথা নয়,' বলল রানা।

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

চোখ নামিয়ে মিলির দিকে তাকাল রানা। ভিজে রশির মত চকচক করছে তার লম্বা কালো চুল। উজ্জ্বল রোদ লেগে পানির ধারা আর ফোঁটাগুলো নীল আর রূপালি দেখাচ্ছে। 'দু'জনকেই জেলেরা বাঁচিয়েছে,' বলল ও। 'কৃতিত্বটা ভাগ্যকে দাও। চলো, ওপরে উঠি।'

'একটু অপেক্ষা করো,' বলল মিলি। মুখ নামিয়ে বালির দিকে তাকাল সে, যেন হাঁটুর সামনে নিজের ছোট্ট ছায়াটা পরখ করছে।

কয়েক সেকেন্ড পর আবার বলল রানা, 'চলো।'

সিধে হয়ে দাঁড়াল মিলি। 'মৃত্যুর এত কাছে আর কখনও আসিনি আমি।'

'ভুলে যাও, বিপদ কেটে গেছে।'

'বেঁচে আছি দেখে আনন্দে দিশেহারা লাগছে আমার। মনে হচ্ছে, প্রতিটি মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরি, প্রতিটি সাধ আর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করি।' গা থেকে খসে পড়ল কম্বলটা, উন্মোচিত হলো সোনালিবরণ নারীদেহ।

'জেলেরা তোমাকে কতটা ব্র্যান্ডি খাইয়েছে বলো তো?' জানতে চাইল রানা।

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল মিলি, তার কণ্ঠস্বর খসখসে, 'আমাকে ধরবে?'

‘কোস্টাস অ্যারোনাফিস বলে একজন আছে, তোমার বয়ফ্রেন্ড–ভুলে যেয়ো না।’

‘আমি কারও কেনা নই, আজও কেউ আমাকে জয় করতে পারেনি।’

‘শেষবার তাকে আমি অস্ত্র হাতে দেখেছি,’ চারদিকে তাকাল রানা, তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

মিলির গলায় রাগ, পিছন থেকে ধিক্কার দিল সে, ‘কেমন পুরুষ তুমি?’

‘বেঁচে থাকতে চায় বলে সাবধানে পা ফেলে,’ হাঁটার গতি শ্লথ না করে বলল রানা। একটা অ্যাসাইনমেন্টের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ও, মাথার ভেতর গিজগিজ করছে অসংখ্য সমস্যা, ঈর্ষাকাতর একজন প্রেমিককে খেপিয়ে তুলে পরিস্থিতিটাকে আরও প্রতিকূল করার কোন ইচ্ছে ওর নেই। কাল রাতে ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, আজ সকালে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে একটা জাহাজ। দিনের বাকি সময়টা ওর জন্যে কি অপেক্ষা করছে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছে মনটা।

ব্লাফ-এর মাথায় ওঠার আগেই ধোঁয়ার গন্ধটা নাকে ঢুকল। দুপ দাপ করে রাগী পা ফেলে উঠে এসেছে মিলিও, নগ্ন বুক সম্পর্কে যেন সচেতন নয়। হাসি চেপে রানা ভাবল, কোটিপতি অ্যারোনাফিসকে হতভম্ব করতে না পারলেও, তার বাটলারকে ভ্যাবাচাকা খাইয়ে দিয়ে মজা পাবে মিলি। অদ্ভুত ছেলেমানুষি একটা ভাব রয়েছে তার সমস্ত আচরণে। নিজেকে জাহির করতে ভালবাসে।

হাত ইশারায় মিলিকে পিছনে অপেক্ষা করতে বলল রানা। তারপর সাবধানে কিনারা টপকে ব্লাফ-এর মাথায় উঠল।

গন্ধটা এখানে আরও জোরাল, অথচ এখনও আগুনের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। নিচ থেকে ঢেউগুলোর বিরতিহীন আছাড় খাওয়ার শব্দ ভেসে আসছে। রানার সামনে জলপাই গাছগুলোর ভেতর দিয়ে সশব্দে বইছে বাতাস।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল মিলি, দুপ দাপ শব্দ তুলে রানার পাশে উঠে এল। 'গন্ধটা কিসের?' জানতে চাইল সে।

'আমার কাছাকাছি থাকো,' বলল রানা, গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল।

সেই গলিটায় চলে এল ওরা, কোস্টাল হাইওয়ে থেকে ভিলার দিকে চলে গেছে। গলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল রানা।

সকালে এখানেই বাঁক নিয়েছিল কালো মার্সিডিজটা। এখন সেটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। খালি একটা গাড়ি-পথ কিছুই প্রমাণ করে না, মনটা আরও যেন খুঁত খুঁত করতে লাগল রানার। গলি ছেড়ে আবার জঙ্গলের ভেতর ঢুকল ও। ওর ভাড়া করা সিমকাটা এখান থেকে সামান্য দূরে।

দেখে মনে হলো গাড়িটায় কেউ হাত দেয়নি। দরজার তালা খুলে .৩৮টা বের করল রানা।

'ওটা কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মিলি।

'বলা তো যায় না, যদি লাগে।'

'আমি জানতাম না তোমার কাছে অস্ত্র আছে।'

'আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো না তুমি।'

'তোমার এখন বরং চলে যাওয়াই ভাল,' বলল মিলি। 'আবার আমরা দেখা করতে পারি। আমি কোথায় গান করি তুমি জানো।' ঘুরল সে, গলির দিকে হাঁটা ধরল।

হাত লম্বা করে তার কব্জিটা ধরে ফেলল রানা। ব্যথায় উফ্ করে উঠল মিলি। 'দাঁড়াও!'

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল মিলি। 'ছাড়ো! আমি সময় নষ্ট করতে রাজি নই। তোমাকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না...'

'এক মিনিটের জন্যে সেক্সের কথা ভুলে থাকবে, প্লিজ?'

'আমাকে তুমি অপমান করেছ...দু'বার!' জেদের সুরে বলল মিলি। 'তাছাড়া, এই অবস্থায়...তুমি বেদিং সুট পরে আছ, আর আমি এভাবে...আমার সহ্য হচ্ছে না।' নিজের দিকে তাকাল সে, তারপর মাথাটা সবেগে পিছন দিকে কাত করে কাতর কণ্ঠে বলল, 'আমি সৌন্দর্যের পূজারিণী, ভোগে বিশ্বাস করি। জানি না নিজেকে কিভাবে এতদিন সামলে রেখেছিলাম। তোমাকে দেখে আমার সমস্ত ধৈর্য আর সংযম চুরমার হয়ে যাচ্ছে।'

'চলো ভিলায় যাই। সব সময় গাছের আড়ালে থাকবে।'

'আড়াল জিনিসটা দরকার হয় গোপন কাজ করার জন্যে,' রানার সাথে হাঁটা ধরে বলল মিলি, গোলাপ পাপড়ির মত কোমল ছোট্ট সুন্দর মুখটায় কৃত্রিম অসন্তোষ।

রানা কোন জবাব দিল না।

খানিকটা হাঁটার পর আবার বলল মিলি, 'কোস্টাসকে তোমার আসলে ভয় পাবার কোন দরকার নেই, বুঝলে!'

এবারও কোন জবাব দিল না রানা। সাবধানে হাঁটছে, পিস্তল ধরা হাতটা কোমরের কাছে তোলা।

'সে এমনকি নেইও এখানে,' বলল মিলি।

'কি?' মিলির দিকে ঘুরল রানা। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

মসৃণ একটা কাঁধ ভারি আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে ঝাঁকাল মিলি। 'আমাদের চাপা দেয়ার চেষ্টা করল ইয়টটা। কার ওটা?'

‘কার?’

‘কোস্টাসের, আবার কার!’

‘বলো কি! আমাকে আগে বলোনি কেন?’

‘বলিনি…বলিনি ভয়ে। আমার সন্দেহ হয়েছিল, জানতে পারলে এ-ধরনের কিছু একটা করবে তুমি, এখন যা করছ।’

নির্জন জঙ্গলের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

‘কোস্টাসকে তোমার ক্ষমা করতে হবে,’ আবার বলল মিলি। ‘তাকে বুঝতে পারলে তুমি তাকে ক্ষমা করবেও।’

‘কি রকম?’ বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠতে না পারলেও কৌতুক বোধ করল রানা।

‘কাজটা করেছে স্রেফ ভালবাসার খাতিরে, ঈর্ষাবশত। কোস্টাস আমাকে দেখাতে চায়, আমার প্রতি কত গভীর তার টান। কিন্তু কাজটা করার পর এখন তার অবস্থা কি হবে জানো? অনুতাপে দগ্ধ হবে বেচারি, একা একা নিজের মাথার চুল ছিঁড়বে। তারপর, আবার যখন দেখা হবে আমাদের, ভাবতে পারো তখনকার পরিস্থিতিটা? আনন্দে, উল্লাসে…মানে আমাদের রিইউনিয়নটাকে বলা যেতে পারে…’

‘দুটো গ্রহের মুখোমুখি সংঘর্ষ?’

‘ঠিক তাই!’ চিৎকার করে বলল মিলি। নিজের দু’কোমরে হাত রাখল সে। ‘এ-সব শুনে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে না?’

‘আমি শুধু বুঝতে পারছি, মগজ বিতরণের সময় লাইনে সবার শেষে ছিলে তুমি, তবে অন্যান্য দান গ্রহণ করার সময় লাইনে ছিলে সবার আগে।’ লোভী নয়, প্রশংসার চোখে মিলির শরীরে তাকাল রানা।

‘ওহ্!’ মিলির দীঘল কালো চোখ থেকে আগুন ঝরল। ‘আমি

গ্রীক! তোমার বোঝার কথা নয়। আমার সমস্ত কিছু গ্রীক।'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক দুর্বোধ্য।'

'তোমার মত শীতল একজন মানুষ বুঝতে পারবে, এ আমার আশা করা উচিত হয়নি।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। ওর পিছনে শুকনো ঘাস আর পাতা খস খস করে উঠল, পিছু নিয়েছে মিলি। মনে মনে একটা আশংকা করছে রানা। ভিলার ভেতর না জানি কি দেখতে পাবে। ওর উদ্বেগের ভাগ মেয়েটাকে দেয়ার কোন ইচ্ছে না থাকলেও, সতর্ক হবার সময় পেল না ও, ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতেই ভিলার নিচের দিকটা এতক্ষণে পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হলো। ওর আশংকা মিথ্যে নয়।

মিলির দম বন্ধ করার আওয়াজ পেল ও। 'গড, ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল মেয়েটা। 'ভিলায় আগুন ধরে গেছে!'

'সাবধান,' বলল রানা, চারদিকে চোখ রেখে সামনের খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে এল।

'কেউ বোধহয়...তাই না...?'

'আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ।' চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। 'তারা হয়তো এখনও এখানে আছে।'

'তারা মানে? কাদের কথা বলছ তুমি?'

'চিনি না।'

ভিলার কাঠামোটা অসংলগ্ন, ছোটখাট একটা পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে সাজানো রয়েছে। ওরা দেখল, লাল টালির ছাদের নিচ থেকে ধূসর-হলুদ ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, অন্তত দু'জায়গায়। বাতাস থাকায় ধোঁয়াটা জমতে পারছে না ভিলার মাথায়। যে কারণেই আগুনটা লেগে থাকুক, চুনকাম করা কংক্রিটের পাঁচিল, মার্বেল

দেয়াল ও টেরা কোটা মূর্তিগুলোর কোন ক্ষতি না করেই নিভে গেছে বা যাচ্ছে।

একটা বাঁক ঘুরল রানা, প্রবেশপথের দিকে এগোল। চারদিকের জমাট নিস্তব্ধতা ভৌতিক লাগল ওর। কমলা গাছগুলোর প্রতিটি শাখা খালি, একটা পাখি নেই। রানা লক্ষ করল, খোলা চাতালে একটা রূপালি রোলস রয়েস দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িটার চাকা বসে গেছে, ভেতরে বাতাস নেই। তারপর দেখতে পেল কড়া ভাঁজের সাদা মেস জ্যাকেট পরা একজন চাকরকে।

টালি দিয়ে ছাওয়া প্রবেশপথে পড়ে আছে লোকটা। নড়ছে না।

'সিকো!' ডাকল মিলি। রানাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল সে। লোকটার ওপর ঝুঁকল।

রানা পৌঁছুল অভ্যস্ত সতর্কতার সাথে, মাথাটা ডানে বাঁয়ে ঘুরছে। পুরু রক্তের স্তরে শুয়ে রয়েছে সিকো। রক্তের কিনারায় ভন ভন করছে মাছির ঝাঁক। গাঢ় পায়ের ছাপ দেখা গেল, জুতোয় রক্ত নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকেছে কেউ। চারদিকে তাকিয়ে সিকোর ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল রানা। 'মারা গেছে,' বলল ও।

'দেখতেই তো পাচ্ছি। ওর অস্ত্রটা দাও আমাকে।'

'গুলি করতে জানো?' সিকোর পাশে পড়ে থাকা নাইন এমএম বেরেটা অটোমেটিকটা তুলল রানা। 'শুধু আত্মরক্ষার জন্যে,' মিলি মাথা ঝাঁকাতে বলল ও। 'কোন রকম পাগলামি দেখতে চাই না।'

'আত্মরক্ষা করতে বলো...,' গলা বুজে এল মিলির, নাক টানল সে, সামলে নিল নিজেকে, '...সিকোর খুনিদের।'

ইয়টটার কথা মনে পড়ল রানার, ওদেরকে প্রায় খুন করে

ফেলেছিল। 'এমন হতে পারে, কোস্টাস অ্যারোনাফিস হয়তো প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল। সে হয়তো আমাদের দেখতেই পায়নি।'

সিকোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মিলি। 'জানো, বাগানের সবচেয়ে বড় গোলাপগুলো আমার জন্যে আলাদা করে রাখত ও।'

লাশ ছেড়ে উঠল রানা, খোলা দরজাটার দিকে তাকাল। আকারে বিশাল, সাইপ্রাস কাঠ দিয়ে তৈরি, গায়ে পিতলের পাত চকচক করছে। সতর্কতার সাথে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল ও। কিছুই নড়ছে না। কোন শব্দও নেই। অপেক্ষা করছে রানা। পিছনে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা সোনালি গিরগিটি। পাম গাছের পাতা খসখস করে উঠল বাতাসে।

বড় করে শ্বাস টেনে ভেতরে ঢুকল রানা।

কিছু কিছু ক্ষতির চিহ্ন দেখা গেল, তবে ব্যাপক নয়। মিশরীয় সারকোফ্যাগাস-এর বিশাল একটা মাথা দুর্লভ অস্ট্রেলিয়ান বটলট্রির পাশ থেকে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা একটা প্রাচীন পাথুরে শবাধার, ভাস্কর্য শিল্পে সমৃদ্ধ, গায়ে প্রাচীন লিপি খোদাই করা রয়েছে। আয়না লাগানো একটা দেয়ালে নিজের চেহারা দেখতে পেল রানা, দেয়ালটার সাথে একটা ফায়ারপ্লেস রয়েছে। ওর ডান দিকে পদ্মপাতার ওপর বসে রয়েছেন বুদ্ধদেব, ফুলের পাপড়িগুলো সোনার তৈরি।

নরম কার্পেটে পা ফেলে এগোবার সময় ক্ষীণ ধোঁয়া লাগল রানার চোখে। কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা ডিসপ্লে কাউন্টারকে পাশ কাটাল ও, গাঢ় রঙের রোডস প্লেট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাহাজ, মাছ আর ফুলের আকৃতি। ছাদের দু'একটা কড়িকাঠ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, তবে একটাও ভেঙে নিচে পড়েনি। দুটো টালি

খসে পড়েছে মেঝেতে, ফাঁকগুলোয় রোদ আর ধোঁয়াটে ভাব দেখা গেল। একটা হলওয়েতে বেরিয়ে এল রানা।

দ্বিতীয় লাশটা পাওয়া গেল অগ্নিদগ্ধ বেডরূমে।

গ্যাসোলিনের গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। মেঝের দিকে তাকাতেই ভাঙা মদের বোতলটা দেখতে পেল ও, মুখের কাছে জড়ানো রয়েছে ছেঁড়া ও পোড়া এক ফালি কম্বল।

মলোটভ ককটেল।

একটা জানালার সমস্ত ভাঙা কাঁচ কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। মলোটভ ককটেল বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে কামরার ভেতর আগুন ধরে যায়। চারদিকের দেয়ালে কাপড়ের পর্দা ছিল, চোখের পলকে তন্দুরে পরিণত হয় কামরাটা। আগুনের হাত থেকে বেঁচে গেছে শুধু খাটের স্টীল ফ্রেম আর স্প্রিংগুলো।

নিচের দিকে ঝুলে পড়া স্প্রিঙের ওপর পড়ে আছে হতভাগ্য লোকটা, সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। শুধু যে মুখটা পুড়েছে তাই নয়, হাত দুটোও রক্ষা পায়নি। সনাক্ত করতে হলে ডেন্টাল রেকর্ডের সাহায্য নিতে হবে, ভাবল রানা। থমথমে চেহারা নিয়ে পিছু হটল ও।

পিছন থেকে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ পেল রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে মিলির কাঁধ ধরল ও, মেয়েটাকে নিয়ে ফিরে এল হলওয়েতে। 'তাকিয়ো না,' বলল ও।

'ও নিশ্চয়ই কোস্টাস,' নিঃশ্বাসের সাথে ফিসফিস করল মিলি।

চিৎকার আর কান্না আশা করেছিল রানা, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। স্বস্তির একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাড়িতে ক'জন লোক ছিল বলতে পারবে?' ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল ও, হলওয়ের শেষ মাথার দিকে।

'শুধু কোস্টাস আর সিকো। সিকো তার ম্যানসার্ভেন্ট। কিন্তু কেন?' রানাকে ধরে দুর্বল হাতে ঝাঁকাল মিলি। 'এভাবে কেন কেউ...?'

'তারা হয়তো আমাকে মারতে চেয়েছিল,' বলল রানা।

'কি! তোমাকে?'

'হয়তো ভেবেছিল, এখানে আছি আমি।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল মিলি, রানাকে এখনও ধরে আছে সে। 'তাহলে তারাই ইয়টে ছিল!' হঠাৎ বুঝতে পারায় চোখ দুটো সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'কিন্তু...কেউ কি তোমাকে খুন করতে চায়?'

'বহু লোক।'

শিউরে উঠে রানার গায়ে হেলান দিল মিলি। কি যেন বলতে চাইল সে, কিন্তু তার আগেই আরেকজন কথা বলে উঠল, 'দেখে মনে হতে পারে, খুন-খারাবি আর ফুর্তি, দুটোই তুমি সমানে চালাতে পারো।'

রানা ঘুরে দাঁড়াবার আগেই, ওর পাশ থেকে গর্জে উঠল মিলির বেরেটা।

চার

'না!' চিৎকার করল লোকটা।

মিলি দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই হাত ঝাপটা দিয়ে অস্ত্রটা একপাশে সরিয়ে দিল রানা। ঘুরল ও, দেখল হলওয়ের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাচ জর্জ, তার পাশের দেয়ালে বুলেটের একটা গর্ত তৈরি হয়েছে। অকস্মাৎ গুলি হওয়ায় ভয় পেয়েছে সে, তা সত্ত্বেও তার সরু চেহারায় বিদ্রূপাত্মক ভাবটুকু ম্লান হয়নি, উঁচু হয়ে রয়েছে একটা ভুরু।

'মিলিকে তুমি নার্ভাস করে দিয়েছ,' বলল রানা। 'উঁকি-ঝুঁকি মারা আমিও পছন্দ করি না।' কাল রাতে অ্যাক্রোপলিসে যা ঘটেছে তারপর আর ডাচ জর্জকে বিশ্বাস করে না ও—বাচালতা যদি তার একমাত্র দোষ হয়, সেটাই যথেষ্ট।

একটা ব্যাপার লক্ষ করে হাসি পেলেও হাসল না রানা। ডাচ জর্জের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হবার সাথে সাথে রানার পিছনে লুকিয়ে লজ্জা ঢাকল মিলি। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ডাচ জর্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝতে পারিনি তুমি...'

'বিশ্বাস করলাম, বুঝতে পারোনি,' বলল ডাচ জর্জ, সরু গোঁফের প্রান্ত ধরে মোচড় দিল সে। 'তোমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার সময় ভাবিনি যে তোমাকে নিয়ে এভাবে মেতে উঠবে রানা।'

শক্ত হয়ে উঠল রানার চোয়াল। 'বাজে কথা বলবে না!'

'তোমার পিছনে লুকোবার আগে ওকে আমি দেখেছি,' বলল ডাচ জর্জ। 'কি ভাবা উচিত আমার, তুমিই বলো?' সিল্কের রুমাল বের করে মুখ মুছল সে। সিলভার-গ্রে রঙের সুট পরে আছে, পিতলের মাথাওয়ালা একটা ওয়াকিং স্টিক হাতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল আবার, 'না, ভাই, স্বীকার করতে হবে, তোমার বুকে সাহস আছে। বলে কি!—কোস্টাস অ্যারোনাফিসের কাছ থেকে

তার গার্লফ্রেন্ডকে কেড়ে নিল!'

'আসলে কি ঘটেছে, তোমার কোন ধারণা নেই,' রানার পিছন থেকে বলল মিলি।

'কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল জর্জ।

'সব ব্যাখ্যা করার সময় নেই,' বলল রানা। 'কোস্টাস অ্যারোনাফিস সম্ভবত মারা গেছে। বেশিক্ষণ এখানে থাকলে বিপদ হবে।'

'মারা গেছে? তা কি করে হয়! দরজায় বেচারা চাকরটাকে দেখলাম বটে, কিন্তু...কোথায় সে?'

ইঙ্গিতে পিছন দিকটা দেখাল রানা। 'বেডরূমের লাশটা তার হতে পারে।'

'তারই,' বলল মিলি। 'বেডরূমে কোস্টাস ছাড়া আর কে থাকবে?'

এগিয়ে এল ডাচ জর্জ, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে বেডরূমের দিকে এগোল। রানার পিছন থেকে সামনে চলে এল মিলি।

দরজার কাছ থেকে পিছু হটল ডাচ জর্জ। 'কি বীভৎস!' নাকে রুমাল চাপা দিল সে। 'কিভাবে...কি ঘটেছে?'

'বলতে পারব না। আমরা শুধু লাশ দুটো পেয়েছি।' মিলির দিকে তাকাল রানা। 'এখানে তোমার কাপড়চোপড় আছে?'

'আছে।'

জর্জ বলল, 'এথেন্স থেকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে তোমার লোক, চন্দন সরকার। তোমাকে জানাতে বলেছে, নেমিসিসের খোঁজ পাওয়া গেছে।'

'গুড,' বলল রানা। 'কোথায়?'

'পোর্ট সাঈদে। সুয়েজ ক্যানেল পেরোবার জন্যে লাইন

দিয়েছে জাহাজটা, তিন নম্বরে আছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হবে কনভয়।'

'জাহাজে মি. নিকোলাই প্যাসিমভ আছেন কিনা জানা গেছে?'

মাথা নাড়াল জর্জ। 'শুধু হদিস পাওয়া গেছে জাহাজটার। আর কিছু জানা যায়নি।'

চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'যেভাবে হোক জাহাজটায় চড়তে হবে আমাকে।'

'কিন্তু আমি ভাবছি সময়মত তুমি পোর্ট সাঈদে পৌঁছুতে পারবে কি?'

'না, তা সম্ভব নয়,' বলল রানা। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। 'আরেক জায়গার কথা ভাবছি আমি। সরাসরি ক্যানেলে চলে যেতে পারি। রোজ দুটো করে কনভয় আসে, দুদিক থেকেই। পরস্পরকে পাশ কাটায় আল-বালাহ আর কিবরিত-এ, একটা নোঙর ফেলে অপেক্ষা করে, অপরটা এগোয়। চেষ্টা করলে আল-বালাহ থেকে নেমিসিসে উঠতে পারব আমি। কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে হলে প্লেন দরকার।' জর্জের দিকে মুখ তুলল ও। 'একটা প্লেন চার্টার করা যায়?'

'রোডস আইল্যান্ডে হরতাল চলছে, জানো না? আজ সারাদিন কোন প্লেন টেক-অফ করেনি।'

'প্রাইভেট কোন প্লেনের ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'তোমাকে গুরুর পদে বসানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি,' সহাস্যে বলল জর্জ। 'শুধু হুকুম করেই দেখো না!'

'পাইলট না হলেও চলবে,' বলল রানা। 'শুধু প্লেনটা দরকার।'

'পাইলট না হলে চলবে মানে?'

'আমিই চালিয়ে নিয়ে যাব।'

‘কিন্তু রোডস আইল্যান্ড থেকে টেক-অফ করার অনুমতি পাবে কোত্থেকে? স্থানীয় লাইসেন্স না থাকলে ওরা তোমাকে ককপিটে বসতে দেবে না।’

‘তাহলে পাইলটও দরকার হবে আমাদের।’

‘সবই পাবে,’ জানাল জর্জ। ‘তবে একটা শর্ত আছে।’

‘কি শর্ত?’

‘আমাকেও সাথে নিতে হবে,’ বলল জর্জ।

হাসি চেপে রেখে রানা বলল, ‘প্রস্তাবটা মন্দ নয়, বিশেষ করে ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে আমার যখন একজন লোক দরকার, কিন্তু তুমি তো আবার বেফাঁস কথা না বলে থাকতে পারো না।’

চোখ মিটমিট করল ডাচ জর্জ, যদিও চেহারায় হাসি-খুশি ভাবটা ধরে রাখতে পারল। ‘শুনতে কর্কশ লাগলেও, এটা আমার পাওনা ছিল। কথা দিচ্ছি, আর কোন ভুল হবে না। আরেকটা কথা, এটা ঠিক অনুরোধ নয়, বলতে পারো দাবি। যেখানেই সম্ভব, এইচআরসি-র অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে।’

‘এখানে সম্ভব নয়।’

‘সেক্ষেত্রে প্লেনও নেই, পাইলটও নেই।’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। এই মুহূর্তে এইচআরসি-র সাহায্য ছাড়া ওর চলবে না। ‘আমার ধারণা হয়েছে, তুমি নির্বিরোধী ও শান্তিপ্রিয় লোক,’ বলল ও। ‘যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছ। আমার সাথে থাকলে বিপদে পড়তে পারো।’

‘আমি অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে,’ বলল ডাচ জর্জ। ‘প্রিয় যে-কোন জিনিসের জন্যে যুদ্ধ করতে রাজি আছি আমি। আমার বিশ্বাস, প্রিয় জিনিস বাছাই করার অধিকার সব মানুষেরই আছে।’

অন্তত, ভাবল রানা, লোকটার একটা নীতি আছে। ‘গুলি

চালাতে জানো তুমি?’ জিজ্ঞেস করল ও।

‘লক্ষ্য ভেদ করতে পারি অব্যর্থভাবে।’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘শুধু মনে রেখো, নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছ তুমি।’

‘ভেরি গুড,’ তাড়াতাড়ি বলল জর্জ। ‘মিলি আমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কি বলো, মিলি?’

মিলির লালচে আকর্ষণীয় মুখে চওড়া হাসি ফুটল। ‘এই অদ্ভুত লোকটা কি রাজি হবে?’ রানার দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করল সে। ‘মেয়েমানুষ তো ওর জন্যে অ্যালার্জির কারণ।’

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওর দিকে ফিরে জর্জ বলল, ‘ওর লাইসেন্স আছে। কোস্টাস অ্যারোনাফিসকে নিয়ে বহুবার চষে বেড়িয়েছে গোটা আকাশ। দু’একবার আমিও ছিলাম প্লেনে, সত্যি ভাল চালায়।’

‘তুমি জানো না মেয়েটাকে কিসের সাথে জড়াচ্ছ,’ বলল রানা।

মুখের হাসি নিভে গেল মিলির, থমথমে গলায় বলল সে, ‘আমি শুধু জানতে চাই, কোস্টাসকে যারা খুন করেছে তোমরা তাদের কাছে যাচ্ছ কিনা?’

‘হতে পারে,’ বলল রানা।

‘তাদের আমি দেখে নেব।’

‘ওখানে খুনোখুনি কাণ্ড হবে,’ বলল রানা। ‘তুমি মারা যেতে পারো।’

গ্রীক ভাষায় জবাব দিল মিলি, ‘তাতে কিছু আসে যায় না। গ্রীকরা প্রতিশোধ নিতে জানে।’

ডাচ জর্জের একঘেয়ে, নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর বদলে গেল, চাপা

উত্তেজনার সাথে বলল সে, 'কোস্টাস অ্যারোনাফিসের লিয়ারজেটটা নেব আমরা। ওটা আর তার দরকার নেই।'

ঘাড় ফিরিয়ে মিলির দিকে তাকাল রানা। হাত দুটো আড়াআড়ি ভঙ্গিতে বুকে তুলে রেখেছে সে। কৌতুক আর আবেদন ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এরপর ডাচ জর্জের দিকে ফিরল রানা। সে-ও বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সিদ্ধান্ত নিল, যাদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না তাদেরকে নিজের সাথে রাখাটাই বরং নিরাপদ, চোখ রাখার সুযোগ থাকে। বলা যায় না, ওরা হয়তো ওর উপকারেও লাগতে পারে। তাছাড়া, ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করলে সময়মত নেমিসিসে পৌঁছুনো যাবে না।

শান্তস্বরে বলল ও, 'ঠিক আছে। ক্যানেল পেরুতে একটা কনভয় সময় নেয় পনেরো ঘণ্টা। শিডিউল দরকার হবে, তবে সেটা কোন সমস্যা নয়। আজ রাতেই জাহাজে ওঠার চেষ্টা করব আমরা।'

মিলিকে কাপড় পরতে বলল রানা, তারপর জর্জকে নিয়ে চলে এল সিমকার কাছে। বেদিং সুটের ওপর নীল একটা সুট পরল ও। 'আজ রাতের জন্যে একটা ইনফ্লেটেবল র‍্যাফট দরকার হবে,' জর্জকে বলল। 'শহরে গিয়ে কিনে ফেলো। বৈঠার কথা ভুলো না। এই নাও।' জ্যাকেটের পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে জর্জকে দিল ও। 'ভেলাটা নিয়ে সোজা প্লেনে চলে যাবে। ক্যানাল শিপিং শিডিউল না পাওয়া পর্যন্ত কখন টেক-অফ করব বলতে পারছি না। ওটা পেলে, তোমার হোটেল স্যুইটে একটা মেসেজ পৌঁছে দেব। এখনও ইন্টারকনেই আছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল জর্জ, টাকাগুলো পকেটে ভরল।

'আরেকটা কথা, আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে। প্লেনে ওঠার আগে তোমাকে যেন না দেখি।'

'আর কিছু?'

'অস্ত্র নিতে ভুলো না।'

ভিলার দিকে ফিরছে রানা, শুনতে পেল জর্জের গাড়ি স্টার্ট নিল। ভিলায় ফিরে এসে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল, সবগুলো ফোন বিকল হয়ে আছে। আগুনে পুড়ে যেতে পারে লাইন। তবে সম্ভবত কেটে দেয়া হয়েছে।

স্নায়ুর ওপর একটা চাপ অনুভব করল রানা। ভিলায় ওরা অনেকক্ষণ ধরে রয়েছে।

ভেতর থেকে ভিলার সামনে বেরিয়ে এল ও। লাশটার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বেরেটা ফেরত দিয়েছে মিলি, রুমাল দিয়ে হাতের ছাপ মুখে লাশের পাশে রাখল সেটা। ঝোপের মাঝখানে সরু গলিটার দিকে তাকাল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বাগান, সুইমিংপুল, তারপর নীল সাগরের দিকে। ইয়টটার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, দেখা যাবে বলে আশাও করেনি ও।

আঁটসাঁট স্ল্যাকস আর গাঢ় রঙে ছাপা সিল্ক ব্লাউজ পরে বেরিয়ে এল মিলি, ব্লাউজটা বুকের নিচে শেষ হয়েছে, উন্মুক্ত হয়ে আছে নাভিসহ সবটুকু পেট। চুল শুকিয়েছে সে, এলো করে ছেড়ে দিয়েছে পিঠের ওপর, মখমলের মত চকচক করছে। 'আমি তৈরি,' বলল সে, তার চোখ দুটো লাশটাকে এড়িয়ে গেল।

'কোথায় বাঁধা ছিল ইয়টটা?' জানতে চাইল রানা। 'সকালে যখন এলাম, তখন তো দেখিনি।'

রানার হাত ধরল মিলি। 'এসো আমার সাথে,' বলে একটা

পথ ধরে এগোল সে। ভিলাটা ঘুরে ব্লাফ-এর শেষ মাথায় চলে এল ওরা। নিচে শান্ত একটা লেগুন দেখা গেল। প্রকৃতির তৈরি একটা বাঁধ হ্রদটাকে সাগর থেকে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে, শুধু মাঝখানে সামান্য ফাঁক দেখা গেল। নিচের সবুজ ঝোপ আর গাছপালা থেকে পাহাড়টা উঠে এসেছে একেবারে খাড়াভাবে, মাথায় ভিলাটা রত্নখচিত মুকুটের মত। 'গোপন হ্রদ, কি বলো?'

'এই একটা জায়গা বাদে অন্য কোথাও থেকে দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব,' বলল মিলি।

'চলো, কেটে পড়ি। রোডস টাউনে পৌঁছে পুলিসে খবর দেবে তুমি।'

মুখ শুকিয়ে গেল মিলির। 'কাকে?'

'পুলিসকে। ফোনগুলো একটাও কাজ করছে না।' মিলির চোখে উদ্বেগ লক্ষ করল রানা। 'আগে বা পরে আসবেই পুলিস। ওদেরকে খবর দিতে দেরি করেছ তুমি, ব্যাপারটা যেন সেরকম না দেখায়। তা দেখালে তোমাকে সন্দেহ করতে পারে ওরা।'

বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে সিমকার দিকে এগোল ওরা। উত্তপ্ত বিকেলে চারদিক থেকে পোকামাকড়ের ডাক ভেসে আসছে। একটা গাছের নিচে মাটি প্রায় ঢাকা পড়ে আছে খসে পড়া কমলায়।

'কি বলব ওদের আমি?' জানতে চাইল মিলি।

'সাঁতার কাটছিলে, ক্লিফ-এর নিচে। কিছু শোনোনি বা দেখোনি। ভিলায় ফিরে এসে প্রথম জানতে পারলে। ফোন কাজ করছে না দেখে হাইওয়েতে চলে আসো, তারপর লিফট নিয়ে শহরে।' মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'কি, পারবে ম্যানেজ করতে?'

'না পারার কি আছে।' নার্ভাস দেখাল মিলিকে।

'কথার প্যাঁচে তোমাকে ওরা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে। যদিও, আসলে সত্যি কথাই বলছ তুমি, একটা পর্যায় পর্যন্ত। কথা পাল্টাবে না।' সিমকার দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা। প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল মিলি। দরজার দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'আমার বা জর্জের কথা মুখেও আনবে না, কেমন?'

পিছু হটে জলপাই ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সবুজ সিমকা, গলি ধরে হাইওয়ের দিকে এগোল। হাইওয়েতে পৌঁছুনোর আগেই বুড়োটাকে দেখতে পেল ওরা। বুড়োর মাথায় বিশাল স্ট্র হ্যাট, পায়ে বুট জুতো। একটা গাধাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে। গাধার পিঠে শুকনো ডালপালার মস্ত বোঝা।

'ধুত্তোরি ছাই!' হুইলের ওপর চাপড় মারল রানা। 'জঙ্গল থেকে বেরোবার আর সময় পেল না লোকটা!'

'ওকে আমি চিনি, ফলের বাগানে কাজ করে,' লোকটাকে পাশ কাটাবার সময় বলল মিলি।

'গাড়িটাকে যদি চিনে রাখে, তাহলেই...'

মিলি আশ্বাস দিয়ে বলল, 'বুড়ো হয়তো ভিলার দিকে যাবে না।'

তবু রানার মনে হলো, ভাগ্য ওর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

দ্বীপের গ্রামগুলো ছোট ছোট, একটার পাশে আরেকটা, সাদা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মধ্য গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ দেয়াল থেকে ছিটকে এসে ধাঁধিয়ে দিল ওদের চোখ। কোস্টাল হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে ছোট্ট সিমকা। ওদের বাঁ দিকে উপত্যকাগুলো গিয়ে ঠেকেছে রোদে পোড়া পাহাড়শ্রেণীর গোড়ায়, পাহাড়ের ওই

সারিটাকেই রোডস আইল্যান্ডের মেরুদণ্ড বলা হয়। বয়স্কা এক মহিলাকে দেখল ওরা, মাথায় লাল রুমাল জড়িয়ে লালচে-বেগুনি ফুল দিয়ে সাজানো সাসটা গাছের নিচে বসে এক পাল ছাগলের ওপর নজর রাখছে।

হাত তুলে গাছটা দেখাল মিলি, বলল, 'তুমি জানো, প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করত ওই গাছের পাতার গন্ধ অ্যান্টিঅ্যাফ্রোডিজিয়াক? মানে, কামোদ্দীপক-এর উল্টোটা?'

'তাহলে ব্যাক করা দরকার গাড়ি,' বলল রানা। 'চলো, গন্ধটা শুঁকিয়ে আনি তোমাকে।'

খসখসে গলায় চাপা হাসি, সীটের ওপর ছটফট করে উঠল মিলি। 'জীবন কি সুন্দর! আজ সকালের ওই ঘটনার পর, পৃথিবীকে আমি ভালবেসে ফেলেছি!' জানালা দিয়ে পীচ-এর বাগান দেখছে সে। 'সূর্যের নিজস্ব ভূমি এটা, জানো। সত্যি তাই। সূর্য দেবতা হিলিয়স তাঁর কনে হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন এটাকে।'

'তোমার বাড়ি বুঝি এখানেই?'

'না। করিন্থ। পেলোপনিস-এ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিলি। 'তবে এখানে হলে ভাল হত।'

রোডস সম্পর্কে সব জানে মেয়েটা। তিন হাজার বছর আগে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার যে-কোন শক্তির সমকক্ষ ছিল দ্বীপটা। লিনডিয়ানরা, সম্ভবত আজ যে জেলেরা ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল তারা, খ্রিস্টের জন্মের সাতশো বছর আগে কলোনি হিসেবে গড়ে তোলে নেপলসকে। রোডস টাউন বলে তখন কিছু ছিল না। লিনডোস আর পাশে দুটো ছোট শহর মিলে আলাদা একটা আকৃতি পায়, পঞ্চম শতাব্দীতে গড়ে ওঠে দ্বীপের

নতুন রাজধানী–প্রাচীন গ্রীসে ওটা ছিল সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিকল্পিত শহর। সে-যুগের সেরা শিল্প আর স্ট্যাচু স্থান পায় রাজধানীতে। ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস, দুই পণ্ডিতই এখানে পড়াশোনা করেন। আইনেও অবদান রাখে দ্বীপটা, প্রগতিশীল বাণিজ্যিক আইন গোটা রোমান সাম্রাজ্যে প্রয়োগ করার জন্যে গ্রহণ করেন অগাস্টাস সিজার।

হেডরেস্টে হেলান দিল মিলি। বাতাসে কি একটা বুনো ফুলের গন্ধ।

আসগোরু গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোল সিমকা, নীলচে সিল্কের মত আকাশের গায়ে একটা সুচ ঢুকে আছে বলে মনে হলো তুর্কী মসজিদের মিনারটাকে।

'আমি কোস্টাসের কথা ভুলতে পারছি না,' বলল মিলি।

'তাকে তুমি ভালবাসতে?'

মিলির কানে লম্বা দুলজোড়া দুলে উঠল। 'আমি…আমি জানি না। তবে, ও আমাকে ভালবাসে, এটা আমার জন্যে গ্রেট ফান ছিল।' এক মুহূর্ত পর বিষণ্ন সুরে বলল, 'ওখানে ও পড়ে রয়েছে, আর আমি তোমার সাথে চলে যাচ্ছি, অপরাধবোধে ভুগছি আমি।'

'আমাদের আর কিছুই করার ছিল না,' বলল রানা। 'মনে রেখো, লোকটা অ্যারোনাফিস না-ও হতে পারে।'

'তুমি এত নিষ্ঠুর হও কিভাবে?' হঠাৎ রাগের সাথে রানার দিকে তাকাল মিলি। 'আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিতে তোমার খারাপ লাগছে না?'

'মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'লাশটা যে-কারও হতে পারে। অ্যারোনাফিসের ইয়টটা তো আর নিজে থেকে আমাদেরকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেনি।'

‘তাহলে?’

রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রাখল রানা। ‘ভিলায় ফিরে আমরা নতুন কোন গাড়ি দেখিনি, ঠিক? কাজেই, আমরা যদি ধরে নিই অ্যারোনাফিসকে খুন করার পর খুনিরা ইয়ট নিয়ে পালিয়েছে, তাহলে তাদের গাড়িটা গেল কোথায়, যে-গাড়িতে করে ভিলায় পৌঁছুল তারা?’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মিলি। ‘কিছু লোক ইয়টে করে পালিয়েছে, কিছু লোক গাড়িতে করে?’

‘হতে পারে।’

রোডস টাউনে পৌঁছে গেল সিমকা, বাঁক ঘুরে ভিরোনস স্ট্রীটে ঢুকল রানা। এই রাস্তাটাই মধ্যযুগীয় ইউরোপের সবচেয়ে দুর্গম দুর্গগুলোকে ঘিরে রেখেছে। বিশাল আকৃতির এই সব প্রাচীর আর পাথুরে প্যারাপেটগুলো তৈরি করেছিলেন জেরুজালেমের সেইন্ট জন-এর নাইটরা, ওখান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন যাঁরা চোদ্দশো শতাব্দীতে।

রোডস টাউন আজ ট্যুরিস্টদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে। শর্টস আর সানগ্লাস পরা যুবক-যুবতীদের সবখানে দেখা যাবে, বেশিরভাগ স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলো থেকে এসেছে।

তিন মাইল জুড়ে ব্যাটলমেন্ট, তারই মধ্যে পড়েছে রানার হোটেল, পুরানো শহর, কোলাচিয়াম বা নাইটস কোয়ার্টার, আর তুর্কী ডিস্ট্রিক্ট। মিলির অ্যাপার্টমেন্ট নিয়া কোরা-য়, অর্থাৎ নতুন শহরে, প্রাচীরের বাইরে। সরকারী অফিস, ডিউটি-ফ্রি শপ, ইত্যাদি সব নতুন শহরেই দেখা যাবে। পাঁচতারা হোটেলগুলো দ্বীপের উত্তর প্রান্তে।

রোডস টাউনে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ফুল। ফুলের দোকান

তো আছেই, প্রতিটি রাস্তার পাশে ফেরিওয়ালারা সার সার বসে দুনিয়ার ফুল বিক্রি করছে। ভেসপা, মোটরসাইকেল গিজ গিজ করছে রাস্তায়, রাস্তা পেরোনো মহা ঝামেলার ব্যাপার। ব্যাংক অভ গ্রীস বিল্ডিং-এর কাছে বাঁক নিয়ে ভিরোনস স্ট্রীট ত্যাগ করল রানা, ওর পিছনে ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে নাইটস ক্যাসল। মানড্রাকি হারবারে ঝলমলে সাদা একটা ক্রুজ লাইনার আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। ইয়ট আর বিভিন্ন আকৃতির বোটগুলো লম্বা পাথুরে জেটিতে নোঙর ফেলেছে, মধ্যযুগীয় উইন্ডমিলগুলো বাতাস পেয়ে ঘুরছে অনবরত।

ফুটপাতের উন্মুক্ত কাফেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল সিমকা। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে কফি, টম টম কোলা বা আলফা বিয়ারে চুমক দিচ্ছে ট্যুরিস্টরা।

বাঁক নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এল সিমকা, মুরাদ রেইস-এর মসজিদটা দেখা গেল, মিনারটা সাদা। মসজিদের উল্টো দিকে মিলিকে নামিয়ে দিল রানা। মসজিদের সাথেই কবরস্থান, পাইন আর ইউক্যালিপটাস দিয়ে ঘেরা।

‘পুলিসকে খবর দেয়ার পর আমার হোটেলে ফোন করবে তুমি,’ মিলিকে বলল রানা। ‘ব্যাপারটা কিভাবে নিল ওরা, আমার জানা দরকার।’ হোটেলের স্যুইট নম্বর জানিয়ে দিল ও।

অল্প দূরে অ্যাপার্টমেন্ট, হেঁটেই রওনা হলো মিলি। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পাহাড়ী পথ ধরল রানা।

ওর হোটেলটা, কামাল ইন্টারন্যাশনাল, তুর্কী এলাকায়। পনেরোশো খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছে দালানটা। হোটেলের সামনে ছোট একটা চৌরাস্তা, মাঝখানে সুদৃশ্য একটা কৃত্রিম ঝর্না। ঝর্নার পাশে আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল একটা ট্যাক্সি।

চারদিকে ছোট ছোট দোকান, লোকজনের ভিড়, ফেরিওয়ালাদের উপদ্রব। বর্শা ও তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করছে ট্যুরিস্টরা। ভেসপা আর সাইকেল গিজগিজ করছে চারদিকে।

হোটেলের সামনে থামার আগে পিছনটা ভাল করে দেখে নিল রানা। কেউ পিছু নিয়ে থাকলে ওর চোখে ধরা পড়ত। এত থাকতে কামাল ইন্টারন্যাশনালে ওঠার কারণ হলো, শত্রুপক্ষের তালিকায় যারা আছে তারা জানে মাসুদ রানা সব সময় অভিজাত হোটেল ছাড়া ওঠে না।

গথিক খিলানের নিচ দিয়ে হোটেলে ঢুকল রানা, কালো আর সাদা মোজাইক পেরিয়ে লবিতে চলে এল। 'আমার এক বন্ধু রিজার্ভ করেছে স্যুইট,' ডেস্কে বলল ও। 'রেজিস্টারটা দেখতে পারি?'

'অবশ্যই, স্যার!'

খাতার নামগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বোলাল রানা, কোনটাই স্মৃতিকে নাড়া দিল না। সেটা বন্ধ করে এলিভেটরের দিকে এগোল ও। ভিলায় যারাই আগুন দিয়ে থাক, তারা সম্ভবত ওর খোঁজে ওখানে যায়নি। তবে রানা যদি ধরে নেয়, ওকেই খুন করার চেষ্টা হয়েছিল, দূরদর্শিতার পরিচয় দেবে।

এলিভেটরে ঢোকার আগে ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার লবির দিকে তাকাল রানা। দেয়ালে মধ্যযুগীয় ঢঙে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে লণ্ঠনগুলো। দিনের এই সময়টায় লোকজন নেই বললেই চলে। দু'চারটে মুখ, সব ক'টাকে নিরীহ বলে মনে হলো।

কামরায় ঢোকার সময় অভ্যস্ত সাবধানতা অবলম্বন করল রানা। ফার্নিচারগুলো গাঢ় রঙের আর ভারি। কুশনগুলোর কাভার হলুদ আর নীল ডোরাকাটা। প্রতিটি কামরার দেয়াল আকাশ নীল।

জানালার কার্নিশে বাকবাকুম করছে একঝাঁক পায়রা। জানালা-পথে টালি লাগানো বাড়িঘর দেখা গেল। আরও দূরে সাগর।

শাওয়ার সেরে লাঞ্চের অর্ডার দিল রানা। সামুদ্রিক মাছ মালিট, ক্রীম মাখানো রোস্ট করা খাসীর রান আর তরমুজ।

চারটে বাজতে চলল। অস্বস্তিবোধ করছে রানা। মিলি ফোন করেনি কেন?

তাই বলে কাজ ফেলে বসে থাকা চলে না। সুটকেস থেকে দুটো প্লাস্টিক পিলবক্স বের করল ও, একটা লাল, অপরটা ফার্মেসী-হোয়াইট। বহুরঙা পিলগুলো বের করে বিছানার ওপর রাখল ও। সাদা বাক্সটার ভেতর নখ দিয়ে খোঁচা দিল, গোপন ঢাকনিটা সরে যেতেই বেরিয়ে পড়ল অসংখ্য ফুটোসহ একটা প্লেট। এরপর স্ক্রু আলগা করে, বাক্সের বাইরের দিকের অর্থাৎ নিচের ঢাকনিটা খুলে ফেলল, সুতোর সাহায্যে ভেতরে ঢোকাল একটা রাবার কলার, সবশেষে ফ্লেক্সিবল কলারটা নিখুঁতভাবে আটকে দিল ওর রূম টেলিফোনের মাউথপীসে। ইলেকট্রনিক মাইক্রোটেকনোলজির অবদান, সিলিকন–চিপ দিয়ে তৈরি, ভয়েস স্ক্র্যাম্বলারটা এখন ব্যবহার করতে পারে রানা। লাল পিলবক্সেও একই কারিগরি ফলাল ও, আটকাল ইয়ারপীসে। সব মিলিয়ে এক মিনিটের মত লাগল।

বি.সি.আই. এথেন্স কন্ট্রোল থেকে অচেনা একটা কণ্ঠস্বর সাড়া দিল। নিজের পরিচয় দিয়ে স্ক্র্যাম্বলার ট্র্যান্সমিশনের জন্যে অনুরোধ করল রানা।

'ইউ হ্যাভ গট ইট, স্যার,' জবাব এল কন্ট্রোল থেকে।

সংযুক্ত মাউথ আর ইয়ারপীসের প্রেশার-সেনসিটিভ অংশ স্পর্শ করল রানা, প্লাস্টিক ভেদ করে বেরিয়ে এল লালচে অস্পষ্ট

আভা। ‘চন্দন সরকারের সাথে কথা বলব আমি,’ বলল ও।

‘এক মিনিট।’

হোল্ড বাটনে চাপ পড়তে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। রোদ যেন সাদা আগুনের মত ছড়িয়ে আছে শহরটার ওপর।

‘স্যার?’

‘শুনছি।’

‘চন্দন সরকার রোডসের পথে রয়েছেন।’

‘এখানে আসছে? আমাকে তো বলেনি!’

‘এইমাত্র রওনা হয়েছেন, স্যার।’

‘কেন?’

‘তা জানার অধিকার আমাকে দেয়া হয়নি, স্যার।’

‘ঠিক আছে, দেখা হলে জেনে নেব আমি। আমার একটা কাজ করতে পারবে?’

‘বলুন, স্যার।’

‘সুয়েজ ক্যানেল কনভয় সম্পর্কে। দক্ষিণমুখী পরবর্তী কনভয়টা আল-বালাহ বাইপাসে কখন পৌঁছুবে?’

‘লাইনে থাকুন, আমি দেখছি।’

চেয়ারে হেলান দিয়ে লেবু রঙা সিলিঙে তাকাল রানা। দূর থেকে মোয়াজ্জিনের গলা ভেসে আসছে, অল্প যে-ক’জন তুর্কী আছে তাদেরকে নামাজ পড়ার জন্যে ডাকছে। বেশিরভাগই তারা বারো মাইল দূরে স্বদেশে ফিরে গেছে, উনিশশো বারো সালে ইটালিয়ানরা দ্বীপটা দখল করে নেয়ার পর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রোডস আবার গ্রীসের একটা অংশে পরিণত হয়।

এথেন্স কন্ট্রোল থেকে বলা হলো, ‘একটা কনভয় এইমাত্র

বাইপাসে পৌঁছুল।'

'প্রথমটা,' বলল রানা। 'আমি দ্বিতীয়টা সম্পর্কে আগ্রহী।'

'দ্বিতীয়টা পৌঁছুবে বারোশো ঘণ্টায়, পনেরো মিনিট আগে বা পরে।'

'ধন্যবাদ।'

'আর কিছু, স্যার?'

'না, ধন্যবাদ।'

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে সময়ের একটা হিসেব করল রানা। এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে নয়শো মাইল পাড়ি দিয়ে পোর্ট সাঈদে পৌঁছুনো একটা লিয়ারজেটের জন্যে কোন সমস্যা নয়। রাতের অন্ধকারে রওনা হবে ওরা, তারপরও হাতে কিছু সময় থাকবে। তবে সময়টা এমনভাবে ভাগ করে নিতে চায় ও, ওরা যেন জাহাজটা নোঙর করার সময় পৌঁছোয়।

জাহাজে ওঠার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেমে আসতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে আসতে হবে মিশর থেকে।

ধরতে পারলে আকাশ-সীমা লংঘনের অভিযোগ তুলে মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু রানার সামনে বিকল্প কোন পথও খোলা নেই। নিয়ম হলো, প্রাইভেট কোন প্লেন মিশরে ঢুকতে চাইলে চব্বিশ ঘণ্টা আগে অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে।

মিগ বিমান আর স্যাম ক্ষেপণাস্ত্রের কথা মনে পড়লেও, গ্রাহ্য করল না রানা। সিভিলিয়ান প্লেন, সাবধান না করে গুলি করবে বলে মনে হয় না।

রাতটা টেনশন আর ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে, যে-টুকু সময় পাওয়া যায় ঘুমিয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না। কাল রাতের বেশিরভাগ সময় ইন্টারকন হোটেলের ক্যাসিনোয় কাটিয়েছে ও,

ডাচ জর্জের জুয়াড়ী বন্ধু হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে নিজেকে। অভিজ্ঞতা থাকায়, সামান্য কিছু জিতেছে ও।

ইন্টারকনে ফোন করে জর্জের নামে একটা মেসেজ দিল রানা। লোকটার সঙ্গ পছন্দ করে না ও, তবে জানে এইচআরসি-র সাথে কাজ করতে হলে কিছু কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। গোটা অ্যাসাইনমেন্টটা বি.সি.আই. তাদের হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে, এটা ওদেরকে ভাবতে দেয়া চলবে না। তা না হলে একশো একটা রাজনৈতিক বিপদ দেখা দেবে।

নিচের রাস্তাটায় একবার চোখ বোলাল রানা। একটা পাহাড়ের ঢাল জুড়ে দোকান-পাট সাজানো হয়েছে, ট্যুরিস্ট ক্রেতাদের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। তুর্কী বাড়িঘরগুলো চেনা যায় ইসলামী স্থাপত্যরীতির কল্যাণে, ঝুল-বারান্দাগুলো খালি। কালো আলখেল্লা পরা বৃদ্ধ এক পাদ্রী এক পা এক পা করে হেঁটে গেল হোটেলের সামনে দিয়ে।

কেউ যদি ওর ওপর নজর রেখেও থাকে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না রানা।

জানালার পর্দা টেনে দিল ও, বালিশের তলায় অস্ত্র রেখে বিছানায় লম্বা হলো। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।

তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভাঙল রানার। চোখ খুলল না, হাতড়ে খুঁজে নিল ফোনের রিসিভারটা। ‘হ্যালো।’

‘আমি লাউঞ্জে…’

‘চন্দন?’

‘জ্বী, মাসুদ ভাই।’ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ক্রেডলে রিসিভার রেখে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল

রানা, তারপর চারদিকে তাকাল। ঘরের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করল, আলোটা চোখে সয়ে আসতে হাতঘড়ি দেখল। ন'টা বেজে চোদ্দ মিনিট। ভেবেছিল আরও আগে ঘুম ভাঙবে।

চন্দন এল কেন?

তারচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, মিলির কোন খবর নেই।

বিছানা ছেড়ে নামল রানা, জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। পুব আকাশে ভোরের আভা ফুটতে শুরু করেছে। পাকা আঙুরের মত লাগল কাছাকাছি আকাশের তারাগুলোকে। রাস্তায় লোকজন নেই।

গায়ে জ্যাকেট চড়াচ্ছে রানা, ভাবছে মিলির কথা। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। ভাল কিছু না হবারই সম্ভাবনা। ধরা পড়েছে অপরাধীদের হাতে, ভিলায় যারা আগুন দিয়েছিল? সন্দেহবশত আটকে রেখেছে পুলিস?

নাকি কেটে পড়েছে মিলি, ঝামেলা থেকে দূরে সরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? চিন্তা করার সময় পেলে সব মানুষই প্রথমে নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবে। স্থানীয় লাইসেন্স না থাকায় রোডস এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন নিয়ে উঠতে পারবে না রানা, অল্প সময়ের নোটিসে আরেকজন পাইলট খুঁজে পাওয়াও সম্ভব নয়। ওদিকে নেমিসিসও ওর জন্যে সুয়েজ ক্যানেলে অপেক্ষা করবে না।

কামরাটা ভাল করে দেখে নিল রানা, তারপর নিচে নামল।

লাউঞ্জে লোকজন নেই বললেই চলে। আলো খুব কম হলেও চন্দনকে চিনতে পারল রানা। এক কোণে একটা সোফার ওপর পিঠ খাড়া করে বসে আছে সে, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। চকচকে লালচে একটা টাই পরে আছে সে।

'আপনি জানেন, মাসুদ ভাই, নেমিসিসকে খুঁজে পেয়েছি আমরা?'

'মেসেজটা দিয়েছে জর্জ,' বলল রানা, চন্দনের সামনের সোফায় বসল, হাত নেড়ে বিদায় করল ওয়েটারকে।

'আপনি এখন কি ভাবছেন?' জানতে চাইল চন্দন।

'ক্যানেলে যাব, জাহাজটায় চড়তে হবে।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছি, মাসুদ ভাই। তবে ঝুঁকি আছে, আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

রানা কিছু বলল না। চন্দনকে নার্ভাস বলে মনে হলো ওর। কেন এসেছে, বলছে না কেন?

'আপনি কি, মাসুদ ভাই, এখুনি রওনা হবেন?'

'আমার পাইলট যদি হাজির হয়। মিলি পুলটিস। অ্যারোনাফিসের গার্লফ্রেন্ড।'

'মাই গড!'

'তোমার সমস্যাটা কি, চন্দন? নেমিসিস বা নিকোলাই প্যাসিমভ সম্পর্কে কথা বলার জন্যে আসোনি তুমি।'

'মেয়েটার সাথে পুলিস যেন আপনাকে দেখতে না পায়, মাসুদ ভাই,' বলল চন্দন। 'গ্রীক পুলিস দুই আর দুই পাঁচ বানাতে ওস্ত াদ।'

রেগে গেল রানা, 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল ও।

'অ্যারোনাফিস অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি, মাসুদ ভাই। পুলিসের ধারণা, আপনি তাকে খুন করেছেন। আপনি আর মিলি।'

অবাক চোখে চন্দনের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

চন্দন বলে চলেছে, 'গ্রীক ইন্টেলিজেন্স বিকেলে আমার সাথে

যোগাযোগ করেছিল। পুলিস বিভাগে ওদের লোক আছে। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে কয়েক ঘণ্টা ধরে জেরা করা হচ্ছে মিলিকে। আমাদের সম্পর্কে কতটুকু জানে সে, মাসুদ ভাই?'

'কিছুই জানে না,' বলল রানা। 'আমার নামটা কিভাবে উঠল?'

'অকুস্থলের কাছাকাছি ভাড়াটে গাড়ি। কেউ একজন লাইসেন্স নম্বর মনে রেখেছে। মেয়েটাকে তারা একজন পুরুষের সাথে ফিরতে দেখেছে। "অকুস্থল থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল", এভাবে ব্যাখ্যা করছে পুলিস।'

'আমি কে তা ওরা জানে?'

'এখনও জানে না। জানতে পারলে আপনার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করবে ওরা। গ্রীক ইন্টেলিজেন্সকে ধরতে পারি আমরা, ওদের সাথে আমাদের সম্পর্ক মোটামুটি ভাল, কিন্তু পুলিস বিভাগের ওপর ওদের কোন প্রভাব নেই। গ্রেফতার করতে পারলে পুলিস আপনার বিরুদ্ধে চার্জশীট দেবে, বিচার করে ছাড়বে। তবে যদি গ্রেফতার এড়িয়ে যেতে পারেন...'

'গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের অনেক উপকার করেছি আমরা অতীতে, ওরা কোন সাহায্যে আসবে না?'

'আসবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে চাপ দেয়া হচ্ছে, গ্রীস থেকে আপনাকে যেন সরিয়ে দেয়া হয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল চন্দন। 'গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের বন্ধুরা বলছে, মন্ত্রণালয়কে বোঝাবার জন্যে জোরাল দু'একটা যুক্তি তাদের হাতে থাকা দরকার।'

'ওদেরকে বলো, অ্যারোনাফিস মারা না-ও গিয়ে থাকতে পারে।'

'সবাই ধরে নিয়েছে, নির্ঘাত মারা গেছে সে। তা না হলে লাশটা কার?'

‘কি জানি।’ চিন্তিত ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল রানা। ‘তবে, একটা ইয়ট আমাদেরকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছিল, আমাকে আর মিলিকে। সার্ফ-লাইনের সামনে ডাইভ দিচ্ছিলাম আমি। আমার কেন যেন মনে হয়, ইয়টের লোকটা অ্যারোনাফিসই ছিল।’

‘ক্রিমিনালরা নয় কেন? আপনাকে যখন মারার চেষ্টা করছিল?’

‘ক্রিমিনালরা দায়ী নয় বলে মনে হয় এই জন্যে যে ভিলায় তারা কোন গাড়ি ফেলে যায়নি। আরেকটা কথা, একশো ফুটি একটা ইয়ট চুরি করা অত্যন্ত ঝামেলার কাজ, সেটাকে ফেলে পালানোও সহজ নয়। খুন করার অস্ত্র হিসেবেও ওটা ভোঁতা আর অচল। ইয়ট থামিয়ে আমাদেরকে গুলি করেনি কেন তারা? ভিলায় তো তাই করেছে। ইয়টটা এমনকি আমরা মারা গেছি কিনা দেখার জন্যে একবার চক্করও দিল না।’

‘তাহলে ব্যাপারটা...?’

‘সমস্ত লক্ষণই বলছে, জান নিয়ে পালাচ্ছিল কেউ, সামনে কি আছে না আছে দেখার মানসিকতা তার ছিল না।’ সোফায় হেলান দিল রানা।

‘ব্যাপারটা তাহলে কি রকম দাঁড়াচ্ছে? শুরু থেকেই কেউ একজন অ্যারোনাফিসকে খুন করার চেষ্টা করছে?’

‘হতে পারে। একটা নয়, আমরা সম্ভবত দুটো ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা যখন নিকোলাই প্যাসিমভকে খুঁজছি, আরেকটা দল তখন অ্যারোনাফিসকে খুন করার চেষ্টা করছে।’

নাক চুলকাল চন্দন। ‘এথেন্স ছাড়ার আগে আমি একটা তথ্য পেয়েছি, মাসুদ ভাই। ভাবছি সেটার সাথে ব্যাপারটার সম্পর্ক

আছে কিনা।'

'কি তথ্য?'

ক্ষীণ হাসল চন্দন। 'আমরা জানতে পেরেছি, নেমিসিসের মালিক অ্যারোনাফিস।'

'দুটো ঘটনা দেখছি এক হয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা।

লাউঞ্জের প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে ছিল চন্দন, তার চোখ সরু হয়ে গেল। 'মাসুদ ভাই, বিপদ!' বিড় বিড় করে বলল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, গ্রীক পুলিসের ইউনিফর্ম পরা দীর্ঘদেহী একজন অফিসারকে দেখতে পেল। লোকটার নাকের নিচে বিশাল গোঁফ।

অফিসারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিলি, তার লম্বা করা হাতের আঙুল সরাসরি রানার দিকে তাক করা।

পাঁচ

লাফ দিয়ে সোফা ছাড়ল রানা, পিছনের দরজার দিকে ছুটল। ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল একটা চেয়ার, একজন ওয়েটার পিছিয়ে যেতে গিয়ে আছাড় খেলো।

'স্টাটামাটিস্ট! স্টপ!' দুই ভাষাতে গর্জে উঠল অফিসার।

পিছনে চন্দনের পায়ের আওয়াজ পেল রানা। খোলা একটা দরজা দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে এল ওরা। মান্ধাতা আমলের একটা ল্যাম্পপোস্টে টিম টিম করে আলো জ্বলছে, কাঁকর ছড়ানো সরু গলিটা দেখা গেল কিছুদূরে।

কোন কথা হলো না, চন্দন ছুটল একদিকে, আরেকদিকে রানা। পুলিসের তাড়া খেলে কি করতে হয়, দু'জনেরই জানা আছে। সামনে এক প্রস্থ পাথুরে সিঁড়ি দেখে তর তর করে কয়েক ধাপ নেমে পড়ল রানা, এই সময় লাউঞ্জের দরজা সশব্দে খুলে গেল ওর পিছনে। ছিটকে বেরিয়ে এল পুলিস অফিসার, তার ক্যাপের কার্নিশে ঢাকা পড়ে আছে চোখ। একটা কব্জি ধরে মিলিকে টেনে আনল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, মিলি কোন রকম বাধা দিচ্ছে বলে মনে হলো না। গ্রীক অফিসার কি যেন বলল, ঠিক বোঝা গেল না। মিলি উত্তর দিলেও, শুনতে পেল না রানা।

গলির ভেতর কিছুই নড়ছে না।

পাহাড়ের নিচে, ক্রেন বহুল হারবার অসংখ্য বোটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। একটানা বাতাসে নুয়ে পড়েছে পামগাছগুলো, যদিও পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকায় রানার গায়ে কোন বাতাস লাগছে না। চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করছে রানা। গলি থেকে ওর নাকে উঠে আসছে আবর্জনা আর মরা বিড়ালের গন্ধ।

রানা জানে, অফিসারের কাছ থেকে মিলিকে ছিনিয়ে আনতে হবে ওর।

রানার বিশ্বাস, ওর চেহারাটা ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি অফিসারের। তবে ওর সাথে মিলি থাকলে, ব্যাপারটা হবে

পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে পতাকা ওড়ানোর মত। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে কোন উপায় নেই। মিলিকে ওর দরকার। নেমিসিস আবার অদৃশ্য হবার আগে একমাত্র মিলিই পারে ওকে সুয়েজ খালে পৌঁছে দিতে।

গলিটা পেরুচ্ছে অফিসার।

সিঁড়ির আরও কয়েকটা ধাপ নিচে নেমে ল্যান্ডিঙের কোণে আড়াল নিল রানা।

অফিসার বুঝতে পেরেছে, গলির শেষ মাথায় পৌঁছুনোর সময় পায়নি রানা। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সে, দ্রুত ডানে বাঁয়ে তাকাচ্ছে। সিঁড়ির ধাপগুলো অস্বাভাবিক চওড়া।

পাঁচ ছ'টা ধাপ নেমে এসে থামল অফিসার, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

মিউনিসিপ্যালিটির বাগানে গানের আসর বসেছে, লাউডস্পীকার থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের দেশাত্মবোধক গান। গলির মুখের কাছ থেকে একটা ভেসপা স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। গলি দিয়ে হেঁটে গেলেন ঢিলে জোব্বা পরা এক মৌলভী, মসজিদটা কাছেই। তাঁর পিছু পিছু মাথায় তরকারির ঝাঁকা নিয়ে হেঁটে গেল একজন ফেরিওয়ালা।

চন্দন কোথায় লুকিয়েছে রানা জানে না। তবে কাছাকাছি কোথাও হবে বলে ধারণা করল ও। রানা ছুটলে, সে-ও ছুটবে। কিংবা চন্দন ছুটলে, ছুটবে রানাও। এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কে আগে পালাবার চেষ্টা করবে?

অফিসারের কোমরে পিস্তল রয়েছে।

আরেকবার পিছন দিকে তাকাল অফিসার, এই সুযোগে বাকি ধাপ ক'টা টপকে নিচে নেমে এল রানা। এটা আরও একটা সরু

গলি।

পায়ের শব্দ হলো। অফিসার মিলিকে নিয়ে নামছে।

ল্যান্ডিঙে পৌঁছে থামল অফিসার। এদিক ওদিক তাকাল মিলি।

একটা ডাস্টবিনে লাথি মারল রানা, উল্টে পড়ল সেটা, তারপর ছুটল। হুঙ্কার ছাড়ল অফিসার, তারপর রানার উল্টোদিকে ছুটল, কারণ প্রথম গলি থেকে চন্দনের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে।

দ্বিতীয় গলি ধরে খানিকদূর ছুটে বাম দিকে বাঁক ঘুরল রানা, বিশগজ এগোল, বেরিয়ে এল ব্যস্ত চৌরাস্তায়, ওর হোটেলের সামনে।

ছোটার গতি কমাল রানা, দেখল এরইমধ্যে চারদিকে লোকজনের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। কয়েকটা ট্যাক্সি থেকে হোটেলের সামনে আরোহীরা নামল, তাদের মধ্যে একটা মেয়েকে মনে হলো মাতাল। কৃত্রিম ঝর্নার কাছ থেকে তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল একটা হুইসেল। সতর্কতার সাথে ওর দিকে এগোল দু'জন ইউনিফর্ম পরা পুলিস। রানা বুঝল, হোটেলের সামনেটা পাহারা দিচ্ছিল তারা। গলি থেকে নিশ্চয়ই তারা ওকে চৌরাস্তায় ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখেছে।

ট্যুরিস্টদের শহর, ইতিমধ্যে খুলে গেছে দোকান-পাট, দোকানের সামনে ফুটপাতের ওপর স্তূপ করা হয়েছে মালপত্র। সির‍্যামিক, আইকন, ছুরি, খেলনা, অলংকার, রেডিও, কি নেই। পথিকদের পাশ কাটিয়ে ছুটছে রানা, ফুটপাতে বেরিয়ে আসা একটা কফি শপের দুটো চেয়ার ধাক্কা লেগে পড়ে গেল। সমানে চিৎকার করছে পুলিস দু'জন, রানাকে ধাওয়া করে মাঝখানের

দূরত্ব অনেক কমিয়ে এনেছে তারা।

অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হাঁড়ি-পাতিলের একটা স্তূপ ফেলে দিল রানা। উল্টে দিল পীচ ফল আর আপেল ভর্তি একটা গাড়ি। পিছনে মহা শোরগোল শুরু হলো। বিশ গজ এগিয়ে ঝট্ করে একটা খোলা দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ল ও।

দোকানের পিছন থেকে হাসিমুখে এগিয়ে এল তুর্কী টুপি পরা দোকানদার। মোটাসোটা লোক সে, জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেছে। 'বলুন, মঁশিয়ে? আপনার জন্যে কি করতে পারি?' ফ্রেঞ্চ ভাষায় জিজ্ঞেস করল সে।

'আসসালামোআলায়কুম,' বলল রানা। 'পিছনের দরজাটা কোন্ দিকে বলুন তো? একটু বাথরূমে যাওয়ার দরকার ছিল।'

সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা। 'কি!'

আবার বলল রানা।

বিরক্ত হলো দোকানদার। 'দুঃখিত, ট্যুরিস্টদের জন্যে বাথরূমের কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। কিছু কিনবেন কিনা বলুন।'

'কিনব, তবে পরে,' বলে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা।

'এই ট্রে-টা দেখুন, সিনর। সোলায়মান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট...'

হাত বাড়িয়ে লোকটার শার্টের কলার চেপে ধরল রানা। 'পিছনের দরজাটা দেখান! জলদি!' বলে এক ধাক্কায় দোকানের একধারে তাকে ফেলে দিল ও। চারদিক থেকে ধসে পড়ল ছাতা, বাসন-পেয়ালার স্তম্ভ ইত্যাদি।

'এদিকে! এদিকে!' মেঝেতে পড়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ককিয়ে উঠল দোকানদার। 'ইয়া আল্লাহ্!'

কাউন্টার টপকে ভেতরে ঢুকল রানা, লোকটাকে হ্যাঁচকা টান

দিয়ে তুলল। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা আরেক কামরায়, সেখান থেকে ছোট্ট এক পাঁচিল ঘেরা উঠনে। পানির পাইপ থেকে পানি বেরুচ্ছে, একটা মেয়ে কাপড় ধুচ্ছে বালতি সামনে নিয়ে। মেয়েটার সাথে চোখাচোখি হতে মোটা দোকানদার কপালে করাঘাত করল। বুট জুতোর শব্দ শুনে বোঝা গেল দোকানের ভেতর ঢুকে পড়েছে পুলিস।

সিধে হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা, দু'কোমরে হাত রেখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল।

অন্ধকার একটা কামরায় ঢুকল রানা। গ্রীজ, মশলা আর কয়লার গন্ধ ঢুকল নাকে। এটা সেটার সাথে হোঁচট খেলো ও। একটা দরজা পেরোল, একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠল। বেরিয়ে এল সমতল ছাদে। টাঙানো রশির সাথে গাঢ় রঙের কাপড়চোপড় ঝুলছে, পত পত করছে বাতাসে। মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে হোটেলটা।

নিচতলা থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল মেয়েটার। দু'জন পুলিসের ধমকে চুপ করল সে।

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা হাত তুলল দোকানদার, 'ওদিকে!'

সিঁড়িটা দেখতে পেল রানা, বাড়ির গা বেয়ে সেই গলিটায় নেমে গেছে, হোটেল থেকে যেখানে প্রথম বেরিয়ে এসেছিল ও।

দ্রুত, নিঃশব্দে নেমে এল রানা, জানে বাড়ির ভেতর থেকে পুলিস দু'জনও যে-কোন মুহূর্তে ছাদে উঠে আসবে। গলিতে নেমে সামনের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল ও। হাসল আপনমনে।

পাথুরে সিঁড়ির গোড়ায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে মিলি, চেহারা দেখে মনে হলো কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

তার সামনে যেন আকাশ থেকে পড়ল রানা, খপ্ করে কব্জিটা

চেপে ধরল, তারপর সজোরে টান দিল।

'রানা!' ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকল মিলি।

'চুপ!'

গলি ধরে খানিকদূর এগিয়েই বাঁক ঘুরল রানা। তুর্কী এলাকায় সরু গলিগুলো গোলক ধাঁধার মত, একের পর এক বাঁক নিয়ে নিজেই পথ হারিয়ে ফেলল ও। কোন কোন গলি নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা, কোনটায় সাবেকী আমলের লোহার ল্যাম্পপোস্ট দেখা গেল, ম্লান আলো ছড়াচ্ছে। বিশাল, আকাশছোঁয়া একটা পাঁচিলের সামনে বেরিয়ে এল ওরা। এদিকে কোন ফুটপাত নেই। পিছন থেকে ভেসে এল পুলিসের হুইসেল।

রানার সাথে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেছে মিলি।

দু'দিকে আকাশছোঁয়া পাঁচিল, মাঝখানটা যেন পাতালপুরী। আলো এত কম যে চওড়া রাস্তাটার প্রান্ত দুটো কতদূরে বোঝা গেল না। হঠাৎ জোরে নাক টানল রানা। অচেনা ফুলের একটা গন্ধ পেয়েছে ও।

মনে হলো, বাম দিক থেকে বাতাস এসে লাগল ওর গায়ে। মিলিকে নিয়ে হন হন করে সেদিকে এগোল ও। একটু পরই একটা বাগান দেখা গেল। বাগানের মাঝখানে পথটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। পচা ফলের গন্ধও পেল রানা। পায়ের চাপে থেঁতলে গেল দু'একটা। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখল ওরা। নিচের দিকে নেমে গেছে।

ধাপ বেয়ে নামার সময় হোঁচট খেলো মিলি, খপ্ করে তাকে ধরে ফেলল রানা। এই সময় ভাল করে তার দিকে একবার তাকাল ও। দেখা হবার পর থেকে কোন কথা বলেনি সে, একবার শুধু ওর নামটা উচ্চারণ করেছে। এখনও তার মুখ থেকে কোন

শব্দ বেরুল না। তবে রানার বাহুটা সজোরে খামচে ধরেছে। চোখ দুটো বিস্ফারিতই বলা চলে। কাঁদছে না বটে, তবে ভয়ে একেবারে সিঁটকে আছে।

হঠাৎ বাঁক নিয়েছে সিঁড়িটা, সামনে নিরেট দেয়াল। দেয়ালের গা বেয়ে আরও কয়েকটা ধাপ নেমে গেছে, চারদিক ঘেরা জায়গাটার সিলিং খুব নিচু, হাত উঁচু করলেই ছোঁয়া যাবে।

থমকে দাঁড়াল রানা, তারপর সিঁড়ির গোড়া থেকে গাঢ় ছায়ায় সরে এল। গানের শব্দ, যানবাহনের আওয়াজ, সবই যেন অন্য কোন জগৎ থেকে ভেসে আসছে।

চঞ্চল পানির শব্দ শুনে বোঝা গেল, পাতালের এই উঠনের কোথাও একটা ঝর্না আছে।

ওপরের গেটটাকে পাশ কাটিয়ে গেল ছুটন্ত একজোড়া পা।

ছায়ার আরও ভেতর দিকে সরে এল রানা, হাত বাড়িয়ে স্যাঁতসেঁতে পাথুরে দেয়াল ছুঁলো। কর্কশ আর ঠাণ্ডা লাগল দেয়ালটা।

ভিজে শার্টটা বগলের কাছে চট চট করছে। গায়ে সেঁটে রয়েছে মিলি, ও একটু নড়লে আরও কাছে সরে এসে ওর শরীরে সেঁধিয়ে পড়তে চাইছে। একটা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল রানা। নারীদেহের অমূল্য সম্পদ বাঁক আর উত্থানগুলো অনুভব করতে পারছে। দীঘল ঊরুর চাপ লাগল পায়ে। বদ্ধ জায়গাটার বাতাস গরম আর ভাপসা।

রানা অনুভব করল, মিলির একটা হাত ওর গলা জড়িয়ে ধরল। চোখ নামিয়ে নিখুঁত বৃত্তাকার মুখটার দিকে তাকাল ও। আলগা চুলের কয়েকটা তার গালে লেগে রয়েছে, চকচক করছে সিল্কের মত।

‘রানা…,’ মিলির ঠোঁট দুটো উঠে এল রানার মুখের দিকে।

‘চুপ! নোড়ো না!’ চাপা কণ্ঠে বলল রানা, তাকিয়ে আছে সিঁড়ির দিকে।

মিলির আলিঙ্গন কঠিন হলো, তার শরীরের চাপে আরও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল। রানার বুকে মুখ ঘষল সে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি ভেবেছ, আমি তোমার সাথে বেঈমানী করেছি?’

‘পুলিসকে নিয়ে এল কে?’

‘দেখে যা মনে হলো, ব্যাপারটা তা নয়।’

‘হুম।’ পিছন দিকে তাকাল রানা। সিলিঙের নিচে গাঢ় অন্ধকার, দূরে কি আছে বোঝা গেল না। পুলিস আসছে কিনা শোনার চেষ্টা করল ও। ওর পাঁজরে মিলির হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে।

আবার কথা বলল মিলি, ‘আমাদের কি এভাবে পালিয়ে বেড়াতে হবে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাতে বিপদ আরও বাড়তে পারে, জানো তো?’

‘কি হবে সেটা পরে ভাবা যাবে,’ বলল রানা। ‘তার আগে কি ঘটেছে তাই বলো।’ মুখ নামিয়ে মিলির দিকে তাকাল ও। ‘তুমি এলে কেন? জেদ ধরতে পারতে, চিৎকার করতে পারতে।’

‘ভেবেছ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেছি আমি?’ ঝাঁঝের সাথে বলল মিলি। ‘জানো, ওরা আমার ওপর কি ধরনের টরচার করেছে? গায়ে শুধু হাত তোলেনি, কিন্তু এমন সব ভয় দেখিয়েছে…আমি যে এখনও হার্টফেল করিনি সেটাই আশ্চর্য!’

‘আমার সাথে চলে এলে কি মনে করে? ধস্তাধস্তি করতে পারতে।’

‘কি করতে তাহলে তুমি?’

‘মারতাম, সম্ভবত। অজ্ঞান করে টেনে আনতাম,’ গম্ভীর সুরে বলল রানা। ‘তুমি আমাকে মিশরে নিয়ে যাচ্ছ। আজ রাতে। চাও আর না চাও।’

‘তোমার সাথে জড়িয়ে পড়েছি আমি, রানা,’ বলল মিলি। ‘প্রথমবার তোমাকে দেখেই সেটা আমি টের পেয়ে গেছি। আমাদের নিয়তি একসুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে, তুমি বুঝতে পারছ না? দেবতারা তাই চাইছেন।’

‘জিয়াস আর তাঁর দলবলের ওপর তোমার দেখছি আজও বিশ্বাস আছে।’

‘অন্তত অবিশ্বাস করি না। এক সময় তো সবারই মঙ্গল করেছেন তাঁরা।’

মুখ তুলে অন্য দিকে তাকাল রানা। ‘তুমি দেখছি বদ্ধ একটা পাগল!’

ইমার্জেন্সী বেল-এর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে, সাইরেনের মত। শিউরে উঠল মিলি, রানার গলা ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল।

‘সম্ভবত আরও পুলিস আনা হয়েছে,’ বিড় বিড় করল রানা।

‘ওরা আমাকে কস দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়েছে,’ কাঁপা গলায় বলল মিলি। ‘ওখানে একটা জেলখানা আছে, কিছুদিন থাকলে নাকি মানুষ পাগল হয়ে যায়।’

‘তুমি আমাকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছ, কিন্তু তবু তোমাকে ক্ষমা করতে হবে আমার, এ-ধরনের কিছু বলতে চাইছ, নাকি?’

খানিক পর জবাব দিল মিলি, ‘আমি কোন অন্যায় করিনি, কাজেই ক্ষমা চাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না।’

‘পুলিসকে তুমি কি বলেছ?’

‘তুমি যা বলতে বলেছ। ভিলায় যখন আগুন লাগে আমি তখন সাঁতার কাটছিলাম। ফেরার আগে কিছুই আমি দেখিনি বা শুনিনি। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিফট নিয়ে শহরে আসি, খবর দিই পুলিসে।’ রানার দিকে চিন্তিত মুখে তাকাল মিলি। ‘কিভাবে যেন ওরা জানে কার সাথে শহরে এসেছি আমি। ভিলা থেকে আমরা একসাথে রওনা হই, তা-ও জানে ওরা। বাগানের সেই বুড়ো মালীটাই সম্ভবত বলে দিয়েছে ওদেরকে।’

‘হতে পারে,’ বলল রানা। ‘কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, আমাদের ওপর তার কোন আগ্রহ বা নজর নেই। বুড়ো একজন মালী, গাড়ির নম্বর পর্যন্ত মুখস্থ করে রাখল?’

‘তা না হলে পুলিস জানল কিভাবে?’

‘সম্ভবত অজ্ঞাতনামার ফোন কল থেকে। যারা আগুন ধরিয়েছে তাদের কেউ হতে পারে। তারা হয়তো ঝোপের ভেতর সিমকাটা আগেই দেখেছিল।’

‘তোমাকে তারা ফাঁসাবার চেষ্টা করবে কেন?’

মিলির সরল প্রশ্ন শুনে গম্ভীর হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ‘ওরা ফাঁসাবার চেষ্টা করায় আমার কাজ সহজ হয়নি, হয়েছে কি? ওদের ভাগ্য ভাল হলে, পুলিস আমাকে ধাওয়া করে দ্বীপটা থেকে ভাগিয়ে দেবে। খুনি পালিয়েছে এ-কথা জানার পর পুলিস আর কেসটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবে না। আসল খুনিরা বেঁচে গেল।’

‘কারা ওরা?’

‘তোমার জানার কোন দরকার নেই।’

‘কিন্তু আমি জানতে চাই, মানুষ তো আর বাতাসের ওপর রাগ করতে পারে না!’

‘বাতাসের সাথে তাদের খুব একটা পার্থক্যও নেই আসলে,’ বলল রানা। ‘তাদের অস্তিত্ব তুমি অনুভব করতে পারবে, কিন্তু ধরতে পারবে না।’

‘আ-আমার…আমার মন খুব খারাপ লাগছে,’ বিষণ্নসুরে বলল মিলি।

‘অ্যারোনাফিসের জন্যে?’

‘বন্ধু হিসেবে খুব ভাল ছিল কোস্টাস।’

‘আশা করি তোমার অন্যান্য বন্ধুরা তোমার দিকে অস্ত্র তোলে না।’

‘তুললে ক্ষতিটা কি? উত্তাপ, উত্তেজনা, আগুন, ঝুঁকি, বিপদ আর ভালবাসা ছাড়া জীবনের কোন অর্থ আছে?’

‘গলা নামাও,’ বলল রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মিলির দিকে। অন্ধকারেও তার মুখটা নিখুঁত পুতুলের মত সুন্দর। লোভ হলো ওর, সাথে সাথে ইচ্ছাটা ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। ‘চলো, কেটে পড়ি,’ বলল ও।

‘কিন্তু পুলিস…?’

‘আরও নিরাপদ সময় পাব মনে করি না।’

রানার গলা ধরে ঝুলে পড়ল মিলি। ‘আমি নিরাপত্তা চাই না।’ মুখ তুলে রানার চোখে তাকাল সে। ‘নিরাপত্তা চাইলে কি তোমার সাথে প্লেনে থাকা সাজে আমার?’

‘নিরাপত্তা চাও না। তাহলে কি চাও?’

‘তুমি বোঝো না?’ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো মিলি, রানার মুখে গরম নিঃশ্বাস ফেলল। গলির আবছা আলোয় তার কালো চোখ দুটো এক জোড়া দামী পাথরের মত জ্বলতে দেখল রানা। নারীসুলভ একটা গন্ধ নেশা ধরিয়ে দিল ওর মনে। মিলির

ফ্যাকাসে লাল মুখের চুমো ভেজাভেজা আর উত্তপ্ত, ঠোঁট জোড়া ভয়ানক অধৈর্য, পাথুরে দেয়াল আর রানার মাঝখানে সরে গেল সে। তার আবেগের নির্ভেজালত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

নিজেকে দমন করল রানা, মিলির কানে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করল, 'ইটস ওনলি দা এক্সাইটমেন্ট অভ ডেঞ্জার। বিপদের সময় অনেকেরই এরকম প্রতিক্রিয়া হয়।'

'না-না!' ব্যাকুল কণ্ঠে বলল মিলি। 'আমেরিকানদের ভাষায় বলি, ইউ টার্ন মি অন। তোমাকে আমি ভাল করে চিনি না, কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটা পৌরুষ আমি লক্ষ করেছি, মেয়ে হয়ে ধরা না দিয়ে আমার কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু অ্যারোনাফিস?'

'সে শুধুই আমার বন্ধু ছিল, তার দ্বারা আমি কখনও উত্তেজিত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া, আমি বেঁচে আছি, সে মারা গেছে।'

'আর যদি বেঁচে থাকত?'

'কথা বোলো না।' রানার কালো চুলের ভেতর কিলবিল করতে করতে ঢুকে গেল মিলির আঙুলগুলো। পাতলা কাপড়ের ভেতর তার শরীরের কোমল উত্তাপ পাগল করে তুলল রানাকে।

দু'জোড়া ঠোঁট এক হতে যাচ্ছে, বিড়বিড় করে উঠল রানা, 'এখানে? গলির মাঝখানে একজোড়া বিড়ালের মত?'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই!' চুমো খাওয়ার সময় গোঙাল মিলি। 'প্লিজ!'

রানা জানে, এই বিলাসিতা ওকে মানায় না। নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করল ও, শরীরটা একটু একটু কাঁপছে।

'কি হলো?' অবাক হয়ে গেছে মিলি।

'কিছু না। চলো এয়ারপোর্টে যাই।'

'তুমি আমাকে পছন্দ করো না?'

'করি,' থমথমে সুরে বলল রানা। 'তবে আগে কাজ সারা দরকার, তারপর অন্য কিছু। চলো।'

'তুমি আমাকে আরও বেশি আকর্ষণ করছ,' অভিযোগের সুরে বলল মিলি। 'বাড়িয়ে তুলছ জেদ। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব,' শেষ কথাটা হুমকির সুরে বলল সে।

রানা কোন জবাব দিল না।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এল ওরা। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, আরও অনেক যুবক-যুবতীর মত। প্রধান সড়ক লোকে লোকারণ্য, ফুটপাতে আর দোকানগুলোয় পুরোদমে শুরু হয়েছে কেনা-বেচা। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস বাড়ল ওদের, আশপাশে কোথাও ইউনিফর্ম দেখা গেল না।

কিন্তু দুর্গ এলাকা ছেড়ে বেরুতে গিয়ে প্রতিবার বাধা পেল ওরা। প্রতিটি গেটে লোকজনকে থামিয়ে পরিচয়-পত্র পরীক্ষা করছে পুলিস। চুপিসারে সরে আসতে হলো ওদেরকে। রানা উপলব্ধি করল, গ্রেফতার এড়াবার চেষ্টা করায় পুলিস ধরে নিয়েছে অ্যারোনাফিসের হত্যাকাণ্ডের জন্যে ও-ই দায়ী।

তবে ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে।

কর্তৃপক্ষ এখনও রানার সাথে চন্দন সরকারকে জড়াতে পারেনি। তুর্কী পাড়ার দক্ষিণ গেটে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। 'আমি জানতাম, মাসুদ ভাই, শেষ পর্যন্ত এদিকে আপনাকে আসতে হবে একবার,' হাসিমুখে বলল সে। 'সব গেটেই আছে ওরা, এটাতেও।' পিছন দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল সে।

ভাড়া করা একটা ফোর্ড সরু এক নির্জন গলির ভেতর আগেই

দাঁড় করিয়ে রেখেছে চন্দন। পিছনের বনেট তুলে ভেতরে মিলিকে তুলল, তাকে গেটের বাইরে রেখে ফিরে এল চন্দন। একইভাবে রানাকেও পার করে আনল সে। দু'জন মাত্র পুলিস ডিউটি দিচ্ছে, পথচারীদের ওপরই তাদের বিশেষ সন্দেহ। গাড়িগুলোও চেক করল, তবে পিছনের বনেট খুলল না। দ্বিতীয়বার গেট পেরুবার সময় ফোর্ডটাকে তারা থামালই না।

সরাসরি ওদেরকে মানড্রাকি হারবারে নিয়ে এল চন্দন, নামিয়ে দিল শহরের প্রধান ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সামনে। মিলিকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল রানা। খোলা জানালার দিকে ঝুঁকে চন্দন বলল, 'ভালই হলো আপনারা চলে যাচ্ছেন...'

'প্ল্যানটা বদলাতে হয়নি, সেজন্যে আমি খুশি,' বলল রানা।

'ভাল বলছি এই জন্যে যে গ্রীক ইন্টেলিজেন্স কেসটা নিয়ে কাজ করার সময় পাবে,' বলল চন্দন। 'আমরা যে অ্যারোনাফিস হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নই, এটা ওদেরকে বোঝাতে পেরেছি। পুলিশকে বোঝাবার জন্যে ওরা এখন তদন্ত শুরু করবে। আপনি ফিরে আসার আগেই সম্ভবত আসল রহস্য বের করে ফেলবে ওরা।'

'ওরা ব্যর্থ হলেও ফিরতে হবে আমাকে,' বলল রানা।

'জানি। ভাল কথা, মাসুদ ভাই...,' পকেট থেকে একটা চাবি বের করে রানার হাতে গুঁজে দিল চন্দন। 'এয়ারপোর্ট লকারের চাবি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, নেমিসিস কোথায় আছে জানার পর আপনি জাহাজটায় উঠতে চাইবেন।'

'কি আছে লকারে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল চন্দন। 'ধরে নিন, বি.সি.আই-এর তরফ থেকে ছোট্ট উপহার।' মিলির দিকে তাকাল সে। 'মিস পুলটিস?'

‘ইয়েস?’

‘রঁদেভো ক্লাবে তোমার অনুপস্থিতি কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? তুমি না গেলে কেউ যদি খোঁজ করে, যদি পুলিসে খবর দেয়?’

‘আরে, তাই তো!’

‘একটা মেসেজ পাঠিয়ে যদি বলা হয়, তুমি অসুস্থ, চলবে?’

‘প্লীজ, খুব ভাল হয়!’

‘ঠিক আছে, ওদিকটা দেখব আমি। গুড ফ্লাইং।’ রানার দিকে ফিরল চন্দন। ‘গুডলাক, মাসুদ ভাই।’

কোন ঘটনা ছাড়াই পশ্চিম উপকূল ধরে পনেরো কিলোমিটার পেরিয়ে এল ট্যাক্সি। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের সামনে নামল ওরা। সন্দেহ নেই, পুরানো শহরের বাইরেও রানা আর মিলি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে পুলিসকে, তবে পুলিস সম্ভবত আশা করছে না প্রাইভেট কোন প্লেন নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে ওরা।

ড্রাইভারের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে টার্মিনাল ভবনে ঢুকল ওরা, পুলিস থাকলেও ওদেরকে থামাল না। মেইন লবির দিকে না গিয়ে হাত ধরাধরি করে প্রাইভেট অ্যাভিয়েশন লাউঞ্জে ঢুকল দু’জন, বেরিয়ে এল টারমাকে। দিনের এই সময়টায় ব্যস্ততা কম, যদিও লন্ডন আর এথেন্স থেকে দৈনন্দিন ফ্লাইট আছে, আছে প্রায় বারোটা দেশ থেকে অসংখ্য ডিরেক্ট চার্টার ফ্লাইট। হকার ট্রাইডেন্ট, ৭২০ ও ৭২৭ বোয়িং পার্কিং অ্যাপ্রনে ঝলমল করছে। একটা হ্যাঙ্গার ঘুরে অ্যারোনাফিসের সাদা আর নীল লিয়ার জেটের দিকে এগোল ওরা।

‘সম্ভবত প্লেনে বসে আছে জর্জ,’ বলল রানা।

‘হ্যাঁ, সে-ও তো যাচ্ছে আমাদের সাথে, তাই না?’

‘লাউঞ্জে তাকে দেখলাম না। সাথে করে একটা জিনিস আনার কথা তার।’

‘প্লেনে থাকবে কিভাবে? ওটায় তো তালা দেয়া।’

‘তাহলে আলো জ্বলছে কেন?’

দাঁড়িয়ে পড়ল মিলি, মুখ তুলে প্লেনটার দিকে তাকাল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে ফিরল সে।

‘এসো, দেখা যাক,’ বলল রানা।

প্লেনের ভেতর প্রথম রানাই ঢুকল, ঢুকেই দেখতে পেল ডাচ জর্জকে। কেবিনের পিছন দিকে একটা কাউচে বসে আছে সে, মুখটা আরও যেন সরু হয়ে গেছে। স্বচ্ছ পানীয় ভরা একটা গ্লাস রয়েছে তার সরু গোঁফের ঠিক নিচে। পায়ে ডেক শূ, গায়ে লাইটওয়েট জাম্পসুট, ব্রেস্টপকেটের ওপর লিনেন দিয়ে তৈরি বহুরঙা নকশা। রানাকে দেখেই একটা ভুরু কপালে তুলল সে, ঈগলসুলভ চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ‘রানা,’ বলল সে, ‘এসো, তোমার সাথে মি. কোস্টাস অ্যারোনাফিসের পরিচয় করিয়ে দিই। মি. কোস্টাস অ্যারোনাফিস, মি. মাসুদ রানার সাথে পরিচিত হোন।’

ছয়

‘কোস্টাস!’ রানার পিছন থেকে চিৎকার করল মিলি, উল্লাসে অধীর কণ্ঠস্বর।

‘আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার! আমি মারা গেছি ধরে নিয়ে এই লোকের সাথে পালিয়েছিলে তুমি!’

বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত গ্রীকদের মধ্যে প্রচলিত কঠিন ভাষায় কথা বলল অ্যারোনাফিস, তবে তার উচ্চারণ বিশুদ্ধ নয়।

একই ভাষায় পাল্টা জবাব দিল মিলি, শুদ্ধ উচ্চারণে, ‘তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছ! আমি কি তোমাকে ইয়ট চাপা দিয়ে মারতে চেয়েছি?’

‘তুমি বলেছিলে, আমার নাকি ঈর্ষাবোধ করার কোন কারণ নেই–কিন্তু এখন কি দেখছি?’

‘কথাটা বলেছিলাম সকালে।’ সুগঠিত নিতম্বে হাত রাখল মিলি। ‘তোমার মনে নোংরা সন্দেহ ছিল, কাজেই যা প্রাপ্য তাই তোমার কপালে জুটেছে। যার যেমন চাহিদা তার তেমন প্রাপ্তি…’

‘তারমানে আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়!’ হাত দুটো মুঠো পাকাল অ্যারোনাফিস। ‘তুমি আসলে একটা নষ্টা! ধরা দেয়ার ভান করে পুরুষদের কাছ থেকে সুবিধে আদায় করো! তোমার নতুন শিকার

কি তা জানে?' দু'চোখ থেকে আগুন ঝরছে তার।

'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই!' সরে এসে রানার পাশে দাঁড়াল মিলি, এক হাত দিয়ে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'তোমাকে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দিয়ে আমি মারাত্মক ভুল করেছিলাম।'

'দাঁড়াও, সম্পর্ক নষ্ট করার আগে তোমার সাথে আমার বোঝাপড়া আছে!' গর্জে উঠল অ্যারোনাফিস, মারমুখো হয়ে মিলির দিকে এগিয়ে এল।

ঝট্ করে একটা হাত তুলে তার বুকে ঠেকাল রানা। বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রীক কোটিপতি। রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে তাকাল।

তার আপাদমস্তক নিরীখ করল রানা। শক্ত-সমর্থ ছোটখাট কাঠামো, চৌকো কাঁধ, হালকা সবুজ ইটালির তৈরি সুট পরে আছে, সাদা শার্টটা মনোগ্রাম করা, গলায় বো টাই। রানা আন্দাজ করল, শার্টের নিচে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছে লোকটা। 'এক মিনিট,' বলল ও।

'সরে দাঁড়ান, মি. রানা,' কড়া সুরে হুমকি দিল অ্যারোনাফিস।

তার বুক থেকে হাতটা না সরিয়ে মিলির দিকে তাকাল রানা। 'যাও, ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করো,' বলল ও। 'অভ্যন্তরীণ কোন গন্তব্য হওয়া চাই, তা না হলে পাসপোর্ট চাইবে।'

'কিন্তু...'

'যা বলছি শোনো...'

রানার হাত ঠেলে সামনে এগোতে চাইল অ্যারোনাফিস। 'আমার প্লেনে চড়ে কোথাও যেতে পারবেন না আপনারা!'

'এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন?' মিলির দিকে তাকাল রানা। পিছু

হটে দরজার ভেতর ঢুকে পড়ল সে। অ্যারোনাফিসের বুক থেকে হাতটা নামিয়ে নিল রানা। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল সে, চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'জানতে পারি, এ-সবের মানে কি?'

অ্যারোনাফিসের দিকে তাকিয়ে থেকে চাবিটা ডাচ জর্জের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। 'লকারে কি আছে নিয়ে এসো।'

নিঃশব্দে, চেহারায় কৌতুক নিয়ে, ওদেরকে লক্ষ করছিল জর্জ, চাবিটা লুফে নিয়ে দাঁড়াল সে, বলল, 'রিয়েলি, ওল্ড বয়, শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখার জন্যে এখানে আমার থাকা দরকার ছিল।'

'বেরোও,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'নষ্ট করার মত সময় নেই।'

ওরা একা হতেই খেঁকিয়ে উঠল অ্যারোনাফিস, 'আপনাকে আমি জেলে ভরতে পারি, তা জানেন?'

'ইয়ট চাপা দিয়ে আপনি আমাদের মারার চেষ্টা করলেন কেন বলুন তো?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাজটা আপনারই, তাই না?'

'আপনার ব্যবসা কি, মি. রানা?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল অ্যারোনাফিস।

রানাও তাই করল, 'আপনার ভিলায় ওরা কারা মারা গেল, মি. অ্যারোনাফিস?'

'আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'

'ভেবেচিন্তে তৈরি করে রাখতে পারেন,' বলল রানা। 'কোন এক সময় উত্তর তো দিতেই হবে।'

'আপনার এত সাহস, আমাকে হুমকি দেন!' এক পা সামনে বাড়ল অ্যারোনাফিস, বিশাল সানগ্লাসের ভেতর চোখ দুটো

জ্বলছে।

'নেমিসিস কয়েকশো মাইল অফ-কোর্সে এল কেন?' জানতে চাইল রানা। 'কেন অদৃশ্য হলো, তারপর কেন আবার উদয় হলো পোর্ট সাঈদে?'

অ্যারোনাফিসের সবুজাভ চোয়ালে লালচে একটা ভাব ফুটল। কপাল থেকে কাঁচাপাকা চুল সরাল সে। দুই ভুরুর মাঝখানে চিন্তার রেখা। জানতে চাইল, 'এত সব আপনি জানলেন কিভাবে? আপনি নিশ্চয়ই কোন বিদেশী এজেন্ট। উচ্চারণ ভঙ্গি আমেরিকান হলেও, আপনি রাশিয়ানও হতে পারেন।'

'হঠাৎ রাশিয়ানদের টানছেন কেন? ভিলায় রাশিয়ানরাই আপনাকে তাড়া করেছিল, তাই না?'

এই প্রথম নার্ভাস দেখাল অ্যারোনাফিসকে। 'আ-আমি জানি না। ভ-ভ...আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই। কোন দিকে না তাকিয়ে জান নিয়ে পালাতে শুরু করি...'

'ইয়টে করে।'

'হ্যাঁ, ইয়টে করে। পানিতে কেউ আছে কিনা দেখতেই পাইনি আমি, যীশুর কিরে।'

কেন যেন, লোকটার বলার ভঙ্গিটাই অবিশ্বাস্য লাগল রানার। 'ওরা নিকোলাই প্যাসিমভকে ধরতে এসেছিল?'

'কাকে ধরতে এসেছিল জানি না...ওদের ভয়ে সাগরেই থেকে যাই আমি। রাত নামার পর এখানে চলে আসি, প্লেন নিয়ে এথেন্সে চলে যাব বলে।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অ্যারোনাফিস। 'যে-কোন মুহূর্তে আমার পাইলট চলে আসবে। আপনারা চলে গেলে আমি খুশি হই, মি. রানা। এখুনি, প্লীজ।'

'যাবই তো,' নির্লিপ্ত, আপোসহীন সুরে বলল রানা। 'আপনার

প্লেনে করে।'

রানা থামতেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ডাচ জর্জ আর মিলি, লিয়ারজেট দুলে উঠল সামান্য। ফুয়েলের গন্ধ ঢুকল রানার নাকে, সেই সাথে জেট টারবাইনের গুঞ্জন শুনতে পেল ও।

ঝট্ করে কোটের ভেতরে হাত ঢোকাল অ্যারোনাফিস, কিন্তু ক্ষিপ্রতায় রানার কাছে হেরে গেল সে। রানার হাতের .৩৮-এর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল গ্রীক কোটিপতি।

'হাতের অস্ত্রটা সাবধানে বের করে পাশের সীটে রাখুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'কোনরকম চালাকি করলে, অকালে মারা পড়বেন।'

নির্দেশ মত কাজ করল অ্যারোনাফিস। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। হিসহিস করে উঠল তার কণ্ঠস্বর, 'কর্তৃপক্ষকে সবই জানানো হবে!'

অস্ত্র নেড়ে দরজাটা দেখিয়ে দিল রানা, বলল, 'সত্যি? কিন্তু আপনার বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনাটা যে কর্তৃপক্ষকে জানাননি, তার কি হবে? ওখানে যে দু'জন লোক মারা গেছে, তার? আমার বরং বিশ্বাস, আপনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চান, আপাতত। আমার আরও বিশ্বাস, অত্যন্ত কৌশলে গোপন কিছুর সাথে নিজেকে আপনি জড়িয়ে ফেলেছেন, মি. অ্যারোনাফিস।'

'এর জন্যে আপনাকে মূল্য দিতে হবে, মি. রানা!' রাগে কাঁপছে অ্যারোনাফিস।

'আপাতত তেল খরচটা আপনি দিচ্ছেন,' বলল রানা। 'ভাগ্য ভাল হলে, কাল আপনার প্লেন ফেরত পাবেন।'

'গো টু হেল!'

‘নরকে যদি যাই, ওখানে গিয়ে দেখব আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আগেই পৌঁছে গেছেন আপনি।’

হ্যাচের সামান্য ভেতর থেকে রানার হাতের অস্ত্রটা টারমাক পর্যন্ত অনুসরণ করল অ্যারোনাফিসকে। ছোট্ট টেবিলে বসে ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেটটা খুলল ডাচ জর্জ। ইতিমধ্যে পাইলটের সীটে বসে পড়েছে মিলি।

‘বাহনটাকে আকাশে তোলো,’ বলল রানা।

অভ্যস্ত হাতে টেক-অফ করার প্রস্তুতি নিল মিলি। একটা জানালার সামনে বসে টার্মিনাল ভবনের বিশেষ একটা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, ওই পথেই অদৃশ্য হয়ে গেছে অ্যারোনাফিস।

মোড়ক খুলে বড়সড় একটা অলিম্পিক এয়ারওয়েজ ফ্লাইট ব্যাগ বের করল জর্জ, চেইন খুলে ভেতরটা দেখল, তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। ‘মাই গড! এ-সব জিনিস আপনি জোগাড় করলেন কিভাবে?’ বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল সে, দু’হাত দিয়ে ধরে ব্যাগ থেকে বের করে আনল ছোট আকারের একটা উজি সাবমেশিনগান।

রানা কোন জবাব দিল না। ব্যাগের ভেতর থেকে আরেকটা উজি বের করল, সাথে ছ’টা ম্যাগাজিন। মনে মনে চন্দনের প্রশংসা করল ও।

চিৎকার করে সীটবেল্ট বাঁধতে বলল মিলি, স্টার্ট দিল টারবোজেটে। রানওয়ে ধরে এগোল জেট, টেক-অফ করার ক্লিয়ার‍্যান্স রিসিভ করল ওরা। রাতের আকাশে উঠে পড়ল প্লেন।

ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল রোডস-এর আলো, চল্লিশ হাজার ফুট ওপরে উঠে এল ওরা, ছুটছে দক্ষিণ-পুব দিকে।

হাতের গ্লাসটা আরেকবার ভরে নিয়ে রানার দিকে তাকাল জর্জ, লম্বা হাতটা বাড়িয়ে ইঙ্গিতে সাবমেশিনগানগুলো দেখাল। 'আমার ধারণা, অভিযানে স্রেফ নাটকীয় ভাব আনার জন্যে এগুলো আমদানী করা হয়েছে, ঠিক কিনা?' জানতে চাইল সে।

'খুব সম্ভব ব্যবহার করার দরকার হবে না,' বলল রানা।

'প্রায় অপরাধের সমতুল্য বলতে হয়, ব্যবহার করা না হলে,' বিদ্রূপের সুরে বলল জর্জ। 'নিখুঁত, চকচকে, তৈরিও করা হয়েছে মানুষকে সাবাড় করার জন্যে, তাই না? ব্যবহারই যদি না করা হবে, এগুলো সাথে নেয়ার কি দরকার ছিল?'

'ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না, তা আমি বলিনি। তোমার কি মনে হয়, জাহাজে ওরা আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে? নেমিসিসে নিশ্চয়ই পঁচিশ-তিরিশজন লোক আছে...'

'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, গুরু। আমরা ন্যায়ের পথে আছি, মনের জোরই সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। দরকার হলে, ওগুলোর সাহায্যও নেব, কি বলো?'

লোকটা এরই মধ্যে মাতাল হয়ে গেছে কিনা ভাবল রানা। 'তুমি কি সিদ্ধান্ত পাল্টাবার কথা ভাবছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কি! কেন? হঠাৎ এ-প্রশ্ন?'

'না, উজি সম্পর্কে বেশি বেশি কথা বলছ দেখে মনে হলো, ভয়-টয় পেলে নাকি!'

'দূর, কি ভাবো আমাকে তুমি? ভয় পাব কেন!'

ডাচ জর্জের মুখে কি যেন খুঁজল রানা। 'ভাল। এখন আর ফিরে যাবার কোন উপায় নেই।'

'আবহাওয়া একটা সমস্যা হতে পারে,' কো-পাইলটের সীটে রানা

বসার পর বলল মিলি।

‘দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে।’ তারাগুলোর দিকে তাকাল রানা, এত কাছে আর স্পষ্ট, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

‘ওয়েদার ম্যাপ বলছে, উত্তর আফ্রিকা থেকে একটা নিম্নচাপ পুব দিকে এগোচ্ছে। খামসিনকে ডেকে আনতে পারে ওটা।’

রানা জানে, খামসিন বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। দক্ষিণ মরুভূমি থেকে উত্তপ্ত বাতাস গিলে মিশরের ওপর নিঃশ্বাস ছাড়ে ওটা, সগর্জনে বেরিয়ে আসে বালির মেঘ। খামসিন নামের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়টা দু'ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রীতে তুলে দিতে পারে, হারিকেনে রূপান্তরিত হয়ে গতি লাভ করতে পারে ঘণ্টায় নব্বুই মাইল। কতদিন স্থায়ী হবে তা-ও বলার উপায় নেই, একদিনও হতে পারে, আবার এক হপ্তাও হতে পারে। ‘টার্গেট এরিয়ায় কখন পৌঁছুবে ওটা?’ জানতে চাইল ও।

গাঢ়, পটলচেরা মিলির চোখ ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে ক্রোনোমিটারে সরে গেল। ‘প্রায় আমরা যখন পৌঁছুব। ভাগ্য ভাল হলে, হাতে ঘণ্টাখানেক সময় পাব।’

‘আর যদি আমাদের সাথেই বা আগে পৌঁছায়?’

‘ল্যান্ড করা কঠিন হবে। অসম্ভবও হতে পারে। তবে আগে পৌঁছুবে বলে মনে হয় না।’

‘কিন্তু আমাদের তো আবার টেক-অফ করতে হবে।’

‘তা বোধহয় আমি ম্যানেজ করতে পারব,’ আশ্বাস দিল মিলি।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটল। প্লেন দ্রুতগতিতে উড়ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে আকাশে স্থির হয়ে আছে ওরা। ‘কোথায় উড়তে শিখলে তুমি?’ এক সময় জিজ্ঞেস করল রানা।

‘গ্রীক এয়ারফোর্সে বাবা ছিল পাইলট, একটা স্কোয়াড্রনের

কমান্ডার,' ম্লান মুখে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলল মিলি। 'চুয়াত্তর সালে একটা সামরিক অভ্যুত্থান হলো, গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করল যারা তাদের মধ্যে বাবাও ছিল। গ্রেফতার করার পর জেলখানায় খুন করা হলো তাকে। একজন সামরিক অফিসার হয়ে গণতন্ত্রের জন্যে প্রাণ হারাল আমার বাবা, কিন্তু রাজনীতিকরা কি করল, জানো? অভ্যুত্থানের নেতাদের সাথে এক টেবিলে বসে আপোস করে ফেলল, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল ক্ষমতা।' নাক বরাবর অন্ধকার আকাশে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'জানো, অভ্যুত্থানের খবরটা পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি।'

'তুমি তাহলে বাপের কাছে শিখেছ।'

'বাবার ইচ্ছে ছিল, অবসর নেয়ার পর বাপ-বেটিতে একটা চার্টার কোম্পানী খুলব। সমস্ত প্ল্যান ফাইন্যাল হয়ে গিয়েছিল। আর এক বছর পর অবসর নিত বাবা। জেলখানা থেকে খবর এল, একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ডিটেনশনে ছিল, সত্যি-মিথ্যে প্রমাণ করা যায়নি।'

'তৃতীয় বিশ্বের সবখানে এ-ধরনের ঘটনা ঘটছে,' ম্লানসুরে বলল রানা। 'সত্যি আমি দুঃখিত।'

'ওরা আমাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করল,' বলে চলেছে মিলি। 'আমেরিকায় চলে গেলাম আমরা। ভাল গাইতে পারত মা, চাকরি আর বিয়ে দুটোই জুটে গেল তার। গাইতে আমিও পারতাম, কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারলাম না, কারণ আমেরিকানরা যতটা না আমার গান শুনতে ভিড় জমাত, তারচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখাত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার লোভে। ওরা এত বেশি রোমান্টিক যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমি।'

‘সেজন্যেই কি আবার গ্রীসে ফিরে এলে তুমি, ওদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে?’

হেসে উঠল মিলি। ‘না, তা নয়। ইতিমধ্যে মেয়ে-ঘেঁষা আমেরিকানদের কিভাবে সামলাতে হয় তা আমি শিখে ফেলেছিলাম। ফিরে এলাম দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হতে যাচ্ছে দেখে। দেশে ফেরার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলো। ফিরে এসে ক্যাবারেতে নাম লেখালাম। এখনও গাইছি।’

‘তুমি সত্যি খুব সাহসী মেয়ে,’ বলল রানা। ‘সংগ্রাম করতে জানো।’

‘তবে নিকোলাই প্যাসিমভের মত মানুষদের সাথে আমার কোন তুলনা চলে না,’ জবাব দিল মিলি।

‘তুমি তাঁর নাম জানলে কিভাবে?’ প্রশ্ন করল রানা।

‘আজ সকালে জর্জকে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে শুনেছি আমি। আমরা কি তাঁকে ফিরিয়ে আনব, রানা?’

ব্যাপারটা অস্বীকার করার আর কোন মানে হয় না, ভাবল রানা। ‘তার সম্পর্কে কি জানো তুমি?’

‘সবাই যতটুকু জানে। তিনিও একজন সংগ্রামী মানুষ, যদিও সশস্ত্র নন। অনেক সংকট আর ভরাডুবি থেকে উদ্ধার পেয়েছেন ভদ্রলোক।’

‘তা ঠিক। পারমাণবিক শক্তিকে শুধু শান্তির কাজে ব্যবহার করা যাবে, এই নীতি সবাই যাতে মেনে চলে তার জন্যে আন্দোলন করছেন ভদ্রলোক। আমি যতটুকু জানি, সোভিয়েত সরকারের সাথে তাঁর কোন বিরোধ নেই। তিনি শুধু নিশ্চয়তা চান, সরকার যেন সোভিয়েত শাসনতন্ত্র আর আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়।’

‘অথচ খবরের কাগজে পড়েছি, তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। কে.জি.বি. এজেন্টরা এমনকি মারধরও করেছে তাঁকে। গুজব রটেছে, তাঁকে নাকি পাগলাগারদেও পাঠানো হয়। তবে, সাহস হারাননি ভদ্রলোক। বোধহয় সেজন্যেই বেঁচে আছেন আজও।’

‘জোর করে বলা যায় না। তবে শিগ্‌গিরই জানতে পারব।’ সীটে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। নিঃসীম আকাশে কিছুই দেখার নেই, শুধু চাঁদের আলোয় প্লেনের ডানা আলোকিত হয়ে রয়েছে।

এ-পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই সব কিছু ঘটেছে, ভাবল রানা। রোডস টাউনে পুলিস আর এয়ারপোর্টে অ্যারোনাফিস গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করলেও, নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র কয়েক মিনিট পরে গন্তব্যে পৌঁছুবে ওরা।

খাল পেরুতে একটা কনভয় সময় নেয় পনেরো ঘণ্টা। সাধারণত একটা জাহাজকে তিন জায়গায় পুরোপুরি স্থিরভাবে পাওয়া যেতে পারে। সেগুলোর মধ্যে দুটো জায়গা হলো আল-বালাহ ও কিবরিট বাইপাস, দক্ষিণের গ্রেট আর লিটল বিটার লেক-এর মাঝখানে। তৃতীয় জায়গাটা হলো ইসমাইলিয়া, খালের মাঝখানে, ওখানে পাইলটরা সীট বদল করে।

এলাকার বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনার মধ্যে রাখলে, আল-বালাহ সবচেয়ে আদর্শ বাইপাস। পোর্ট সাঈদ আর বাংলাদেশ দূতাবাস, দুটোই কাছাকাছি। বিপদে পড়লে সাহায্য পাওয়া যাবে।

প্রেশার সামান্য বাড়তে মনটা ককপিটে ফিরে এল রানার।

‘নামার সময় হয়েছে,’ বলল মিলি।

‘যতটা সম্ভব নিচ দিয়ে যাব আমরা,’ বলল রানা। ‘তীর থেকে

যথেষ্ট দূরে থাকো। আমি চাই একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে যেন মিশরীয় রাডারে ধরা না পড়ি।'

'ঠিক আছে।' চার্টের দিকে তাকাল মিলি। 'আমাদের বর্তমান কোর্সে, দামিয়েত্তার কাছে নাইল ডেলটায় পৌঁছুব আমরা, তিরিশ মাইল চওড়া এল মানজালা লেগুন পেরুব, খালে পৌঁছুব পোর্ট সাঈদকে যথেষ্ট দক্ষিণে রেখে, আল-বালাহর কাছাকাছি।'

রানা বলল, 'আমরা তীরের ওপর পৌঁছুনোর আগে পর্যন্ত যদি রাডারকে ফাঁকি দিতে পারি, মিশরীয়রা ভাববে প্লেনটা দেশের ভেতর কোথাও থেকে আকাশে উঠেছে। বাধা দেয়ার জন্যে ইন্টারসেপ্টর পাঠাতে মিনিট কয়েক দেরি করলেই হয়, নিরাপদে নেমে পড়ব আমরা।'

তবে এখনও মাটি বা জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, দিগন্তরেখার কাছে সেই একই দৃশ্য—কালো আকাশে মিটমিট করছে কিছু তারা, আকাশটা নেমে গেছে সাগরের শেষ প্রান্তে। জোড়া জিই টারবোজেট মৃদু গুঞ্জন করছে। শান্ত ভাব নিয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে মিলির চোখ দুটো। নিজে প্লেন চালাতে জানে বলেই বুঝতে পারছে রানা, দক্ষ লোকের কাছে ট্রেনিং পেয়েছে মেয়েটা।

খানিক পর কন্ট্রোল কলাম ধরে টানল মিলি। সরল একটা পথ ধরে ছুটছে প্লেন। 'ফিফটি ফুট অলটিচ্যুড,' বলল সে। কথার সুরে খানিকটা উত্তেজনা।

'আর খানিকটা নিচে নামতে পারো না?'

'পাগল হয়েছ!' মিলির চোখ উইন্ডশীল্ডের দিকে।

'ঠিক আছে,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল রানা। 'নেভিগেশন লাইট নেভাও এবার।'

হাত বাড়িয়ে কন্ট্রোল কনসোল ছুঁলো মিলি।

‘অ্যান্টি-কলিশন বীকন আর রাডারও অফ করো,’ নির্দেশ দিল রানা।

‘রাডার? কি বলছ তুমি? ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল ছুটছি আমরা, মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপর দিয়ে! রানা, নিচে পাওয়ার ট্র্যান্সমিশন টাওয়ার আছে, রেডিও ট্র্যান্সমিশন টাওয়ার আছে, এমনকি ওয়াটার টাওয়ার...’

‘আছে, খুব বেশি নয়,’ বলল রানা। ‘এলাকাটা সমতল, তোমার চিরকুমারী আন্টির বুকের মত।’

‘আমার কোন চিরকুমারী আন্টি নেই।’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইকুইপমেন্টগুলো অফ করল মিলি।

‘স্রেফ কথার কথা,’ বলল রানা।

‘তেমন যদি কেউ থাকতও, তার বুক অবশ্যই সমতল হত না।’

‘বিশ্বাস করলাম,’ বলল রানা। ‘ফুয়েলের কি অবস্থা?’

‘এরকম অলটিচ্যুডে খরচ তো বেশি হবেই, তবে প্রচুর আছে। আমাদের রেঞ্জ চার হাজার কিলোমিটার, তারপরও পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রিজার্ভ আছে। কোস্টাস সব সময় ট্যাংক ভরে রাখে।’ মাথায় একটা ইয়ার-ফোন তুলল মিলি। ‘আমরা এখন পোর্ট সাঈদ রেডিও বীকন ভেদ করে যাচ্ছি।’

ডান দিকে নীল নদের মুখে দামিয়েত্তার আলো ঠিক যেন লাফ দিয়ে দিগন্তে উঁকি দিল। মাছ ধরার বোটগুলোর আলোগুলোকে সবেগে পিছিয়ে যেতে দেখল ওরা। এরপর দেখা গেল কালো কালো ছোপ, ব্যারিয়ার আইল্যান্ড। এল মানজালা লেগুনের ওপর উঠে এল প্লেন, খুব নিচ দিয়ে উড়ছে।

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের ঘড়িটার ওপর চোখ তুলল রানা। খুশি হলো মনে মনে। যে-টুকু সময় নষ্ট হয়েছিল, পুষিয়ে নিয়েছে মিলি।

কয়েক মুহূর্ত পর, রুট সেভেন-এর দীর্ঘ কজওয়েয়ের ওপর চলে এল জেট, এল মাতারিয়া আর পোর্ট সাঈদের মাঝখানে।

হঠাৎ উত্তেজিত গলায় মিলি বলল, 'পোর্ট সাঈদ টাওয়ার সাড়া দিতে বলছে। কি বলব ওদের?'

'কিছুই না।' আকাশে তল্লাশী চালাল রানা, চোয়াল শক্ত করে বলল, 'আর পাঁচ মিনিট দরকার আমাদের।'

'ওরা পরিচয় জানাবার নির্দেশ দিচ্ছে।'

মাথা নাড়ল রানা, ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরল।

চোখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে আছে মিলি, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে নিচের ঠোঁট। হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল সে। 'মাই গড!' পরমুহূর্তে কন্ট্রোল কলাম হ্যাঁচকা টান দিয়ে কাছে টানল।

পলকের জন্যে সাদা আলোর আভা দেখতে পেল রানা, একটা জাহাজের মাস্তুলের মাথায় নেভিগেশন লাইট বলে চিনতে পারল। এত কাছে, আভাটুকু বিদ্যুৎচমকের মত দেখার পর কিছুক্ষণ লেগে থাকল চোখে।

নাক উঁচু করে প্লেনটা ওপরে উঠতে শুরু করেছে, একশো ফুট ওপর থেকে খালটাকে ফিতের মত লাগল দেখতে। উদ্বেগের সাথে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান আর গ্রাউন্ড-টু-এয়ার মিসাইলের কথা মনে পড়ে গেল রানার, সিনাই-এ বসানো আছে সব, মাত্র কয়েক মাইল দূরে। 'ঘুরিয়ে নাও, প্লেন ঘুরিয়ে নাও! স্যাম ক্ষেপণাস্ত্রের কথা মনে নেই?'

'আমার হিসেবে খালটা এখানে থাকার কথা নয়,' বলল মিলি।

বৃত্ত রচনা করছে সে।

‘বাইপাস যতক্ষণ দেখতে না পাও, দক্ষিণ দিকে এগোও,’ বলল রানা। ওদের দিকে এগিয়ে আসছে এক ঝাঁক সাদা-কালো-সাদা নেভিগেশন লাইট। নির্ঘাত নেমিসিস কনভয় হবে, ভাবল রানা।

‘মিশরীয়রা আমাদের খুঁজছে,’ বলল মিলি। ‘পাগলামি শুরু করেছে রেডিও।’

‘এত কম উঁচুতে আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না, আর জাহাজগুলো রাডারের ছবি ঝাপসা করে দেবে।’

বাইপাসের ওপর দিয়ে ছুটল প্লেন। রুট ফোর-এর পাশে খাল ঘিরে থাকা চকচকে রেইল চিনতে পারল রানা, পানিপথের সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে ওটা। কালো আকাশের গায়ে আবার চোখ তুলল ও, মিশরীয় ফাইটারের খোঁজে। দক্ষিণে জ্বলজ্বল করছে ইসমাইলিয়ার আলোকমালা। আর কিছু না হোক, ওরা অন্তত খামসিন বাতাসের আগে পৌঁচেছে।

এই সময় হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল শহর। ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে বলে মনে হলো। তারমানে পাওয়ার লাইনে আঘাত হেনেছে খামসিন।

রানা উপলব্ধি করল, ভয়াবহ মরু ঝড় কাছে চলে এসেছে। ‘ল্যান্ড করো,’ মিলিকে নির্দেশ দিল ও।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল মিলি, বৃত্ত রচনা করে নামিয়ে আনল প্লেন। হাইড্রলিক পাম্পের গুঞ্জন শোনা গেল, বিস্তৃত হলো ফ্ল্যাপস, নিচে ঝুলে পড়ল ল্যান্ডিং গিয়ার।

ওদের নিচে আলোকিত জাহাজের মিছিল, একের পর এক উত্তর দিকে ছুটছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে শক্তিশালী ল্যান্ডিং লাইট জ্বালল মিলি, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল একজোড়া আলো বিস্ফোরিত হলো সরু একটা হাইওয়ের ওপর, বালির মাঝখানে কালো আর চকচকে। রাস্তাটা ওদের দিকে উঠে এল ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে।

প্লেনটা হাইওয়ে বরাবর তাক করল মিলি, রানার তলপেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল।

ঝাঁকি খেলো ওরা, নিরাপদে হাইওয়ের ওপর নামল লিয়ার জেট।

সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল মিলি। চোয়ালটা হাত দিয়ে ডলছে রানা, এত শক্ত হয়ে ছিল ওটা যে এখনও ব্যথা করছে।

কমপার্টমেন্টের দরজায় ডাচ জর্জের মুখ দেখা গেল, চোখে ব্যঙ্গ মেশানো কৌতুক। 'বেঁচে আছি কিনা, কেউ আমাকে বলে দেবে?'

'নিজেকে চিমটি কাটো, দেখো রক্ত বেরোয় কিনা।' চরম উত্তেজনার মধ্যে মুহূর্তের বিরতি ঘটায় স্বস্তিবোধ করল রানা।

'জায়গাটা যদি মিশর হয়, একমাত্র বেলি ড্যান্সাররা আমাকে পুনর্জীবন দান করতে পারে।'

'তার আগে তোমাকে না আবার স্নেক ড্যান্সারদের খপ্পরে পড়তে হয়। নামো, তাড়াতাড়ি নামো,' তাগাদা দিল রানা।

প্লেনের পিছন দিকে চলে এল ওরা, প্যাক করা রাবার বোটটা লাথি মেরে হ্যাচ থেকে নিচে ফেলে দিল ডাচ জর্জ। উজিগুলো বহন করল রানা, ওর পিছু নিল মিলি, হাতে ক্লিপ।

নিস্তব্ধ, থমথমে রাত। নিঃসঙ্গ একটা ঝিঁঝি পোকা অনবরত ডাকছে। স্থির হয়ে আছে বাতাস।

'জাহাজগুলো বাইপাসে ঢুকছে,' ঘোষণা করল ডাচ জর্জ।

‘ভেলায় বাতাস ভরো।’

একটা কর্ড ধরে টান দিল ডাচ জর্জ। হিসহিস শব্দ তুলে ফুলে উঠল ভেলাটা।

‘অবলা নারী সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে?’ জানতে চাইল জর্জ।

‘অ্যাই, খবরদার।’ প্রতিবাদ জানাল মিলি। ‘মুখ সামলে কথা বলো!’

রানা বলল, ‘এখানেই থাকবে ও, প্লেনের সাথে।’

হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে টান টান হলো মিলি। এখনও হালকা স্ল্যাকস আর খাটো ব্লাউজ পরে আছে সে। স্থির হলেও, বাতাসে ঠাণ্ডা একটা ভাব রয়েছে। ‘কিন্তু, যদি কোন গাড়ি আসে?’ জানতে চাইল সে।

‘আসবে বলে মনে হয় না,’ বলল রানা, একটা উজি কাঁধে ঝোলাল। ‘আজকাল ইন্টারন্যাশনাল রুট চুয়াল্লিশ ধরেই প্রায় সব গাড়ি আসা-যাওয়া করে। সেটা এখান থেকে মাইল দুয়েক পশ্চিমে। তাছাড়া, খামসিনের ভয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় কোন গাড়ি থাকবে না।’

‘কিন্তু যদি…,’ শুরু করল মিলি।

‘টর্চ জ্বেলে প্লেনটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার ইঙ্গিত দেবে ড্রাইভারকে,’ পরামর্শ দিল রানা। ‘কেউ প্রশ্ন করলে বলবে, মেকানিক্যাল সমস্যা দেখা দেয়ায় বাধ্য হয়ে হাইওয়ের ওপর ল্যান্ড করতে হয়েছে তোমাকে, সাহায্যের জন্যে লোক পাঠিয়েছ। ঠিক আছে?’

রাস্তার দু’দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাল মিলি, কথা বলল না।

হাড়-কাঁপানো বিস্ফোরণের শব্দ হলো, মুখ তুলে বিপজ্জনক আকাশের দিকে তাকাল ওরা।

'মিগ,' বলল রানা, বেসুরো গলায়।

'আমাদেরকে খুঁজছে?' জর্জ হতভম্ব।

'কি মনে হয় তোমার?' রাবারের ভেলাটা খপ্ করে ধরল রানা। 'এসো, পানিতে নামাই এটাকে।'

বালির ঢাল থেকে পিছলে, হড়কে পানির কিনারায় নেমে এল ওরা। প্রথম জাহাজটাকে প্রকাণ্ড আকার নিয়ে ঝুলে থাকতে দেখল ওরা আকাশের গায়ে। কনভয় আসছে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল জাহাজটা। পিছু পিছু আরেকটা এল। এভাবে একের পর এক। ছোট ঢেউগুলো ছুটে এসে গিলে ফেলছে বালিময় তীর। এঞ্জিন, পাম্প আর নানারকম যান্ত্রিক শব্দে কান পাতা দায় হয়ে উঠল। ট্যাংকার, ট্রাম্প ফ্রেইটর, ক্রুজ শিপ, ইয়ট—সব রকম জাহাজই দেখা গেল।

রানা দেখে নিয়েছে, লাইনের তিন নম্বর জাহাজটা নেমিসিস। আগেই ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে সেটা, তবে জ্যোৎস্না ভরা আকাশের গায়ে জাহাজটার কাঠামো দেখা যাচ্ছে এখনও।

কনভয়ের প্রতিটি অংশ থেকে চেইন নাড়াচাড়ার শব্দের সাথে ভেসে এল পানিতে ঝপাৎ করে নোঙর ফেলার আওয়াজ।

ডাচ জর্জের দিকে ফিরল রানা, 'অ্যাংকর চেইন ধরে উঠতে পারবে?'

কাঁধে উজি ঝোলাল জর্জ। 'আমার ওপর ভরসা রাখো, ব্রাদার। কারও বাড়া ভাতে ছাই দেয়ার জন্যে সব কিছু করতে পারি আমি।'

রানার বাহু স্পর্শ করল মিলি। 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

‘আধ ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট।’ শ্বাস টানল রানা। ‘কনভয় চলে যাবার পরও যদি আমরা না ফিরি, একা কেটে পড়বে তুমি। পরে যদি কেউ তোমাকে জেরা করে, বলবে আমি তোমাকে জোর করে পুলিসের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, সুযোগ পেয়ে আমার কাছ থেকে পালিয়েছ তুমি। পরে আমার সম্পর্কে কিছুই তুমি শোনোনি।’

‘এরকম ভান করা কঠিন হবে,’ ম্লান সুরে বলল মিলি। ‘তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, প্লিজ, রানা।’

রাবারের ভেলাটা পানিতে ভাসিয়েছে ওরা, এই সময় আঘাত হানল খামসিন।

সাত

‘আমরা শুধু প্যাসিমভ ভদ্রলোককে নিয়ে কেটে পড়ব,’ বাতাস গর্জন করছে, চিৎকার করতে হলো রানাকে। হাত আর মুখ ঢাকা পড়ে গেছে বালিতে, কিচকিচ করছে মুখের ভেতরটা।

পাল্টা চিৎকার করল ডাচ জর্জ, ‘এডওয়ার্ড গ্রীনকেও খুঁজে বের করতে হবে।’

‘সে-ই কি প্যাসিমভকে জাহাজে তুলেছে?’

জর্জের জবাব শুনে মনে হলো রানার কথা শুনতে পায়নি সে,

বা শুনতে না পাবার ভান করছে, 'যে-কোন ক্রু তার কাছে নিয়ে যাবে আমাদের।'

নেমিসিসের বিরাট কাঠামো আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। পিছনে উঁচু বালির বাঁধ, জাহাজটাকে বিশাল একটা ইস্পাতের পর্দার মত লাগছে। নেমিসিসের কোল ছাড়িয়ে দূরে আর ওপরে চলে গেল রানার দৃষ্টি, ধুলোর ভেতর অস্পষ্ট এক ঝাঁক তারা ছাড়া কিছু দেখতে পেল না।

ফোক্যাসল থেকে পানি পর্যন্ত অ্যাংকর চেইনটা টান টান হয়ে রয়েছে।

'গ্রীন জাহাজে আছে কিনা কে জানে,' বলল রানা। 'থাকলে সম্ভবত বন্দী করে রাখা হয়েছে, তা না হলে ধরে নিতে হবে জাহাজটার অদৃশ্য হওয়ার সাথে তার সম্পর্ক ছিল।'

জর্জ কোন মন্তব্য করল না, এমনকি রানার দিকে তাকালও না সে।

অ্যাংকর চেইনের গায়ে ভেলা ভিড়াল রানা, চেইন ধরে উঠতে শুরু করল দ্রুত।

ভেলা থেকে চাপা কৌতুকের সাথে জর্জ বলল, 'আগে গেলে বাঘে খায়।'

ডেকটা প্রায় অন্ধকার। ব্রিজ আর চিমনি ধুলোর মেঘের ভেতর অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। যতদূর দেখতে পেল রানা, কেউ কোথাও নেই। বাতাসের গতি তীব্র হলেও, নেমিসিস মাটিতে পোঁতা রডের মত স্থির হয়ে রয়েছে। সাবধানের মার নেই, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল রানা। চারদিকে চোখ বোলাল।

রেইলিং টপকে ডেকে উঠে এল জর্জ, হামাগুড়ি দিয়ে রানার পাশে চলে এল। 'কি রকম বুঝছ?' ফিসফিস করে জানতে চাইল

সে।

চুপ থাকার ইঙ্গিত দিল রানা। রানার দেখাদেখি কাঁধ থেকে উজি নামাল জর্জ, ককিং লিভারে টান দিল, তারপর মাথা নিচু করে সতর্কতার সাথে ডেক ধরে রানার পিছু পিছু সামনে এগোল। এদিকটায় আলো এসেছে শুধু আপার ব্রিজের জানালা থেকে।

এগোবার সময় চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল রানা, ডেকের এখানে-সেখানে রঙ যেন বদলে গেছে। একটা হাত প্রসারিত করে জর্জকে থামাল ও, পিছিয়ে এল কয়েক পা, পকেট থেকে বের করে পেন্সিল টর্চটা জ্বালল।

সরু আলোর টানেলে চিকচিক করে উঠল বালি। ডেকের ওপর হলুদ দাগ দেখল রানা। মনে হলো, কাদা। তারপর মনে পড়ল রানার, রোডস-এর কাছাকাছি সাগরের তলায় ব্যারেলের ভেতরও এই জিনিস দেখেছে ও। কাকতালীয় ব্যাপার, একই জিনিস দু'জায়গায়? বিস্মিত হয়েছে রানা। উঁহুঁ, কাকতালীয় হতে পারে না।

'কি হলো, রানা?' চাপা গলায় পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল জর্জ, অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

নিশ্চয়ই নেমিসিসের ডেকে পড়ে গিয়েছিল ব্যারেলটা, ভেতরের পদার্থ খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে আসে, তারপর গড়াতে গড়াতে ডেক থেকে নেমে যায় সাগরে।

রানার পাশে চলে এল জর্জ। 'কি পেলে, সাত রাজার ধন?'

কথা না বলে সিধে হলো রানা, অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। 'চলো,' বলল ও।

মাস্তুলের বাঁধনগুলো বাতাসের চাপে গোঙাচ্ছে। ডেক ধরে দ্রুত এগোল ওরা। বেরিয়ে থাকা বাল্কহেডে রাশি রাশি বালি

পড়ছে। হাতছানি দিয়ে জর্জকে তাড়াহুড়ো করার ইঙ্গিত দিল রানা, একটা ডেকহাউসে ঢোকার সাথে সাথে আকস্মিক নিস্তব্ধতা অনুভব করল ও। ইস্পাতের মই বেয়ে এক নম্বর হোল্ডে নামছে।

বাতাস গরম এখানে, ভাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। দেখতে দেখতে ঘেমে গেল ওরা। অলস ডিজেলের শব্দ পাচ্ছে রানা, শব্দের সাথে সামান্য কাঁপছে জাহাজটা। খোলের প্লেটে সগর্জনে আছাড় খাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া। পেন্সিল টর্চের আলোয় ধুলো উড়তে দেখা গেল।

'খালি,' বলল রানা, জর্জের দিকে ঘুরল। 'রাশিয়ায় কি ধরনের কার্গো নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'স্পেয়ার অটো পার্টস। আমি নিজের চোখে লোড করতে দেখেছি।'

'আর ইটালিতে ফেরার পথে?'

'তা জানি না। বোধহয় খালি ফিরছিল।'

বালি ভরা মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে রানার। 'হোল্ড খালি থাকলে একটা শিপিং কোম্পানির লালবাতি জ্বলবে,' বলল রানা।

'তাহলে কার্গো কোথায়? প্রশ্নটা তোমার করা উচিত অ্যারোনাফিসকে, তাই না?'

'আংশিক উত্তর আমার বোধহয় জানা আছে,' বলল রানা।

'তাই?' জর্জের গলায় বিদ্রূপ।

'আমাদের অজানা কোন বন্দরে খালাস করা হয়েছে কার্গো, কিংবা অন্য কোন জাহাজে তোলা হয়েছে, সম্ভবত রোডস-এ বা রোডস-এর আশপাশে কোথাও—নেমিসিস হারিয়ে গেছে, এই খবরটা প্রচার করার পরে।' ধুলোর ভেতর শ্বাস নিল রানা। 'লগের অংশ ছিল জলপরী মেমো, জাহাজের ব্যবহার করা পথ গোপন

করার জন্যে ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়।'

'কেউ বোধহয় এ-সব লক্ষও করেনি, কিংবা লক্ষ করলেও গুরুত্ব দেয়নি,' বলল জর্জ। 'আমরা শুধু জানি একজন রুশ ভি.আই.পি. বিনা ভাড়ায় জাহাজটায় আত্মগোপন করে আছেন। তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়, কোস্টাস অ্যারোনাফিসকে ভুগতে হবে–তাকে, বা প্রতারণার জন্যে দায়ী লোকটাকে।'

'এসো, পরের হোল্ডটা পরীক্ষা করি।'

আরেকটা বাল্কহেডের দিকে এগোল রানা। সব কিছুর ওপর ধুলো জমে আছে, কপাল থেকে ঝরে পড়া ঘাম তার ওপর কালো ফোঁটা তৈরি করল। দু'নম্বর হোল্ডে নেমে পেন্সিল টর্চ জ্বালল রানা, ডেক খালি দেখে হতাশ হলো ও।

মুখের সামনে মুঠো করা হাতে নিঃশ্বাস ছাড়ল জর্জ, বাইরে গর্জন করছে বাতাস। 'এটাও দেখছি খালি,' মন্তব্য করল সে।

'মনে হয় না, দাঁড়াও দেখি,' বলে হোল্ডের শেষ মাথা লক্ষ্য করে আলো ফেলল রানা।

দু'জনেই চোখ কুঁচকে তাকাল, চোখের সামনে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাসের সাথে বালি উড়ছে। স্তূপ করা ক্যানভাস-এর মত কি যেন পড়ে রয়েছে কোণটায়, ঠিক চিনতে পারা গেল না।

সাবধানে এগোল রানা। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ওর পিছু নিল জর্জ।

কাছাকাছি এসে থামল ওরা। বড় আকৃতির কয়েকটা ব্যাগ ওগুলো। রাবারের তৈরি। এ-ধরনের ব্যাগে সাধারণত লাশ ভরা হয়, জানে রানা।

অমঙ্গল আশংকা করে রানার আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে উঠল,

স্তূপের প্রথম ব্যাগটার বাঁধন খুলতে অস্বাভাবিক বেশি সময় নিল ও। রক্ত, বমি আর প্রস্রাবের গন্ধ ঢুকল ওর নাকে। অ্যাসাইনমেন্টের দফা রফা হয়ে গেছে, খালি হাতে ফিরে যেতে হবে ওকে? ব্যাগের ভেতর সত্যিই কি নিকোলাই প্যাসিমভের লাশ দেখতে পাবে ও?

বাঁধন খুলে ব্যাগের মুখটা বড় করল রানা। টর্চের আলোয় একটা মুখ দেখা গেল।

'না তো!' রানার পাশ থেকে সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল জর্জ। 'এটা রুশ বিজ্ঞানীর লাশ নয়!'

'গ্রীনের?'

'না।' সরু গোঁফের ওপর নাক টানল জর্জ, দামী জাম্পসুটের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

বাকি ব্যাগগুলোয় কি আছে কে জানে। বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে রানার। দ্বিতীয় ব্যাগটা খুলতে বেশি সময় নিল না। আরও কম সময় লাগল শেষ ব্যাগটা খুলতে। ইতিমধ্যে দুর্গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস।

সব মিলিয়ে তিনটে লাশ। প্রত্যেকের সাথে মেরিটাইম অফিসারের প্রতীক চিহ্ন রয়েছে। একজনের ফিতে দেখে গ্রীক মার্চেন্ট মেরিনের ক্যাপটেন বলে চেনা গেল।

সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল লাশগুলোর দিকে। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব, হোল্ডের ভেতর নিস্তব্ধতা আর দুর্গন্ধ। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে নিউজপ্রিন্ট হয়ে গেছে ওর। জর্জের দিকে তাকাল না ও, মুখ থেকে কথা সরছে না।

বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন রয়েছে রানা। ব্যাপারটা এখন আর সাধারণ একটা কমার্শিয়াল জাহাজে

বেআইনী অনুপ্রবেশ নয়, জাহাজের নাবিক আর ক্রুদের নিরীহ ও গোবেচারা মনে করার কোন কারণ নেই। জাহাজটার নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতেই থাক, পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা। প্রয়োজনে আরও খুন করতে ইতস্তত করবে না।

নিস্তব্ধতা ভাঙল ডাচ জর্জ, 'মিউটিনি, তোমার ধারণা?'

'হতে পারে। পাইরেসিও হতে পারে।'

'আমার ধারণা, ওরা বাধা দিয়েছিল,' ইঙ্গিতে লাশগুলো দেখিয়ে বলল জর্জ।

'ব্যাগে লাশগুলো খুনিরাই ভরেছে, ভেবেছে গালফ অভ সুয়েজে পৌঁছে জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দেবে। খালে লাশ ফেলা মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার।'

'পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে না ভদ্রলোক ভাল অবস্থায় আছেন। এখানে তাঁর লাশ নেই...'

'তারমানে এই নয় যে তিনি বেঁচে আছেন,' বলল রানা। 'দেখতে হবে।'

'তাঁকে হয়তো কিডন্যাপ করা হয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল জর্জ।

একটা হ্যাচের দিকে পেন্সিল টর্চের আলো ফেলল রানা। শব্দ শুনে আন্দাজ করল, এঞ্জিন রূমটা হ্যাচের আরেক দিকে হবে। 'এখানে আর কিছু দেখার নেই আমাদের,' বলল ও। 'এসো।'

হ্যাচের হাতল ঘুরিয়ে টান দিল রানা। হাত টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাগিয়ে ধরল উজিটা। উত্তপ্ত লুব্রিকেটিং তেলের গন্ধ ঢুকল নাকে, সেই সাথে এঞ্জিন রূমের এক ফালি আলো পড়ল পায়ের কাছে। সতর্কতার সাথে খোলা মুখটা দিয়ে উঁকি দিল ও, পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে আনল মাথাটা।

তিনজন ক্রুকে দেখতে পেয়েছে রানা। গজ রিডিঙে ব্যস্ত একজন, বাকি দু'জন তেল ঢালছে আর ন্যাকড়া দিয়ে এটা-সেটা মুছছে।

সতর্কতার সাথে আবার একবার উঁকি দিল রানা।

ক্রুদের মাথার ওপর, গ্রিল লাগানো মেঝে সহ ক্যাটওয়াক, খোলের একটা পাশ ধরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়েছে সেটা। ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও একজন লোক, নিচের লোকগুলোর ওপর নজর রাখছে সে। হাতে ঝুলছে ভারি অটোমেটিক পিস্তল। চ্যাপ্টা মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল, ক্রুদের পাহারা দিচ্ছে সে।

পিছিয়ে এল রানা, জর্জের কানে ফিসফিস করল, 'এঞ্জিন রূমে যাচ্ছি আমি। তুমিও আসছ, তবে পিছন দিকে একটা চোখ রেখো।'

মাথা ঝাঁকাল জর্জ। 'ঠিক আছে।'

ঊরুর ওপর হাতের তালু ঘষল রানা, তারপর দরজা পেরিয়ে এঞ্জিন রূমে ঢুকল।

চ্যাপ্টা মুখে হতচকিত একটা ভাব ফুটে উঠল, নীল চোখে রাজ্যের বিস্ময়, ক্যাটওয়াক থেকে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। লোকটার মাথায় সীম্যান'স ক্যাপ একদিকে কাত হয়ে আছে। হাঁ করা মুখে বাতাস ঢুকছে সশব্দে।

'নোড়ো না,' গ্রীক ভাষায় নির্দেশ দিল রানা, ঝড় আর এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল ওর চিৎকার, হাতের উজিটা লোকটার দিকে তাক করা।

চ্যাপ্টা মুখ থেকে কর্কশ একটা শব্দ বেরোল, হাতের পিস্তলটা উঠে এল রেইলিঙের ওপর। গুলি না করে উপায় থাকল না রানার।

গর্জে উঠল সাবমেশিন গান।

বুলেট ছিনিয়ে নিল মাথার ক্যাপ, লোকটার পা দুটো হঠাৎ এমনভাবে ভাঁজ হয়ে গেল যেন পিচ্ছিল বরফে পিছলে গেছে। গ্রিলের ফাঁক গলে ঝর ঝর করে রক্ত নেমে এল, ছিটকে পড়ল চারদিকে।

তিনজন ক্রুর দিকে তাকাতে যাবে রানা, শুনতে পেল ক্যাটওয়াকে পড়ে থাকা লোকটা কথা বলছে। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সে, শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশিরে একটা ভাব অনুভব করল রানা।

লোকটা বলে উঠল, 'কে…!' রুশ ভাষায়।

রানার আগেই নেমিসিসে পৌঁছে গেছে কে.জি.বি।

ক্রু তিনজন কোন শব্দ করছে না। বড় বড় মেশিনের আড়াল থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে তারা। দরজা টপকে এঞ্জিন রূমে ঢুকল ডাচ জর্জ, ক্যাটওয়াকে পড়ে থাকা লাশটা দেখল, চোখে প্রশ্ন নিয়ে মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে।

গ্রীক ভাষায় প্রশ্ন করল রানা, 'এডওয়ার্ড গ্রীন নামে একজন ক্রু আছে, কোথায় সে?'

বিশাল ছাতি নিয়ে একজন ক্রু আড়াল থেকে খানিকটা বেরিয়ে এল। 'জাহাজে সে নেই, স্যার?'

'নেই কেন? কি হয়েছে তার?'

'জাহাজ থেকে পালিয়েছে। বুদ্ধিমান লোক।'

'কোথায়? জাহাজ তখন কোথায় ছিল?'

তিনজন ক্রু নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিল, চাপা কণ্ঠে। কিছুই শুনতে পেল না রানা। অবশেষে প্রথম লোকটা বলল, 'রোডসে, স্যার। আপনাকে আমরা বলে দিয়েছি, সেকথা কেউ

যেন না জানে, প্লিজ। আমাদেরকে শপথ করানো হয়েছে, রোডস নামটা পর্যন্ত মুখে আনতে পারব না। স্যার, আপনি কি এই অভিশপ্ত জাহাজ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন?'

রানা আর জর্জ নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল। দু'জনেই হতাশ।

লোকগুলোর দিকে ফিরল জর্জ, ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'নিকোলাই প্যাসিমভের কি হয়েছে?'

'কার?'

'বয়স্ক এক ভদ্রলোক ছিলেন জাহাজে, নিকোলাই প্যাসিমভ। গ্রীন তাঁর দেখাশোনা করত।'

'ও, আচ্ছা, তাঁর কথা বলছেন!' চওড়া বুকে হাত বোলাল লোকটা। ওপর দিকে একটা আঙুল খাড়া করল সে, চাপা কণ্ঠে বলল, 'ব্রিজে, স্যার। তাঁকে আমরা শেষবার দেখেছি অফিসার্স কোয়ার্টারে।'

'ভদ্রলোক এখনও জাহাজে আছেন,' বিড় বিড় করে বলল রানা, বিশ্বাস করতে পারছে না। 'আশ্চর্য, গ্রীন তাঁকে একা ফেলে রেখে পালিয়েছে।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল জর্জ। 'গ্রীন সেরকম লোকই নয়।'

'এইচআরসি-র লোকদের আমার চেনা আছে,' বলল রানা। 'প্রতিটি কাজ লেজেগোবরে করতে ওদের জুড়ি নেই।' হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ করল ও, চোখ তুলে তাকাল ওপর দিকে, কি যেন শুনতে পাবে বলে আশা করছে।

অস্পষ্ট শব্দটা এল খানিক পর। ঝড়ের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

লম্বা একজন ক্রু, মাথায় টাক, তিনজনের মধ্যে সেই এখন পর্যন্ত কোন কথা বলেনি, হঠাৎ কমপার্টমেন্টের দরজা লক্ষ্য করে

ছুটল। দরজাটা রানার বাম দিকে। 'এখানে আমি আর এক মুহূর্ত থাকছি না!' বলল সে, হ্যাচ গলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

পরমুহূর্তে একটা চিৎকার শোনা গেল, শব্দ হলো এক ঝাঁক বুলেট বর্ষণের, হ্যাচের বাইরে থেকে ছিটকে এঞ্জিন রূমে ফেরত এল লোকটা, সারা শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

আট

দু'নম্বর হোল্ডের দরজা লক্ষ্য করে ঝেড়ে দৌড় দিল ডাচ জর্জ, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির সাথে ধাক্কা খেলো, রক্তচক্ষু মেলে তাকাল নাবিকের দিকে, খেঁকিয়ে উঠল, 'যেতে দাও আমাকে, পথ ছাড়ো!'

দ্বিতীয় নাবিক ডেকের ওপর শুয়ে পড়েছে।

স্থির, শান্তভাবে অপেক্ষা করছে রানা। মোটর হাউজিঙ-এর দিকে তাক করা রয়েছে হাতের উজি।

ছুটে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল এক লোক, ঝাপসা হ্যাচওয়ে লক্ষ্য করে এক ঝাঁক গুলি করল রানা। চাপা গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল, পতন আর গড়ানোর শব্দ হলো, কে.জি.বি. এজেন্টের লাশের ওপর পড়ল একটা কালাশনিকভ অটোমেটিক অ্যাসল্ট রাইফেল, পিছু পিছু পড়ল রাইফেলের নিহত মালিকও।

ধুলোর সাথে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল বারুদের গন্ধ। উল্টোদিকের হ্যাচ লক্ষ্য করে ছুটল রানা।

অন্ধকার হোল্ডে ফিরে আসবার পর উৎকট গন্ধটা রানাকে মনে করিয়ে দিল, লাশগুলো পচতে শুরু করেছে। প্রকাণ্ডদেহী নাবিকের সাথে হোল্ডের শেষ মাথায় খোলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে ডাচ জর্জ, অস্পষ্টভাবে তাদের দেখতে পেল ও।

কাছাকাছি এসে নাবিকের উদ্দেশে কর্কশ গলায় বলল রানা, 'অফিসার্স কোয়ার্টার কোন্ দিকে?'

একটা হাত তুলে ঘন ঘন নাড়ল নাবিক। 'আমাকে মাফ করতে হবে, স্যার!'

লোকটার পেটে উজির মাজল চেপে ধরল রানা। আর্তনাদ করে উঠল সে।

'তুমি কি পাগল হলে?' অস্থির দেখাচ্ছে জর্জকে, ঘামে চকচক করছে কপাল। 'অফিসার্স কোয়ার্টারে খুন হবার জন্যে যেতে চাইছ? জাহাজটাকে শত্রুরা ঘাঁটি বানিয়ে রেখেছে...'

'শান্ত হও,' ধমক দিল রানা।

'এখানে থাকলে আমরা বাঁচব? আমাদের কোন আশা আছে?' পাল্টা চিৎকার করল জর্জ।

'বেরুতে হলেও যুদ্ধ করে পথ করে নিতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'তোমাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম, বিপদ হতে পারে।'

নাবিকের দিকে তাকাল জর্জ। 'কি বলল তুমি শুনেছ। অফিসার্স কোয়ার্টার। পথ দেখাও!' সিধে হয়ে দাঁড়াল সে।

আপার ডেকে ছায়ার ওপর ছায়া পড়ে জ্যামিতিক নকশা তৈরি করেছে। বাতাসতাড়িত ধুলোয় সব কিছু ঝাপসা আর অস্পষ্ট। একটা ডেকহাউসের পাশে পৌঁছে আটকে রাখা দম ছাড়ল রানা, হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলিয়ে উপলব্ধি করল খালের

পাড় থেকে ভেলা নিয়ে রওনা হবার পর পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। আরও কতক্ষণ স্থির থাকবে কনভয়, ওর জানা নেই। মিলির কথা মনে পড়ল, অন্ধকার হাইওয়েতে ওদের ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছে একা। মেয়েটা না আবার নার্ভাস হয়ে পড়ে।

'ওই, ওপরে!' আপার ব্রিজের পোর্টহোলের দিকে একটা হাত তুলল গ্রীক নাবিক। ম্লান আলো দেখা গেল সেদিকে।

ঝাপটা দিয়ে তার হাতটা নামাল রানা, চারজন লোকের একটা দলের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল। ভৌতিক ছায়ার মত এগিয়ে আসছে তারা, একজনের পিছনে একজন, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। রেইল ধরে এদিকেই এগিয়ে আসছে তারা।

রানাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দলটাকে লক্ষ্য করে গুলি করল ডাচ জর্জ। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ, খুব বেশি হলে পনেরো গজ দূরে, ধুলো আর বাতাসের ভেতর স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো, বুলেটের ধাক্কায় রেইল টপকে খালের পানিতে পড়েছে লাশগুলো।

ওদের গোপন অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে। রাগের সাথে নির্দেশ দিল রানা, 'ব্রিজের দিকে ছোটো!'

'এখনও সময় আছে, রানা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জর্জ। 'বাঁচতে চাইলে চলো পালাই…'

কষে একটা চড় মারল রানা জর্জের গালে। 'কে আসতে বলেছিল তোমাকে?' আবার চড় তুলে গর্জে উঠল চাপা গলায়, 'হাঁটো!'

ভিজে বেড়ালের মত এগোল জর্জ।

ব্রিজের সুপারস্ট্রাকচার কালো পাহাড়-প্রাচীরের মত উঁচু হলো ওদের সামনে।

‘গুলি করার আগে আমার অনুমতি নেবে,’ বলল রানা।

ও থামতেই, ওদের কাঁধের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল। পিছন থেকে এল আওয়াজটা। গুঙিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ল গ্রীক নাবিক। আঁচড়াআঁচড়ি করে একটা মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। মুহূর্তের জন্যে থামল, উজিটা ঘুরিয়ে বিস্ফোরণের উৎস লক্ষ্য করে ফায়ার করল। রানার উজি থামতেই গর্জে উঠল জর্জের উজি।

অকস্মাৎ ফ্লাডলাইটের আলোয় দিনের মত পরিষ্কার হয়ে উঠল গোটা জাহাজ।

হলদেটে ধূলিঝড়ে ঝাপসা হয়ে আছে আফটারডেক। চারদিকে আলোর বন্যা, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একদল রাশিয়ান এজেন্ট, সংখ্যা দশ-বারোজনের কম নয়, ব্যগ্রতার সাথে এদিক ওদিক ঘন ঘন তাকিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজছে। সবার হাতে অটোমেটিক এ/কে অ্যাসল্ট রাইফেল, সামনের উঁচু করা সাইট আর ম্যাগাজিন ক্লিপ দেখে চিনতে পারল রানা। দলটার আরও পিছনে, উঁচু মঞ্চের ওপর, আরও একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতের রাইফেল রানার দিকে তাক করা, লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছে, সেই সাথে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে কি যেন বলছে চিৎকার করে।

চারদিকে বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো।

বেঢপ একটা আকৃতি নিয়ে করিডরে খসে পড়ল রানা। এক সেকেন্ড পরে পড়ল জর্জ, তার হাত থেকে ছিটকে দূরে সরে গেছে উজিটা।

তাড়াতাড়ি সিধে হলো দু’জন। দড়াম করে কম্প্যানিয়নওয়ের হ্যাচটা বন্ধ করে দিল রানা, প্রতিটি স্টেটরুমের দরজায় সজোরে

ঘুসি মারল, নিকোলাই প্যাসিমভের নাম ধরে ডাকল।

করিডরের অর্ধেকটা পেরিয়ে আসার পর একটা স্টেটরূমেই পাওয়া গেল তাঁকে।

ফটোতে দেখা চেহারার সাথে সামান্যই মিল খুঁজে পেল রানা। বয়স পঞ্চাশ, কপালটা উঁচু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চোয়াল, চেহারায় ক্লান্তি। চোখ দুটো পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরে, ঝাপসা সবুজ মণি। ক্লান্তি তাঁর চেহারা থেকে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলতে পারেনি। ধ্যানমগ্ন শান্ত একটা ভাব লক্ষ করল রানা, যা শুধু আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়চেতা একজন মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ভদ্রলোক যে সাধারণ কেউ নন, সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। সার্জ-এর একটা স্ল্যাকস পরে আছেন তিনি, গায়ে সুতো বেরিয়ে আসা টুইড জ্যাকেট, ঢোলা, কম্বলের মত জড়িয়ে রেখেছে তাঁকে। দর দর করে ঘামছেন তিনি।

'কে তোমরা? কি চাও?' রুশ ভাষায় জানতে চাইলেন নিকোলাই প্যাসিমভ। রানার মনে হলো, তিনি যেন কারও আসার অপেক্ষায় সজাগ ছিলেন।

'আমাদের সাথে আসুন,' দ্রুত বলল রানা, সবিনয়ে। 'প্লিজ।'

'না!'

'আমরা আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি,' বলল রানা। 'এখানে থাকলে আপনার বিপদ হবে। আপনাকে যারা সাহায্য করছে, এইচ-আরসি, আমরা...'

'না! তোমাদের আমি চিনি না...'

কথা না বলে রানাকে পাশ কাটাল ডাচ জর্জ, নিকোলাই প্যাসিমভের একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলল। তাঁকে টেনে রানার দিকে নিয়ে আসছে সে। ধস্তাধস্তি শুরু করলেন রুশ

বিজ্ঞানী, তাঁর পা দুটো ধুলো ঢাকা ডেকে ঘষা খাচ্ছে। 'কি ব্যাপার, নিজের কিসে ভাল বুঝতে পারছেন না?' ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠল সে, অতিরিক্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

'বুঝতে তোমরা পারছ না!' ইংরেজিতে জবাব দিলেন নিকোলাই প্যাসিমভ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। 'সোভিয়েত রাশিয়ায় ফিরে যেতে চাই আমি!'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। জর্জের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আপনি বোধহয় ভয় পাচ্ছেন, আমরা আপনার ক্ষতি করতে পারি,' বলল জর্জ। 'আসলে আমরা আপনার বন্ধু...'

'কথার সুরেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি আমেরিকান,' নিকোলাই প্যাসিমভ বললেন।

'তাতে কি হলো? এইচআরসি-তে আমার মত আরও অনেক আমেরিকান আছে। আমাদেরকে পাঠানোই হয়েছে আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে...'

'জানি, জানি,' নিকোলাই প্যাসিমভ গম্ভীর হলেন। 'তোমরা আমাকে চাও। আমাকে তোমাদের দরকার।'

'চিন্তা করবেন না, মি. প্যাসিমভ,' বলল রানা। 'আপনি যদি আমেরিকায় যেতে না চান, কেউ আপনাকে সেখানে জোর করে পাঠাবে না। আমি কথা দিচ্ছি, আপনি আমাদের সাথে নিরাপদে থাকবেন।'

'আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন না আপনারা,' একাধারে ধমক ও অভিযোগের সুরে বললেন প্যাসিমভ। 'আমি সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্বস্ত নাগরিক। আমার দেশকে আমি ভালবাসি। আমেরিকা বা অন্য কোন দেশ যদি ভেবে থাকে আমার সাহায্য

নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার অনিষ্ট করবে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে।'

হতভম্ব হয়ে গেল জর্জ। 'এ-সব আপনি কি বলছেন!'

রানা চাপা গলায় বলল, 'আলোচনা করার সময় নেই!' ঘাড় ফিরিয়ে করিডরের দিকে তাকাল চট করে। 'কম্প্যানিয়নওয়ে হ্যাচ দিয়ে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ওরা।'

রানার কথা কানে তুললেন না রুশ বিজ্ঞানী। 'আমেরিকানরা আমাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, আমার জ্ঞান আর আবিষ্কারগুলো আমার দেশের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চাইবে, তাই না?' আমেরিকান ডাচ জর্জের দিকে ফিরে কথা বলছেন তিনি। 'আমি একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, কিছুদিন আগে আমার দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা গবেষণার সাথে জড়িত ছিলাম...অবশ্য এ-সবই তোমাদের জানা থাকার কথা।'

'মার্কিন সরকারের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই,' বলল জর্জ। 'আমি এইচআরসি-র...'

'কিন্তু তবু তুমি একজন আমেরিকান।' রানার দিকে ফিরলেন নিকোলাই প্যাসিমভ। 'আর তুমি? তুমি কে?'

নিজের পরিচয় দিল রানা, সত্যি কথাই বলল। 'আমি একজন এজেন্ট, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এ আছি। রাশিয়ার সাথে কোন ব্যাপারেই আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। আমার এখানে উপস্থিত থাকার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য, আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আপনি শুধু রাশিয়ার গর্ব নন, গোটা দুনিয়ার গর্ব। আপনার কিছু হলে সবাই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। তাই...'

হঠাৎ বিষণ্ন হাসি ফুটল নিকোলাই প্যাসিমভের ঠোঁটে।

'বাংলাদেশ, তাই না? দরিদ্রস্য দরিদ্র, যদি কিছু মনে না করো। তোমাদের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়! বর্তমান দুনিয়ায় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব হচ্ছে না বলেই আজ তোমরা মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছ। আমার ফর্মুলা অনুসারে পারমাণবিক শক্তি শুধু যদি শান্তির কাজে ব্যবহার শুরু হয়, বিশ্বাস করো, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলোর চেহারা রাতারাতি বদলে যাবে...'

'আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'কিন্তু আপনার কথা পরে শুনব। আমরা সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে রয়েছি, মি. প্যাসিমভ। এখুনি যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারি, ওরা আমাদেরকে...'

'বেরিয়ে যাব? বেরিয়ে কোথায় যাব?'

রাগ চেপে রানা বলল, 'বললাম না, আমরা আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখব? আমাদের সাথে আপনি...'

রানাকে থামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। 'বাংলাদেশী একজন এজেন্টকে কেন আমি বিশ্বাস করব? তুমি যে আমেরিকানদের চর নও, কি করে বুঝব আমি? বাংলাদেশ আমেরিকান এইড পায়, কি করে বুঝব তাদের ইন্টেলিজেন্স সি.আই.এ-কে সাহায্য করছে না?'

জবাবে রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওকে থামিয়ে দিলেন নিকোলাই প্যাসিমভ।

গম্ভীর হাসির সাথে তিনি বললেন, 'আমি যা জানি, আমেরিকানদের কখনোই তা জানাব না, তবে জানার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তারা, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত তারা, জানতে না পারলেও রটিয়ে দেবে যে

জেনেছে–সাইকোলজিক্যাল সুবিধে আদায়ের উদ্দেশে। কোন না কোনভাবে তারা আমাকে ব্যবহার করবে, যাতে আমার দেশের নেতারা বিশ্বাস করেন যে কোন রহস্যই আর গোপন নেই।'

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল রানা, বলল, 'তাহলে আপনি রাশিয়া থেকে বেরুলেন কেন? নিশ্চয়ই আবার ফিরে যাবার জন্যে নয়? সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন হঠাৎ করে, কারণটা কি বলুন তো?'

ক্লান্তি আর হতাশা ফুটে উঠল রুশ বিজ্ঞানীর চেহারায়, ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। 'এভাবে রক্ত ঝরবে, এত মানুষ মারা যাবে, দুঃস্বপ্নেও আমি তা ভাবিনি। ভাবিনি আমেরিকানরা আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে। আমি শান্তির সপক্ষে সারা দুনিয়ায় একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম মাত্র, দেশের সাথে বেঈমানী করতে রাজি নই।'

'ফিরবেন কিনা, সেটা আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত,' জর্জ বলল। 'কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি, ফেরার পর কি ঘটবে? কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে, অবৈধভাবে দেশত্যাগ করেছেন আপনি, আপনাকে গ্রেফতার করা হবে না তো? আপনি যদি অন্য কোন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন, সেখান থেকে অন্তত আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে দুনিয়ার মানুষ।'

'একজন বেঈমানের কণ্ঠস্বর হবে সেটা,' প্যাসিমভ বললেন, 'আমি যদি আমেরিকায় আশ্রয় নিই।'

গলায় আবেদন ফুটিয়ে জর্জ বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো বলছি, আমি এইচআরসি-র লোক। আপনার রাশিয়ায় ফেরার বা আমেরিকায় যাবার কোন দরকার নেই। যেখানে যেতে চান সেখানেই আমরা আপনাকে পৌঁছে দেব, কথা দিচ্ছি।'

'আমি জোর করার পক্ষপাতি নই,' বলল রানা। 'উনি যদি

রাশিয়ায় ফিরতে চান, আমি বাধা দেব না।' মনে মনে ভাবছে ও, ভদ্রলোক না শেষ পর্যন্ত স্বদেশীদের হাতে খুন হয়ে যান।

'আমেরিকা ছাড়া অন্য কোন দেশে যেতে পারলে মন্দ হত না,' প্যাসিমভ সখেদে বললেন। 'কিন্তু অন্য কোন দেশে নিয়ে যাবার কথা বলে আমাকে যে আমেরিকাতেই নিয়ে যাওয়া হবে না, তা বুঝব কিভাবে? না, এত বড় ঝুঁকি আমি নিতে রাজি নই।'

স্যাঁৎ করে প্যাসিমভের দিকে সরে এল রানা, তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। সুপারস্ট্রাকচারের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে পায়ের ও গলার আওয়াজ ভেসে এল। রাশিয়ানরা সম্ভবত ওদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। এই মুহূর্তে ওর করণীয় কি?

রুশ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সোভিয়েত সরকার প্যাসিমভের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেবে, রানা জানে না। তবে যার নেতৃত্বে কে.জি.বি-র এজেন্টরা প্যাসিমভ সমস্যা সমাধান করতে এসেছে তাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না ও। রুস্তমভ বা তার এজেন্টরা যে নিকোলাই প্যাসিমভকে দেখামাত্র গুলি করবে না, তার নিশ্চয়তা কি? তারা তো আর জানে না যে প্যাসিমভ তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন?

কাজেই নিকোলাই প্যাসিমভের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়া দরকার।

ভদ্রলোকের কাঁধে হাত রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা, 'বাধা দেবেন না, প্লিজ, মি. প্যাসিমভ। আপাতত আপনি আমাদের সাথে যাচ্ছেন। কথা দিচ্ছি, যেখানে চাইবেন সেখানেই আপনাকে পৌঁছে দেয়া হবে।'

দ্রুত পায়ে আউটার বাল্কহেডের দিকে এগোল রানা, চৌকো একটা পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। বেশির ভাগ

ফ্রেইটার লাইফবোট বহন করে ব্রিজের ওপর, জানে ও। নেমিসিসেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। জানালার ঠিক নিচেই ক্যানভাসে ঢাকা একটা লাইফবোটের বো দেখা গেল, নিজস্ব ডেভিট থেকে ঝুলছে।

স্টেটরুমের দোরগোড়ায় ফিরে এসে জর্জকে বলল রানা, 'পোর্টহোল দিয়ে বের করো ওঁকে, লাইফবোটে তোলো। আমি তোমাদের কাভার দেব।'

রাগের সাথে প্রতিবাদ জানাল জর্জ। 'লাইফবোট আমরা নামাব কিভাবে? কিভাবে নামাতে হয় তাই আমি জানি না। আর বাইরে যে লোক রয়েছে তার কি হবে?'

করিডরের শেষ মাথায় কম্প্যানিয়নওয়ের দরজা অকস্মাৎ দড়াম করে খুলে গেল। স্যাঁৎ করে স্টেটরুমের ভেতরে সরে এল রানা, ছেড়ে আসা জায়গা দিয়ে ছুটে গেল উত্তপ্ত এক ঝাঁক সীসা। রানার হাতের উজি পাল্টা জবাব দিল, সেই সাথে জর্জের উদ্দেশে চিৎকার করল ও, 'বোট নিয়ে ভাসতে হবে না। ওটাকে প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করো। ওখান থেকে লাফ দিলে পানিতে পড়বে খোল থেকে নিরাপদ দূরত্বে।'

স্টেটরুমের বাইরে উঁকি দিয়ে আবার এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ল ও, ভেতরে টেনে নিল মাথাটা।

সাথে সাথে পাল্টা জবাব দিল প্রতিপক্ষ।

তবে, এগোতে সাহস পাচ্ছে না তারা, এমনকি হলওয়ের দরজাটাও কেউ পেরুতে চেষ্টা করছে না।

শব্দ শুনে রানা বুঝল, পোর্টহোলটা খুলতে পেরেছে জর্জ। স্টেটরুমের ভেতরটা বালি আর ধুলোয় ভরে গেল।

স্টেটরুমের পিছন দিকে, দ্বিতীয় দোরগোড়া থেকে উঁকি

দেয়ার জন্যে ছুটল রানা, করিডরের উল্টোদিকের প্রান্তে সিঁড়ির একটা ল্যান্ডিং রয়েছে ওদিকে। কাউকে দেখল না রানা, তবু এক ঝাঁক গুলি করে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষদের সাবধান করে দিল ও, এদিক দিয়ে আসার চেষ্টা করলে বাধা পেতে হবে।

প্রথম দোরগোড়ায় রানার অনুপস্থিতি টের পেয়ে করিডরে বেরিয়ে এল প্রতিপক্ষরা, তাদের ছুটন্ত বুট জুতোর শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি জায়গা বদল করে আবার গুলি করল রানা, হিপ পকেট থেকে স্পেয়ার বের করে খালি ক্লিপের জায়গায় ভরল, উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল ধুলোয় ঝাপসা পোর্টহোলের দিকে।

কাউকে দেখল না। প্যাসিমভকে নিয়ে চলে গেছে জর্জ।

অন্তত পাঁচ মিনিট প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখার ইচ্ছে ওর। হাবভাব দেখে ধরে নিয়েছে, সরাসরি স্টেটরূমে ঢুকে পড়ার চেষ্টা তারা করবে না। তাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে, ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছে তারা। প্রাণ বিসর্জন না দিয়েও ওকে তারা ধরতে বা খুন করতে পারবে, সময়ের ব্যাপার মাত্র।

থেমে থেমে গুলি করছে কে.জি.বি. এজেন্টরা। শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছে, তারা সরে যায়নি।

বাইরে সগর্জনে বয়ে যাচ্ছে খামসিন।

ধুলোর ভারি মেঘ ধাতব খোলের গায়ে সশব্দে ঝাপটা মারছে।

রানার গলা থেকে শুকনো কাশি বেরোল, ঘাম মুছল চোখ থেকে, হাতঘড়ি দেখল।

প্যাসিমভকে নিয়ে জর্জ কোন বিপদে পড়ল কিনা কে জানে। পোর্টহোল দিয়ে একবার উঁকি দিতে পারলে ভাল হত।

আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। পাঁচ মিনিট এত লম্বা হয়!

কম্প্যানিয়নওয়ের দিক থেকে আবার এক পশলা গুলি হলো।

আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছেন প্যাসিমভ।

বিস্ফোরণের আওয়াজ হবে, দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে শক্ত করল রানা, দোরগোড়া থেকে উজির নল বের করে প্রায় সম্পূর্ণ ক্লিপ খালি করে ফেলল, গুলি ছুঁড়ল কম্প্যানিয়নওয়ের দু'দিকেই। ধুলোয় ভরা বাতাসে ধোঁয়ার রেখা দেখা গেল। হাতের উজি ফেলে স্টেটরুমের ওপর দিয়ে দৌড় দিল রানা, যেন তাড়া করেছে ভূত।

ভয়ানক ব্যস্ততার সাথে জানালা থেকে লাফ দিয়ে লাইফবোটে নামল ও। কাপড় ধরে হ্যাঁচকা টান দিল খামসিন, খামচি দিল চোখে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল লাইফবোট থেকে। নিচে তাকিয়ে কালো অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না রানা।

লাফ দিয়ে শূন্যে পড়তে যাবে, কান ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল ও।

লাফ দেয়ার পরও প্রায় মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল কয়েকটা বুলেট।

ছলকে উঠে রানাকে গ্রহণ করল খালের পানি, গ্রাস করল ওকে। কয়েক মুহূর্ত ডুব সাঁতার দিল রানা। দিক্‌ভ্রান্ত হলো কিনা দেখার জন্যে মাথা তুলল পানির ওপর।

ছুটোছুটি, চিৎকার, ধমক আর নির্দেশের শব্দ ভেসে এল নেমিসিস থেকে। খালের অন্ধকার পানিতে একটা সার্চলাইটের আলো চঞ্চল হয়ে উঠল, তবে ইতিমধ্যে খালের কিনারায় ঢালটা পেয়ে গেছে রানা। উঠে এল ও, ঝর ঝর করে পানি ঝরছে গা থেকে।

ছুটছে রানা, এরইমধ্যে কাপড়চোপড় আর গায়ে শুকিয়ে যাচ্ছে বালি। লম্বা পায়ে ছুটছে ও, অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। দূরে

কোন আলোর চিহ্ন নেই, তারমানে ইলেকট্রিসিটি এখনও ফিরে আসেনি। আসার কথাও নয়। পথটা চিনতে অবশ্য কোন অসুবিধে হলো না। আধমাইল দূরে রয়েছে লিয়ার জেট, পৌঁছুতে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। আরে! এরইমধ্যে হাল ছেড়ে দিল ওরা! নেমিসিসের সব ক'টা ফ্লাড আর সার্চলাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে।

নাক-মুখ জ্বালা করছে রানার, ভেতরে বালি জমেছে। কর কর করছে চোখ। চারপাশের দুনিয়া যেন বিশাল এক গরম উলের তৈরি একটা মুঠোর ভেতর রয়েছে। রাস্তার ওপর বালির পুরু স্তর জমে গেছে। খালের দিক থেকে জাহাজের আলোর আভা রাস্তার দিকে পৌঁচেছে খানিকটা, লিয়ার জেটটা এতক্ষণে ওর দেখতে পাবার কথা।

ছোটার গতি আপনা থেকেই কমে এল রানার। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল ও। চোখ জ্বালা করে ওঠায় আঙুল তুলে ঘষল বার কয়েক। পথ ভুল করে থাকতে পারে, কিন্তু তা ওর মনে হলো না। ভাল করে চারদিকে চোখ বুলোবার পর নিশ্চিত হলো ও। ঠিক জায়গাতেই পৌঁচেছে।

কিন্তু প্লেনটা নেই কোথাও।

মরুভূমির মাঝখানে ওকে ফেলে চলে গেছে ডাচ জর্জ আর মিলি পুলটিস।

হঠাৎ বিপদের আভাস পেল রানা। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

ধূলিঝড়ের ভেতর শক্তিশালী টর্চের আলো এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে।

একদল কে.জি.বি. এজেন্ট পিছু নিয়েছে ওর।

রানা একা, উজিটাও নেই সাথে।

নয়

দু'দিন পরের ঘটনা। ঢাকা থেকে বি.সি.আই-এর চীফ কন্ট্রোলার (অপারেশনস) সোহেল আহমেদ এথেন্স পৌঁছুল। ইতিমধ্যে সুয়েজ ক্যানেলের ঘটনাটাকে মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স নেমিসিস ইনসিডেন্ট বলে নামকরণ করলেও, তদন্তে কোন অগ্রগতি হয়নি বলে প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি দেয়া হয়নি বা ঘটনার সাথে জড়িত পক্ষগুলোর সাথে যোগাযোগও করা হয়নি।

এথেন্সে পৌঁছেই, সরাসরি ভ্যাসিলিসিস সোফিয়াস এভিনিউতে চলে এল সোহেল, ছ'ফুট উঁচু পাঁচিল আর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা বি.সি.আই. এথেন্স শাখার অফিসটা এখানেই, হিলটন হোটেলের কাছাকাছি। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মিডইস্ট আর ইউরোপে নয় দিনের শুভেচ্ছা সফরে আসছেন, তাঁর এই সফর উপলক্ষে অগ্রবর্তী দলের একজন সদস্য হিসেবে জেনেভা হয়ে এথেন্সে এল সোহেল, বিভিন্ন দেশের বন্ধুভাবাপন্ন ইন্টেলিজেন্স চীফদের সাথে পুরানো সম্পর্ক ঝালাই করে নেয়ার এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে ও।

তার উপস্থিতির খবর একজন সিকিউরিটি গার্ড জানাল চন্দন সরকারকে। গোপন রিপোর্ট, ডোশিয়ে ইত্যাদি টেবিলে গুছিয়ে রাখছিল চন্দন, এই সময় গট গট করে তার অফিস কামরায় ঢুকল সোহেল।

'রানার শেষ খবর?' কোন ভূমিকা না করে সরাসরি জানতে চাইল সোহেল।

নীল সার্জের সুট পরে আছে সে, কোটের একটা আস্তিন নড়াচড়া না করায় বোঝা যায় তার একটা হাত নেই। হাত থাক বা না থাক, তার আত্মপ্রত্যয় এতই প্রবল যে জীবনে কখনও কোন ব্যাপারে, হীনম্মন্যতায় ভোগে না সে। বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টারে যে-ক'টা অমূল্য রতন আছে তার মধ্যে একজন সোহেল আহমেদ, কানাঘুষা শোনা যায় মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান অবসর নিলে চীফ-এর আসনে বসার জন্যে যে দু'জনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে তাদের মধ্যে আছে সে। সাধারণ বাঙালীদের চেয়ে একটু বেশি লম্বা সোহেল, ফর্সা। তার সরল খোশমেজাজী চেহারা দেখে যাই মনে হোক, তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির অধিকারী সে, প্রয়োজনে জল্লাদের মত নিষ্ঠুর হতে জানে। রানার সাথে তার মানিকজোড় সম্পর্ক।

'কোন খবরই নেই, সোহেল ভাই। মাসুদ ভাই যেন দক্ষিণ মেরুতে হারিয়ে গেছেন।'

'ঈজিপশিয়ানরা কোন আভাস দেয়নি?' প্যাড লাগানো একটা চেয়ারে বসল সোহেল, চন্দনের ডেস্কের কাছাকাছি।

'কিচ্ছু না!' নার্ভাস ভঙ্গিতে লালচে গোঁফ ঠিকঠাক করল চন্দন। 'আমরাও কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি না।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল সোহেল, তার ঘন কালো চোখে

বরফ শীতল দৃষ্টি। ওয়াকিং স্টিকের মাথাটা মুঠোর ভেতর নিয়ে মোচড়াচ্ছে সে, ওটায় যে আসলে ছোটখাট অনেকগুলো বিচিত্র ধরনের অস্ত্র লুকানো আছে তা খুব কম লোকেই জানে। 'তোমার সমস্ত রিপোর্ট আমার পড়া আছে, চন্দন,' বলল সে, নীল ট্রাউজারের কড়া ভাঁজ একজায়গায় সিধে করল। 'তবু সব কথা তোমার মুখ থেকে আরেকবার আমি শুনতে চাই। আর এক ঘণ্টার মধ্যে প্যারিস থেকে কায়রোর উদ্দেশে রওনা হবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট…তোমাকে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলার দরকার করে না যে ব্যাপারটার মধ্যে চরম অপ্রতিভ হবার উপাদান লুকিয়ে রয়েছে?'

নিজের জন্যে কাপে কালো কফি ঢালল চন্দন, চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। সামান্য মাথা নেড়ে আগেই জানিয়ে দিয়েছে সোহেল, সে খাবে না। পাশের কোড রূম থেকে ভেসে আসছে টেলিপ্রিন্টারের একঘেয়ে শব্দ।

'পরশু রাতে মাসুদ ভাই রোডস ত্যাগ করার পর, তাঁর সাথে আমার কোন যোগাযোগ ঘটেনি,' বলল চন্দন, চেয়ার ছেড়ে মিশরের বড় একটা দেয়াল-মানচিত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রুলারের ডগা দিয়ে সুয়েজ খালের আল-বালাহ বাইপাস স্পর্শ করল সে। 'আমার জানামতে এদিকে যাওয়ার কথা তাঁর। পোর্ট সাঈদ থেকে আমাদের ইনফর্মার একটা কনভয় শিডিউল পাঠিয়েছে। দেখে মনে হয়েছে, নেমিসিসে ওঠার জন্যে এটাই সবচেয়ে আদর্শ জায়গা। কিন্তু আমরা এমনকি জানিই না যে মাসুদ ভাইয়ের প্লেন ওখানে পৌঁচেছে কিনা।'

সোহেল বলল, 'সাধারণ কোন দুর্ঘটনায় সাগরে ডুবে গেছে ও, রানার বেলায় আমি তা মেনে নিতে রাজি নই। ওকে যদি মিশরীয়

আকাশে গুলি করে নামানো হত, খবরটা আমরা ইতিমধ্যে জানতে পারতাম। এসো, ধরে নিই, গন্তব্যে পৌঁচেছে ও।' এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে জানতে চাইল, 'কি ধরনের প্লেন নিয়ে গেছে রানা?'

'বলতে পারছি না। তিনি বলেননি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি।'

'তাহলে তো সহজে জানার কোন উপায় নেই ইতিমধ্যে সেটা রোডসে ফিরে এসেছে কিনা।'

'অবশ্যই মাসুদ ভাইকে রেখে নয়, সোহেল ভাই। আর, তিনি যদি ফিরতেন, এতক্ষণে নিশ্চয় যোগাযোগ করতেন আমাদের সাথে।'

'জাস্ট কাস্টিং অ্যাবাউট, চন্দন,' মৃদুকণ্ঠে বলল সোহেল। তার ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। 'ওর চুপচাপ থাকার একটাই অর্থ হতে পারে তাহলে। এখনও মিশরে আছে ও।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল চন্দন, তারপর সশ্রদ্ধ বিনয়ের সাথে বলল, 'কথাটা তুলতে আমার ভাল লাগছে না, সোহেল ভাই–তিনি তো মারাও গিয়ে থাকতে পারেন।'

সদয়, মৃদু হাসি ফুটল সোহেলের মুখে, যেন চন্দনের অজ্ঞতা লক্ষ করে কৌতুক বোধ করছে সে। কথা বলল না।

'সোহেল ভাই, আমি…'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল সোহেল। 'রানা মারা গেলে আমি জানতে পারব।'

'জ্বী, সোহেল ভাই?' চন্দনের মনে হলো, শুনতে ভুল করেছে সে।

এখনও হাসছে সোহেল। 'রানাকে আমি এত ভালবাসি, ও যদি কোন দিন আমাকে ত্যাগ করে, সাথে সাথে টের পেয়ে যাব আমি। যেমন আমি ওকে ত্যাগ করলে…'

একটু দেরিতে হলেও, চন্দন বুঝতে পারল, সোহেল ভাইয়ের 'আমাকে' শব্দটার মানে হবে এখানে দুনিয়াকে। ওদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উপলব্ধি করে শুধু বিস্মিত নয়, শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল তার মাথা। 'সোহেল ভাই?'

'বলো?'

'মিশরীয়দের কিভাবে সামলাব? ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায়?'

'সাধারণ নিয়ম হলো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজেদের লোক বলে স্বীকার না করা, মিশন পরিত্যাগ করা ও ক্ষতি স্বীকার করে নেয়া।'

কফির কাপে চিন্তিতভাবে তাকাল চন্দন, 'আমি ধারণা করেছিলাম, এই কথাই বলবেন আপনি।' তার এই কথার মধ্যে কি যেন একটা চাপা রয়েছে, উপলব্ধি করল সোহেল।

'আমি বলেছি, সাধারণ নিয়ম,' ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে বলল সোহেল। 'কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেখানে মাসুদ রানা, সেখানে সাধারণ নিয়ম খাটবে না, চন্দন। আল্লাহ না করুন, রানার যদি কিছু হয়, অবশ্যই দায়ী প্রতিপক্ষকে চরম দণ্ড পেতে হবে, যাতে পায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। বি.সি.আই-এর ক্ষমতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ বা হীনম্মন্যতায় ভোগার কোন কারণ নেই, তুমিও তা জানো। আমরা প্রতিশোধ নেব। তবে, মিশর বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র, তারা জেনেশুনে রানার ক্ষতি করবে না। রানার যদি কোন ক্ষতি হয়, তার পিছনে হাত থাকবে সি.আই.এ. বা কে.জি.বি-র–কারণ দুটোতেই কিছু কিছু অফিসার আছে যাদের চক্ষুশূল রানা!'

'আর, মিশনটার কি হবে, সোহেল ভাই?'

'নীতির ব্যাপারে সব সময় অটল থাকব আমরা,' বলল সোহেল। 'রুশ বিজ্ঞানী নিকোলাই প্যাসিমভের ব্যাপারে আমাদের

নীতি হলো, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা হবে না। তবে, তিনি যদি দেশের সাথে বেঈমানী করার উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করতে চান, আমরা তাতে বাধা দেব। যদিও, তাঁর দ্বারা এ-ধরনের নোংরা কোন কাজ হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু, তুমি অন্য কি যেন ভাবছ বলে মনে হচ্ছে—কি, চন্দন?'

'সোহেল ভাই, আমি ভাবছি...মাসুদ ভাই যেহেতু কোন খবর দিতে পারছেন না, মিশনটা সফল করার জন্যে নতুন আরেকজনকে পাঠালে কেমন হয়? মাসুদ ভাই কি অবস্থায় আছেন আমরা জানি না...'

'যার কাজ তাকে সাজে, চন্দন,' বলল সোহেল। 'অনেক ভেবে-চিন্তে অ্যাসাইনমেন্টটা রানাকে দেয়া হয়েছে, ওর কোন বিকল্প পাওয়া যায়নি। আমি আশা করছি, ও-ই মিশনটা সফল করবে।'

'কিন্তু...?'

'ওকে আমরা পাচ্ছি কোথায়, এই তো?'

'জ্বী।'

এক সেকেন্ড পর সোহেল যেন জনান্তিকে কথা বলতে শুরু করল, 'মিশরীয় প্রেসিডেন্ট যে-কোন সংকটে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে অভ্যস্ত, সমস্যার দ্রুত সমাধান পাবার জন্যে নিয়মের বাইরে যেতেও দ্বিধা করেন না তিনি। ধরে নেয়া চলে, আর কারও মধ্যে এই গুণ দেখতে পেলে খুশিই হবেন ভদ্রলোক।'

'ঠিক বুঝলাম না, সোহেল ভাই।'

'রানার তৎপরতা মিশরের বিরুদ্ধে নয়, সি.আই.এ. আর কে.জি.বি-র বিরুদ্ধে। এটা যদি সতর্কতার সাথে, কূটনৈতিক

কৌশলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, আমার বিশ্বাস তিনি আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন।'

'আপনি বলতে চাইছেন...'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'বলতে চাইছি, চন্দন, আমাদের এজেন্টকে খুঁজে পাবার কাজে তিনি হয়তো আমাদেরকে সাহায্য করবেন–যদি আমাদের প্রেসিডেন্ট তাঁকে অনুরোধ করেন।'

'মাফ করবেন, সোহেল ভাই। আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে।' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে চন্দনের। 'আপনি কি সত্যি...?'

'সত্যি। রানার জন্যে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট কেন, ঈশ্বরের কাছেও সাহায্য চাইব আমরা। মানুষ চিনতে আমার যদি মারাত্মক ভুল না হয়ে থাকে, ধরে নাও তাঁর সাহায্য আমরা পেয়ে গেছি।'

এক সেকেন্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করল অফিস কামরায়।

তারপর সোহেল বলল, 'বসে আছ কি মনে করে? জেনেভার লাইন দাও, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কথা বলতে হবে না আমাকে?'

ফোনে আলাপ করার পর আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল সোহেল। 'আশা করি, বারো ঘণ্টার মধ্যে জানতে পারব কি ঘটেছে।'

'সোহেল ভাই, আপনি তখন বললেন...'

'হ্যাঁ, বলো,' চন্দনকে উৎসাহ দিল সোহেল।

'আপনি বললেন, এই মিশনে মাসুদ ভাইয়ের তৎপরতা কে.জি.বি. আর সি.আই.এ-র বিরুদ্ধে। কে.জি.বি. জড়িত, সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সি.আই.এ-র নাম শুনলেও, এখন পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব কোথাও দেখা যাচ্ছে না...'

‘কে বলল তোমাকে? সি.আই.এ. তো প্রথম থেকেই রানার পেছনে লেগে আছে।’

‘প্রথম থেকে লেগে আছে?’ চন্দন হতবাক। ‘বলেন কি! মাসুদ ভাই তা জানেন?’

‘কেউ ওকে বলে দেয়নি, তবে আমার ধারণা, সন্দেহ করেছে ও।’

‘কারা তারা…কোথায়?’

আবার সেই সদয় হাসি ফুটল সোহেলের ঠোঁটে। কথা বলল না।

দশ

অবচেতন মনে বিপদের আভাস পেয়ে সজাগ হলো রানা।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে ওর। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ধুলোবালি আর ঘামে নোংরা হয়ে আছে কাপড়-চোপড়। শরীরটা দুর্বল ও ক্লান্ত।

চড়ুইপাখিদের কিচিরমিচির থেমে গেছে। এক চুল নড়ল না রানা।

কে.জি.বি. এজেন্টদের আসতে দেখে মরুভূমির দিকে রওনা হয়েছিল ও, এগোচ্ছিল দক্ষিণ মুখো হয়ে, জানা ছিল মিষ্টি পানির

যে খালটা কায়রো আর ইসমাইলিয়াকে যুক্ত করেছে সেটা ওদিকেই। কিন্তু খানিক দূর এগিয়ে দিক বদল করে ও, বুঝতে পারে ওর খোঁজে সুইটওয়াটার ক্যানেল-এর দিকেই যাবে প্রতিপক্ষরা। যদিও, দিক পরিবর্তন করায় কোন লাভ হয়নি। কে.জি.বি. এখনও ওর পিছন পিছন আসছে।

আজ তিন দিন হলো দূর ব্যবধানে ছাড়ানো নিঃসঙ্গ খেজুর গাছের নিচে বা মরুদ্যানের শুকনো ঝোপের পাশে নোংরা পানির কিনারায় লুকিয়ে আছে ও। উজিটা নেই। ভোঁতা নাক .৩৮টা আছে বটে, কিন্তু কার্ট্রিজের সংখ্যা মাত্র চার।

এই মুহূর্তে এল কোয়ানতারার কয়েক মাইল উত্তরে গোটাকতক খেজুর গাছের আড়ালে শুয়ে রয়েছে রানা, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুইটওয়াটার ক্যানেল-এর একটা শীর্ণকায় শাখা। শীর্ণ হলেও, পানির এই ক্ষীণ ধারাটা মরুভূমির মাঝখানে এক সারিতে বেশ কিছু সবুজ গাছপালার জন্ম দিয়েছে।

রানার আশা ছিল, এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবে, তারপর পায়ে হেঁটে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে পোর্ট সাঈদে। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে বাংলাদেশ কনসুলেটে আশ্রয় নেয়া কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু নিজের অজান্তেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে অমূল্য কিছু সময়। মাঝখানের দূরত্ব পেরিয়ে সম্ভবত কাছে চলে এসেছে প্রতিপক্ষরা।

গাছগুলোর শাখা বালি ছুঁয়ে আছে, পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রানা। খামসিন বাতাস নিস্তেজ হয়ে গেলেও, শেষ বিকেলের আকাশে সবুজাভ একটা ধুলোর ভাব রয়ে গেছে এখনও। তাপমাত্রা সহ্যক্ষমতার কাছাকাছি নেমে এসেছে। অনুভব করল, ঘাম আর ধুলোবালি শুকিয়ে গিয়ে প্রতিটি লোমকূপের মুখ বন্ধ

করে দিচ্ছে।

কোথায় কি যেন একটা গোলমাল আছে।

জায়গাটা ছেড়ে সরে যাবার একটা তাগাদা অনুভব করল রানা, অথচ বিপদটা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। ধীরে ধীরে বসল ও, দাঁড়াল না, ঝোপের আড়াল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। মরুদ্যানের উল্টো দিকে তিন পাতা বিশিষ্ট সবুজ লতাগাছ জন্মেছে, গরু-ছাগলের খোরাক। চকলেট রঙের মাটিতে উজ্জ্বল লাগছে খেতটা, গ্রামের বাসিন্দারা অনেক পরিশ্রম করে শাখা খাল থেকে পানি এনে ঢেলেছে খেতে। খেতের কিনারা ঘেঁষে আসছে কে.জি.বি-র দলটা, একজোট হয়ে, গম্ভীর আর মারমুখো।

রানার পায়ের চিহ্ন ধরে আসছে ওরা, সেই রেইলরোড কালভার্ট থেকে। ওখানেই ওদেরকে ফাঁকি দিয়েছিল রানা। ওদিকে একটা পানি সেচা ডোবা আছে। পদচিহ্ন অনুসরণে দক্ষ লোক ওরা, সেই সাথে জেদি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কষ্ট আর সময় যা-ই লাগুক, রানার নাগাল পেতেই হবে ওদেরকে। একজনের কাঁধ থেকে একটা ওয়াকি-টকি ঝুলতে দেখল রানা, ছোট্ট অ্যান্টেনাটা হাঁটার সাথে দুলছে। রানার সন্দেহ, একাধিক পার্টি ওর পিছু নিয়েছে, তবে একটার সাথে আরেকটাকে আলাদা করা অসম্ভব, কাঠামো আর কাপড়চোপড় সবারই একরকম। ইতিমধ্যে জেনেছে ও, পিস্তলগুলো ওরা বেল্টের তলায় রাখে, শার্টের নিচে। পিস্তল হোক আর ছুরি, মৃত্যুটা যন্ত্রণাদায়ক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রানা জানে, প্রথমে আহত করা হবে ওকে, মরণ আঘাতটা হানা হবে কথা আদায় করার পর। যতক্ষণ তারা ওকে মরুভূমি আর নগণ্য ছোটখাট গ্রামের মধ্যে আটকে রাখতে পারছে, ওকে মারার জন্যে কামান দাগলেও কর্তৃপক্ষের কানে খবরটা পৌঁছুবে না।

একটাই সান্ত্বনা রানার, জর্জ আর মিলি নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে গেছে নিকোলাই প্যাসিমভকে। কে.জি.বি. এজেন্টদের ওপর তার ব্যাপারে কি নির্দেশ আছে জানার কোন উপায় নেই, দৃশ্যপট থেকে প্যাসিমভ উধাও হওয়ায় ভালই হয়েছে। লোকচক্ষুর আড়ালে প্যাসিমভকে ধরতে পারলে কি করত তারা বলা যায় না। সময় ও সুযোগ মত তাকে যে-কোন রুশ দূতাবাসে পৌঁছে দেয়া যাবে, রিপোর্টারদের চোখের সামনে। যে নির্দেশই দেয়া থাকুক, কে.জি.বি. এজেন্টরা তখন অন্তত প্যাসিমভের অপূরণীয় কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ঝোপের আড়াল নিয়ে পিছিয়ে এল রানা, সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে, সচেতন, প্রতি মুহূর্তে কাছে চলে আসছে প্রতিপক্ষ। গানের তালে তালে একদল মিশরীয় কৃষক কচুরিপানা আর জলজ আগাছা ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছে, ছোট্ট ডোবাটার দু'দিকে নিজেদের কাজে ব্যস্ত তারা। কারও পরনে ঢোলা গালাবিয়া, আলখেল্লার মত দেখতে, মাথায় খুলি কামড়ে থাকা ক্যাপ। যারা পানিতে নেমেছে তাদের পরনে আন্ডারঅয়্যার আর হাতকাটা গেঞ্জি। ডোবা থেকে তোলা কচুরিপানা একটা গাধাটানা গাড়িতে জড়ো করছে তারা।

ডোবার কিনারায় জড়ো করা ওদের একটা আলখেল্লা পেলে হত, ভাবল রানা। হাত আর মুখ থেকে মাছি তাড়াল ও। লোকগুলোর চোখে ধরা না দিয়ে জিনিসটা পাবার কোন উপায় নেই।

কৃষকদের সামনে এক লোক বিশাল এক মোষের পিঠে বেত মারছে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে ঘুরছে একটা ওয়াটার হুইল। আরও সামনে দেখা গেল মাটির কয়েকটা ঘর, বড়সড় ইরিগেশন ডিচের

দু’ধারে। পরিখার ঘোলা পানিতে সাঁতার কাটছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা, পানির ওপর গলা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা ষাঁড়, কিনারায় পানি খাচ্ছে পাঁচ-সাতটা উট আর ভেড়া। কালো বোরখা পরা দুই গ্রাম্যবধূ একটা সরু গলির মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, দূরে দাঁড়িয়ে আরেকজন মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে। তিনজনের মাথাতেই পানি ভর্তি কলস। এক পাশে, খানিকটা দূরে, খেজুর গাছের নিচে একটা পাইপের খোলা মুখের সামনে ভিড় জমিয়েছে গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা, যে যার কলসে পানি ভরছে। পরনে ডোরা কাটা পা’জামা, সাদা বিড়ালছানা নিয়ে খেলছে এক ছেলে।

গোটা এলাকা শান্ত। আপাতত।

.৩৮টা হোলস্টার থেকে বের করল রানা। ঠিক এই সময় শুকনো একটা ডালে পা পড়ায় মট করে শব্দ হলো। ঝট্ করে পিছন দিকে ঘাড় ফেরাল ও। কে.জি.বি. এজেন্টরা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়েছে, যদিও এখনও তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ও। পিস্তল ধরা হাতের তালু ঘামে পিচ্ছিল হয়ে আছে। খালি হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ থেকে ঘাম মুছল ও।

দেরি করার কোন মানে হয় না, ভাবল রানা। ছুটে পালাতে হবে ওকে। ঝোপ আর খেজুর গাছের আড়াল বেশ কিছুক্ষণ লুকিয়ে রাখবে ওকে, এর বেশি কিছু আশা করার নেই।

ছোট্ট মরুদ্যানটার আকৃতি ঠিক একটা চোখের মত। রানা সিদ্ধান্ত নিল চোখটার অর্থাৎ গ্রামটার কাছাকাছি একটা কোণ থেকে দৌড় শুরু করলে কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। ঝোপবহুল কিনারা থেকে বেরিয়ে এল রানা, শিরদাঁড়া বাঁকা করে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখল মাথাটা, বালির ওপর আঁকাবাঁকা সরু

একটা পথ ধরে ছুটল। স্বাভাবিক ও শান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে ও। নেমিসিসে দেখে আসা লাশগুলোর কথা মনে করল একবার, যে-কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে শক্ত করল পেশী। কে.জি.বি. এজেন্টরা কঠিন পাত্র, এরইমধ্যে সমূলে বাধা উৎপাটন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তারা। পথের বালি ওর পায়ের চারপাশে আলোড়িত হলো, ঢুকে গেল জুতোর ভেতর। সবুজ খেতে শেষবেলার রোদ গড়াগড়ি খাচ্ছে।

প্রতিপক্ষ মাথাচাড়া দিল শুকনো ঘাসের স্তূপ থেকে, রানার নাক বরাবর সামনে। ঠিক যেন একটা স্ক্রীনে অকস্মাৎ ফুটে উঠল ছবি।

লোকটা খাটো, বেশিরভাগ মাংস যেন জড়ো হয়ে আছে কাঁধ আর বুকে। সারা মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, ভুরু জোড়া লালচে। রানাকে দেখে তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল বাইরে। তাজ্জব বনে গেছে।

রানার একটা কাঁধ ধাক্কা দিল তাকে, ঘুরে গেল লোকটা, পড়ে যাবার সময় খামচে ধরল রানাকে।

একসাথে পড়ল ওরা, একজনের ওপর আরেকজন। উত্তপ্ত ধুলো আর শুকনো ঘাসের ওপর শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি, আঁচড়াআঁচড়ি, ঘুসোঘুসি।

প্রথমে লোকটার ওপর পড়ল রানা, কিন্তু ওর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী সে, জোরে শ্বাস টেনে বুকটা এমনভাবে ঝাঁকাল, ছিটকে পড়ল রানা। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হবার সময় তার কণ্ঠনালীতে শক্ত একটা ঘুসি মারল ও, লাগল না, অনুভব করল ইস্পাত কঠিন একটা মুঠো ধাক্কা খেলো ওর কপালে। চোখের পিছনে আগুনে ফুলকি ভাসতে দেখল রানা, মাটির সাথে সজোরে

বাড়ি খেলো পিঠ। গড়াগড়ি খেলো ওরা, হিসহিস করে দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস ছাড়ল, গোঙাল, অবশেষে রানার বুকের ওপর উঠে বসল প্রতিপক্ষ।

তার নাকের ডগা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। ব্যথায় ও রাগে ফোঁপাচ্ছে সে। দু'হাতের আঙুল রানার গলার নরম মাংসে সেঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, ইচ্ছা, ওর কণ্ঠনালীটা ছিঁড়ে আনবে। চোখে রক্তলাল উল্লাস দেখা গেল।

তার হাত সরাবার কোন চেষ্টা না করে, যতটা সম্ভব চিবুক নামিয়ে গলাটাকে বাঁচাতে চাইল রানা, একই সাথে হাতের তালু দিয়ে চাপ দিল ঘাম আর রক্তে ভেজা প্রতিপক্ষের মুখে, নাকে আর চোখে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল লোকটার মুখ, রানার তালুর পাশ দিয়ে তার রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মর ব্যাটা! মর, মর শালা!'

লোকটার ঘাড়ে অপর হাতের দুটো আঙুল ঢোকাল রানা, উঁচু করা চোয়ালের নিচের কোণে, ব্রেনে উঠে যাওয়া রক্তপ্রবাহে চাপ পড়ল। ওদিকে রানার গলায় লোকটার আঙুলগুলো ঢুকছে তো ঢুকছেই, চামড়া ওঠা মাংসে হুহু করে জ্বালা ধরে গেল। প্রতিপক্ষকে চিনতে ভুল করেনি রানা, লোকটা অতিরিক্ত উৎসাহী। বোধহয় সেজন্যেই সাহায্যের জন্যে কাউকে ডাকেনি সে। কোনমতে রানাকে ছাড়তে রাজি নয় সে, যদিও তার মাথা ঘুরছে ও ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো।

আচমকা একটা লাথি মেরে লোকটাকে একপাশে সরিয়ে দিল রানা, হাতের মুঠোয় খপ্ করে এক গোছা চুল ধরল, মাথাটা ঠুকে দিল মাটির সাথে। তার চুল না ছেড়ে, শুয়ে পড়ল রানা, বুঝতে পারল আচ্ছন্ন বোধ করছে প্রতিপক্ষ। হাঁটু ভাঁজ করল ও, সিধে

করল লোকটার ঘাড় লক্ষ্য করে। অপর পা-টা উন্মুক্ত গলার দিকে বাড়াল। দুই গোড়ালি এক করায় কাঁচির আকৃতি পেল পা জোড়া, মাঝখানে আটকে আছে প্রতিপক্ষের গলা। ধীরে ধীরে চাপ বাড়াল রানা। জানে, এভাবেই লোকটাকে বেহুঁশ করতে হবে। সামনাসামনি মারপিট করে পারা যাবে না।

দ্রুত, খসখসে আওয়াজ পেল রানা পিছন থেকে, তারপরই কর্কশ একটা গলা। 'ছাড়ো ওকে। তা না হলে মরবে।' স্লাভিক উচ্চারণ, ভাষাটা ইংরেজি।

হতাশায় দুর্বল বোধ করল রানা, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড রাগ হলো নিজের ওপর। পায়ের পেশীতে ঢিল দিয়ে লোকটাকে ছেড়ে দিল ও, মাথা ঘোরাল নবাগতকে দেখার জন্যে।

ওর দু'চোখের মাঝখানে কপালের ওপর লাগল বুটের লাথিটা।

নড়ল না, স্থির পড়ে থাকল রানা। মাথাটা দপ দপ করছে, ছুটোছুটি না করে শুয়ে থাকতে পারায় ভাল লাগছে ওর। তারপর যখন চোখ মেলল, সব কিছু হলুদ, সবুজ আর ঝাপসা লাগল। সময় বয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে দৃষ্টি। রাশিয়ানদের যেন কোন তাড়া নেই, যথেষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিল তারা।

ওদের লীডার, লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি, লম্বাটে মুখের অধিকারী, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে চামড়া, সব মিলিয়ে একজন পরিশ্রমী চাষীর চেহারা। মুখের হাড় বেরিয়ে আছে, চোখের নিচে কালি, দেখে মনে হলো লড়াই শেষ হওয়ায় খুশি হয়েছে সে। অজ্ঞান লোকটাকে অভিশাপ দিল লেফটেন্যান্ট, গাধা বলে গাল দিল, দু'জন লোককে ডেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার

নির্দেশ দিল। তারপর ওয়াকিটকির সুইচ অন করে রানার ধরা পড়ার খবরটা রিপোর্ট করল সে।

সূর্য দিগন্তরেখা ছোঁবে, এই সময় খেজুর বাগান থেকে রানাকে নিয়ে বেরুল দলটা। বাতাসে মশলার গন্ধ পেল রানা, গ্রামের দিক থেকে ভেসে আসছে। সামনের প্রসারিত মাঠ, সোনালি রঙ নিয়ে মরুভূমির একটা উত্থান বা বালিয়াড়িতে গিয়ে মিশেছে। মাটির তৈরি গ্রামের ঘরগুলো থেকে ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের কল-কাকলি, আরবী বর্ণমালার সচিৎকার উচ্চারণ, নারীকণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন। সমতল ছাদসহ বাড়িগুলোর সামনে কাউকে দেখা গেল না, কোন বাধা না পেয়ে নিঃশব্দে কাছে চলে এল দলটা।

গ্রামের ভেতর একটাই সরু গলি।

গলিটার শেষ মাথা থেকে ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর।

একটা দরজার সামনে থামল লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি, তার আগে সবাই তারা যার যার অস্ত্র লুকিয়ে ফেলেছে। কাঠের দরজায় টোকা দিল সে। ঘরের ভেতর রেডিওতে বেহালা বাজছে, সুরটা করুণ।

কেউ সাড়া দিল না দেখে দরজার গায়ে চাপ দিল জাগোরস্কি, চৌকাঠের সাথে চামড়া দিয়ে বাঁধা কবাট ধীরে ধীরে খুলে গেল। সাবধানে ভেতরে পা রাখল সে, বাকি দু'জনকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করল। তাদের একজন ধাক্কা দিয়ে প্রায় অন্ধকার ঘরের ভেতর ঠেলে দিল রানাকে।

ছোট্ট একটা কামরায় রয়েছে ওরা, ঘর না বলে জায়গাটাকে ঘেরা বারান্দা বলাই ভাল। সামনে একটা উঠন, ছাগল আর মোরগের ডাকের সাথে বেহালার আওয়াজটা ওদিক থেকেই আসছে। উঠনের দু'দিকে পাশাপাশি কয়েকটা ঘরের দরজা দেখা

গেল, পিছন দিকে মাটি দিয়ে প্লাস্টার করা একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদে। মুরগীর খুপরি, চুলো, ছাগলের ঘর আর পারিবারিক ল্যাট্রিন, সব পাশাপাশি। চুলোয় আগুন জ্বলছে, পোড়া রুটির গন্ধ ভেসে এল। চুলোর সামনে বসে রয়েছে আলখেল্লা পরা দু'জন মহিলা, সম্ভবত মা আর মেয়ে।

'ওদিকে আমি যাব না,' বলল রানা।

খেঁকিয়ে উঠল জাগোরস্কি। 'যাবে না!'

'ওরা পর্দা মেনে চলে,' বলল রানা। 'অচেনা পুরুষের সামনে বেরোয় না। সাড়া না দিয়ে ভেতরে ঢুকলে গ্রামের পুরুষরা লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে আসবে।'

'সে-সব আমরা সামলাব,' বলল জাগোরস্কি।

'ঠিক আছে, আগে তুমি যাও।'

এক সেকেন্ড রানাকে দেখল জাগোরস্কি, তারপর সামনে বাড়ল সে, তার পিছু নিল সঙ্গী দু'জন, তাদের মাঝখানে থাকল রানা। ডোরা কাটা পা'জামা পরা এক লোক খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা পায়রার গায়ে হাত বুলাচ্ছে, তার দৃষ্টি এখনও ওদের ওপর পড়েনি।

'ওহে, শুনছ, এই যে এদিকে!' রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে আরবী ভাষায় ডাকল জাগোরস্কি।

মহিলা দু'জন আঁতকে উঠল, ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল ওদের দিকে। সটান উঠে দাঁড়িয়ে মুখে কাপড় চাপা দিল তারা। হাতের পায়রাটা বাতাসে ছুঁড়ে দিল লোকটা। তার বুক ভেতর দিকে দেবে আছে, মুখে প্রায় কোন মাংস নেই, হাড় বেরিয়ে আছে কপালের। বয়স আন্দাজ করা অসম্ভব, পঁয়ত্রিশও হতে পারে, আবার পঞ্চান্ন হওয়াও বিচিত্র নয়। 'আমার বাড়িতে কি করছ

তোমরা?' কর্কশসুরে খেঁকিয়ে উঠল সে, লম্বা হলদেটে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। 'বেরোও!'

'তোমার বাড়িটা আমরা কিছু সময়ের জন্যে ভাড়া নিতে চাই।'

ধমক দিল মিশরীয় কৃষক, ত্রস্ত পায়ে ছুটে পালাল মহিলারা। 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ তোমরা? কি বললাম শোনোনি? আমার বাড়িতে বিদেশী কুকুর! এত সাহস তোমাদের, মুসলমান বাড়ির বউ-ঝির পর্দা নষ্ট করো!'

'এই নাও,' পকেট থেকে একমুঠো পিয়াসতার নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল জাগোরস্কি। 'তোমার বাড়িটা ব্যবহার করার জন্যে আমি টাকা দিচ্ছি।'

জাগোরস্কির হাতে থাবা মারল লোকটা, ভেজা ভেজা ছাগল লাদায় ভরা উঠনে ছড়িয়ে পড়ল নোটগুলো। লোকটার ক্রোধ আর লাফালাফি লক্ষ্য করে হতভম্ব হয়ে গেল জাগোরস্কি। তীরের মত ছুটে গিয়ে উঠনের কোণ থেকে একটা ভাঙা ডাল তুলে নিল লোকটা, সেটা মাথার ওপর বন বন করে ঘোরাতে শুরু করে দলটার কাছাকাছি ফিরে এল সে। রাগে ফুঁসছে, চিৎকার করছে, যদিও তার একটা কথাও বোঝা গেল না। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সঙ্গীদের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। কাঁধ ঝাঁকাল তারা, অপ্রতিভ চেহারা।

'তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম,' বলল রানা। 'ওরা মুসলমান, ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করে। পরিবারের মেয়েদেরকে আমরা দেখে ফেলায় মাথায় রক্ত উঠে গেছে ওর। ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এ এ-সব তোমাকে শেখানো হয়নি?'

ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি নিয়ে জাগোরস্কি বলল, 'তুমি চুপ

করো! এ-ধরনের পরিস্থিতি কিভাবে সামলাতে হয় আমার জানা আছে।'

'কিভাবে সামলাতে হয়?'

'এভাবে,' বলেই শার্টের ভেতর থেকে নাইন এমএম. ম্যাকারভ পিস্তল বের করল জাগোরস্কি। 'বেরোও!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'বাড়ি থেকে সবাই তোমরা বেরিয়ে যাও! বেশ্যাগুলোকে নিয়ে দূর হও চোখের সামনে থেকে! পর্দা, মুসলিম নারী—ছোহ্!'

'মুখ সামলে কথা বলো।'

কিন্তু রানাকে গ্রাহ্যই করল না জাগোরস্কি।

তার হাতে পিস্তল দেখে পিছিয়ে গেল কৃষক লোকটা, কিন্তু চোখ দুটো দু'টুকরো অঙ্গারের মত জ্বলতে লাগল। বাড়ির মেয়েদের ডাকল সে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দরজা টপকে বেরিয়ে এল তারা, হন হন করে পাশ কাটাল ওদেরকে, তাদের পিছু পিছু ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে গেল বাড়ির কর্তা।

'কাজটা তুমি ভাল করলে না,' গম্ভীরমুখে বলল রানা।

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরেই সরাসরি ওর মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল জাগোরস্কি, পিস্তল ধরা হাতটা একটু একটু কাঁপছে। একটা ঢোক গিলল রানা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল জাগোরস্কি, চট করে রাস্তার দিকের বারান্দাটার দিকে তাকাল একবার, তারপর রানাকে বলল, 'হাত দুটো মাথার পিছনে তোলো, তারপর বসো ওখানে।'

নির্দেশ পালন করল রানা। আশা ও আশঙ্কায় দুলছে ওর মন। জাগোরস্কি বোকামি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তার বোকামিটা ওর জন্যে শুভ হয়ে দেখা দিতে পারে। কৃষক লোকটা এই অপমান সহ্য করবে বলে মনে হয় না, তার সাহায্যে

গ্রামবাসীরাও সদলবলে এগিয়ে আসবে। তারমানে কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। জাগোরস্কি নির্বিচারে খুন করবে। গ্রামবাসীরা সংখ্যায় বেশি, কাজেই শেষ পর্যন্ত জিতবে তারাই, ধরে নেয়া চলে। প্রশ্ন হলো, নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলে ওকে তারা রেহাই দেবে কিনা।

রুটির পোড়া গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস, তার সাথে মিশে আছে বিভিন্ন দুর্গন্ধ। সন্ধ্যা নামছে মরুভূমিতে, চুলোর আগুন কাঁপা কাঁপা ছায়া ফেলছে উঠনের কিনারায়।

জাগোরস্কির সঙ্গী দু'জন ঘরগুলোর ভেতর উঁকি দিয়ে ফিরে এল উঠনে। একধারে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি যেন আলাপ করছে তারা। নোংরা উঠনে পায়চারি শুরু করল জাগোরস্কি। এক সময় হাঁক ছেড়ে হ্যারিকেন জ্বালার নির্দেশ দিল সে।

তার একজন লোক হ্যারিকেন জ্বালল, অপরজন অন করল রেডিওটা।

কান পাতল রানা। গোটা গ্রাম হঠাৎ করে যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। জাগোরস্কির দিকে তাকাল ও। এখনও পায়চারি করছে সে, যদিও চেহারায় কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। হাঁটাহাঁটি করছে বটে, কিন্তু কড়া নজর রেখেছে রানার ওপর। তার সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা। আবার নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলছে তারা। কারও মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই।

তারমানে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে ওরা।

কি ঘটতে পারে? ভাবল রানা। কেউ আসবে? তারপর ওর মনে পড়ল, একাধিক পার্টি পিছু নিয়েছিল ওর। অজ্ঞান লোকটাকে কোথাও সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। উঠনে সেই একই দৃশ্য, কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই সময় আওয়াজটা পাওয়া গেল।

'হো হো। কমরেড রানা! সত্যি তুমি নাকি?'

বারান্দার দরজা জুড়ে প্রকাণ্ডদেহী কর্নেল ভ্লাদিমির রুস্তমভকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা।

এগারো

'দাঁড়াও, বন্ধু,' কর্নেল রুস্তমভ বলল রানাকে। 'উঠে দাঁড়াও।'

'তোমাকে আগেও বলেছি, আমরা বন্ধু নই।'

'একি অবস্থা হয়েছে তোমার! আমার লোকেরা…এক্কেবারে অগা! ওরা কি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে? স্রেফ ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার, কমরেড রানা।' সাইবেরিয়ান চোখের তির্যক দৃষ্টি ফেলে রানাকে সিধে হতে দেখল সে।

পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেছে রানার, সারা শরীরে ব্যথা ও অবসাদ। দৃষ্টি ঝাপসা লাগায় মাথাটা একবার ঝাঁকাল ও।

নিঃশব্দে হাসল রুস্তমভ। 'সাংঘাতিক দৌড় খাটিয়েছ তুমি আমাদের, এ-টুকু প্রশংসা করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত হার হয়েছে তোমার। এখন?'

‘এখন কি?’

‘তিনি কোথায়, নিকোলাই প্যাসিমভ?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘জানি না।’ বাম হাঁটুর পিছনে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ব্যথা পেল ও, ভাঁজ হয়ে গেল পা, নোংরা মাটিতে আছাড় খেলো। কিডনির কাছে আবার লাথি খেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল গোটা শরীর। পড়ে থাকল রানা, বাতাসের জন্যে হাঁপাচ্ছে, অপেক্ষা করছে পরবর্তী আঘাতের জন্যে। নিজের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করছে রুস্তমভ, গাল পাড়ছে, অভিশাপ দিচ্ছে, তারা যেন নতুন রিক্রুট। তারপর তার মস্ত থাবার স্পর্শ পেল রানা। ‘কিছু মনে কোরো না, দোস্ত। নাও, হাতটা ধরে উঠে পড়ো। আবার দাঁড়াও।’

দুর্বল, উঠতে ইচ্ছে করল না রানার, তবু শুধু আত্মসম্মান রক্ষার খাতিরে কোন রকমে সিধে হলো ও। ঠাণ্ডা চোখে সারাক্ষণ নজর রাখল ওর ওপর কর্নেল রুস্তমভ, চেহারায় নির্লিপ্ত কাঠিন্য, সাইবেরিয়ান বরফের মত। গ্রীক মার্চেন্ট মেরিন অফিসারের ইউনিফর্মে ঢাকা বিশাল কাঠামোর সাথে সার্কাসের বিকট ভল্লুকের মিল রয়েছে। বোতাম খোলা টিউনিকের নিচে ঘামে ভেজা গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। লোকটা কি রকম বিপজ্জনক, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার দরকার নেই রানার। কে.জি.বি-রই অনেক অফিসারের জন্যে একটা আতঙ্ক সে, স্যাডিস্ট এবং প্রতিশোধপরায়ণ চরিত্র। মরক্কো, জাপান আর শ্রীলংকায় ওদের দেখা হয়েছিল, সে-সব তিক্ত স্মৃতি আজও ঘায়ের মত দগদগ করছে রানার মনে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, প্রতিবারই রানাকে ক্লান্ত আর অসহায় অবস্থায় পেয়েছে কর্নেল রুস্তমভ। প্রতিবারই কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে রানা, নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে

করেছে।

এবারও ঠিক তাই ঘটছে, ক্লান্ত আর অসহায় বোধ করছে রানা। কিন্তু এবার কি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে ও?

আশার কোন আলো দেখতে পেল না রানা।

'তুমি সুস্থবোধ করছ তো, রানা?' কণ্ঠে উদ্বেগ নিয়ে কথা বলছে কর্নেল। 'আমার লোকেরা ভয়ানক রেগে আছে, তোমাকে খুন করার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কি বলছি বুঝতে পারছ তো, কমরেড রানা?'

'পারছি,' বলল রানা, বেসুরো গলায়।

'তাহলে প্লিজ...,' প্রকাণ্ড বুকে সশব্দে বাতাস ভরে নিল কর্নেল, '...তোমাকে আমার জেরা করতে হবে। তুমি স্বেচ্ছায় কথা বলবে এ আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু ব্যাপারটা যেহেতু অত্যন্ত সিরিয়াস...'

'তাছাড়া, নেকড়েগুলোকে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তা-ও তুমি জানো না, তাই না? ওরা ধৈর্য হারিয়ে আমার ঘাড় মটকালে তোমাকে দায়ী করা যাবে না।'

'হো হো! ঠিক তাই, বন্ধু!' হাসির সাথে কর্নেলের প্রকাণ্ড মুখে চর্বি আর মাংসের ভাঁজ পড়ল। 'তুমি তাহলে সহযোগিতা করবে?'

'আমি তোমাকে বলেছি...'

'প্লিজ, কমরেড কর্নেল,' লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি আবেদন জানাল। 'ওকে আমার হাতে তুলে দিন। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, গ্রামোফোন রেকর্ডের মত গান গাইবে ও, সব প্রশ্নের উত্তরই আপনি পেয়ে যাবেন। তা যদি না হয়, গুস্তাফ তাতাভস্কির কপালে যা ঘটেছিল ওর কপালেও তাই ঘটবে। আমরা ওর ভাইটাল পার্টসগুলো ছিঁড়ে নেব।'

'চোপ!' গর্জে উঠল কর্নেল। 'বর্বর, অসভ্য কোথাকার! এরকম নিষ্ঠুর হওয়ার কথা তুমি ভাবতে পারলে কি করে? গুস্তাফের পুরুষত্ব কেড়ে নিয়ে রানা যা করেছিল তাকে কি বলা যায়? বর্বরোচিত? পৈশাচিক? মর্মন্তুদ? বীভৎস? আসলে গুস্তাফের ক্ষতিটা ব্যাখ্যা করার মত কোন শব্দ দুনিয়ার কোন অভিধানে নেই। রানা করেছে করেছে, কিন্তু ওর অত বড় ক্ষতি আমরা করতে পারি না।' রানার দিকে ফিরল সে। 'বুঝতেই পারছ, রানা, আমার লোকদের সামলে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমি। ওরা যদি সত্যি সত্যি গুস্তাফের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে...'

'তুমি ওদেরকে বাধা দিতে ব্যর্থ হবে,' বিদ্রূপের সুরে বলল রানা, যদিও ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে ওর। গুস্তাফ তাতাভস্কির কথা ভোলেনি ও, ভোলা সম্ভব নয়।*

'ব্যর্থ হব,' রানার কথার প্রতিধ্বনি তুলল কর্নেল।

'তোমরা যে লোককে চাইছ, তিনি গায়েব হয়ে গেছেন।' রানার মুখের সামনে মুখ বাড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল জাগোরস্কি, 'এ-সবে কাজ হবে না, সাম্রাজ্যবাদীর পা চাটা কুকুর। তুমি যে সি.আই.এ-র চর, এ আমাদের খুব ভাল করেই জানা আছে। যদি নিজের ভাইটাল পার্টগুলোর ওপর দরদ থাকে, সত্যি কথা বলো।' জাগোরস্কিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল কর্নেল। 'রানা, আমি কথা দিয়েছি তোমাকে রক্ষা করব, তুমি যদি মুখ খোলো,' বলল সে, চেহারায় ব্যগ্রতা নিয়ে।

চুপ করে থাকল রানা।

---

* পালাবে কোথায় ১ ও ২ দ্রষ্টব্য।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজের সাথে ঘৃণা আর আক্রোশ প্রকাশ করল জাগোরস্কি। ‘কমরেড কর্নেল, আপনি অনুমতি দিলে ওকে আমরা পোড়াতে পারি। ধীরে ধীরে। প্রথমে একটা আঙুল, তারপর গোটা একটা হাত, এভাবে। কথা না বলে যাবে কোথায়?’

মৃদুকণ্ঠে কর্নেল বলল, ‘পোড়া গন্ধটা আমি আবার সহ্য করতে পারি না। পোড়া গন্ধের একটা খারাপ দিক হলো, ওটা তোমার সাথে থেকে যায়–বিশেষ করে নাকের ভেতর।’ রানার দিকে ফিরে উৎসাহ দিয়ে হাসল সে। ‘এসো, নতুন করে শুরু করি, কেমন? নিকোলাই প্যাসিমভ কোথায় আছেন, প্লিজ?’

‘আমি জানি না,’ বলল রানা, কিডনির ব্যথাটা সম্পর্কে সচেতন ও, কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে সারাক্ষণ। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর।

‘সত্যি কথা বলো, রানা!’ প্রকাণ্ডদেহী সাইবেরিয়ান মিনতি জানাল।

‘সত্যি কথা বলছি, ব্যাপারটা রহস্যময়।’

জাগোরস্কির লাথিটা দেখতে পায়নি রানা, আগের মতই আবার মাটির ওপর ছিটকে পড়ল ও। পরমুহূর্তে শিরদাঁড়াটা যেন গুঁড়িয়ে গেল, বিরতি ছাড়াই অসাড় করে দেয়া আঘাতগুলো ক্ষতবিক্ষত করতে থাকল শরীরটাকে। ভাঁজ করা হাতের নিচে যতটা সম্ভব মাথাটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করল ও। মনে পড়ল, জীবনে কখনও এভাবে পড়ে পড়ে মার খায়নি।

‘যথেষ্ট!’ হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল। ‘থামো এবার!’

কথাগুলো কোন রকমে, অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা। অনুভব করল, কে যেন ওর শার্টের কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, বসার ভঙ্গিতে উঁচু করল ওকে ছাগল-লাদার ওপর।

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কর্নেল, গোলাকার প্রকাণ্ড মুখটা কাছে আনল। অস্পষ্ট, ঝাপসা অবয়বটার দিকে মাথা ঘোরাল রানা, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, বুকের ওপর নেমে এল চিবুক, উপলব্ধি করল কে যেন ওর পিঠের দু'দিকে হাত রাখল।

রুস্তমভ কথা বলল বিষণ্ন সুরে, খেদ প্রকাশ করার ঢঙে, যদিও রানার কানে বিশ্বাস্য ঠেকল না, 'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, গোটা ব্যাপারটা ভুল বোঝাবুঝির পরিণতি মাত্র। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি। নিকোলাই প্যাসিমভ নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তিনি আমাদেরকে পরিষ্কার জানিয়েছেন...'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত নিস্তব্ধতার ভেতর কেটে গেল। চাইলেও একজোড়া শব্দ সাজিয়ে কিছু বলার শক্তি নেই রানার। চোখ বন্ধ রেখে নিরেট কিছু ধরার জন্যে হাতড়াতে ইচ্ছে করল ওর, যেন তলিয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। নাকে রক্তের গন্ধ পেল।

'কি ওটা?'

রুস্তমভের কণ্ঠে তীক্ষ্ণ সতর্কতার রেশ, ধরতে পারল রানা। চোখ মেলে ওপর দিকে তাকাল ও, দেখল শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল, মাথাটা একদিকে সামান্য কাত করা। কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে।

কান পাতল রানাও।

এক মুহূর্ত পর শুনতে পেল ও। অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠের গুঞ্জন, দূর থেকে ভেসে আসছে। সম্ভবত গ্রামের সরু পথটা থেকে।

তাড়াতাড়ি রানার দিকে ফিরল কর্নেল। 'আবার চেষ্টা করো, বন্ধু। প্রশ্নটা কি তুমি জানো।'

গ্রামবাসীদের উত্তেজিত গুঞ্জন নতুন শক্তি এনে দিয়েছে রানাকে। 'দেখে কি মনে হচ্ছে তোমার? প্যাসিমভ আমার কাছে আছেন? কোন্ পকেটে?'

'স্বইচ্ছায় জাহাজ থেকে তিনি কোথাও যাবেন না। তুমি নিশ্চয়ই কোথাও তাঁকে বন্দী করে রেখেছ।'

'রাশিয়া থেকে তো নিজের ইচ্ছাতেই বেরিয়ে এলেন,' জবাব দিল রানা।

'তোমার সাথে আরেকজন লোক ছিল, তাই না? প্যাসিমভ কি তার কাছে আছে?'

জাগোরস্কি হঠাৎ অস্থির গলায় বলল, 'গ্রামবাসীরা এদিকেই আসছে, কমরেড কর্নেল!'

ঘেরা বারান্দার দিকে ঝট্ করে তাকাল রুস্তমভ। 'দরজাটা বন্ধ করে দাও,' নির্দেশ দিল সে।

'লোকটার ওপর আপনি আমাকে ছুরি চালাবার অনুমতি দিন, প্লিজ...'

দ্রুত কথা বলল রুস্তমভ, 'চুপ করো! দরজাটা বন্ধ করো, যাও।' রানার দিকে ফিরল সে। 'কোথায় তারা, রানা, তোমার সঙ্গীরা আর নিকোলাই প্যাসিমভ? হাতে বেশি সময় নেই, বুঝতেই পারছ।'

'আমার বিশ্বাস, নাগালের বাইরে চলে গেছে।'

'আমাদের হাতও খুব লম্বা, রানা। কোথায়? নাকি তুমি চাও, আমার লোকদের ঠেকাতে আমি ব্যর্থ হই?'

রানা উপলব্ধি করতে পারছে, কঠিন পরীক্ষা দিতে হচ্ছে ওকে। কে.জি.বি-র ইন্টারোগেশনের মুখে অটল থাকতে হবে, মুখ খোলা চলবে না। শেষ পর্যন্ত কি সফল হবে ও? সহ্য করতে

পারবে ওদের টরচার? মুখ খোলা মানে পরাজয়, মরে যাওয়াও তাই। ঠোঁট মুছল ও, হাতের উল্টোপিঠে সরু রক্তের দাগ লাগল।

ফিরে এল জাগোরস্কি। 'জবাব দাও!' শাসাল সে।

রানা নিরুত্তর।

এবারের নির্যাতন কতক্ষণ স্থায়ী হলো বলতে পারবে না ও। প্রথম তিনটে ঘুসি আর লাথি খেয়ে জ্ঞান হারাল। অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করল, লাঠিপেটা করা হচ্ছে শরীরটাকে। বোধ আচ্ছন্ন হলেও, ছুরির ডগা দিয়ে খোঁচা মারার মত ব্যথা অনুভব করল। তারপর বিরতির সময় মনে হলো শূন্যে ভেসে আছে, অন্ধকারটা ঠিক নির্ভেজাল নয়। অস্বস্তিকর আওয়াজগুলো ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর বলে চিনতে পারল। চিৎকার আর গালাগাল ভেসে এল উঠনের সামনেটা থেকে, মাঝখানে পাঁচিল থাকায় ভোঁতা লাগল। কাছ থেকে শোনা গেল রুস্তমভের ভারি গলার কর্তৃত্বসুলভ সুর, 'তাহলে আমরা কেটে পড়ি এসো। কোথায় মিলিত হতে হবে তোমরা জানো...'

মুখের পাশে মাটির স্পর্শ অনুভব করতে পারল রানা, চোখের কোণ দিয়ে তাকাল ও। টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে রুস্তমভ, সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোয় প্রকাণ্ড স্ট্যাচুর মত লাগল তাকে। জাগোরস্কির হাতে একটা ওয়াকি-টকি ধরিয়ে দিল সে। 'ওকে নিয়ে কি করা হবে?' মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে ইঙ্গিত করল জাগোরস্কি।

রাস্তার শোরগোলটা অকস্মাৎ বাড়ল। কাঠের দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে লোকগুলো।

রুস্তমভ বলল, 'ফেলে যাও।'

'আমি প্রতিবাদ করছি, কমরেড কর্নেল। ওকে বাঁচিয়ে রাখা

অপরাধ।' জাগোরস্কির কথায় তর্কের সুর।

গম্ভীর গলায় রুস্তমভ বলল, 'ওদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছ, কি ঘটতে যাচ্ছে? বাড়ির লোকটাকে অপমান করে গোটা গ্রামবাসীকে খেপিয়ে দিয়েছ তুমি। তবে, তোমার এই বোকামির জন্যে এই একবার আমি খুশি হয়েছি। বাইরে ওরা যারা চিৎকার করছে, বুঝতেই পারছ, মাথায় রক্ত চড়ে গেছে ওদের। আমাদের হয়ে কাজটা ওরাই করবে। রানাকে আমরা যদি খুন করি, আর পরে যদি মিশরীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ি, তখন কি হবে?'

দু'জনের মাঝখানে উত্তপ্ত নিস্তব্ধতা নেমে এল।

নড়ল না রানা।

উঠনের বাইরে থেকে গ্রামবাসীদের গর্জন ভেসে আসছে।

'ও আপনার পুরানো বন্ধু, অন্তত খানিকটা দয়া আপনার দেখানো উচিত,' বলল জাগোরস্কি, 'পুরানো বন্ধু' বলার সময় তার সুরে খানিকটা বিদ্রূপ ও অভিযোগের সুর ফুটল। 'আমার ধারণা, ওকে আপনি নিজের হাতে খুন করলে বা ও যদি আপনার চোখের সামনে খুন হয়, ওকে দয়া করার সাথে সাথে খানিকটা সম্মান দেখানোও হবে। উন্মাদ গ্রামবাসীরা ওকে ধরে ছিঁড়ে ফেলবে, টুকরো টুকরো করবে, সেটা ওর জন্যে অপমানজনক নয়?'

'হো হো। তোমাকে আরও অনেক শিখতে হবে, লেফটেন্যান্ট, যদি বাঁচো, যদি এই পেশায় সারভাইভ করো। এখনকার পরিস্থিতি হলো, আমরা নতুন নির্দেশ পেয়েছি, সেটা পালন করার জন্যে তুমি আমার আদেশ মেনে নেবে। সবাইকে নিয়ে চলে যাও—জলদি!'

এবার আর তর্ক করল না জাগোরস্কি। ত্রস্ত পায়ের মৃদু শব্দ

শুনতে পেল রানা, মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে হিংস্র গ্রামবাসীদের শোরগোলের ভেতর চাপা পড়ে গেল সেটা। চোখ তুলে তাকাল রানা।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রুস্তমভ।

ঠোঁট টিপে হাসল সে, তারপর দলটার পিছু নিল।

চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে গেল রুস্তমভ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু রানার মনে হলো তার এই আচরণের পিছনে সঙ্গত একটা কারণ না থেকে পারে না। নিজের হাতে রানাকে খুন করার সুযোগ পেয়েও সেটা হাতছাড়া করার পাত্র কর্নেল রুস্তমভ নয়। গ্রামবাসীরা হয়তো ওকে খুন করবে, কিন্তু নিজের হাতে মারার সন্তুষ্টিই আলাদা, সেটা থেকে রুস্তমভ নিজেকে বঞ্চিত করল কেন?

কারণটা জানা নেই রানার, তবে আন্দাজ করতে পারল।

কে.জি.বি-তে সুস্থমস্তিষ্ক লোকের অভাব নেই, এমনকি রানার অনেক বন্ধু-বান্ধবও আছে, আছে শুভানুধ্যায়ী। তাদের মধ্যে অনেকেই রুস্তমভের চেয়ে বড় পদের অধিকারী। রানা ধারণা করল, রুস্তমভের ওপর কড়া হুকুম আছে, রানাকে খুন করা যাবে না। সম্ভবত এ-ধরনের একটা হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা কর্নেলের নেই। সে জন্যেই রানার মৃত্যুর সাথে সরাসরি নিজেকে জড়াল না সে। কিন্তু লোকটাকে অমন খুশি দেখাল কেন?

দলটা সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির ছাদে উঠে যাচ্ছে, সেদিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। রানার মনটা একাধারে স্বস্তি ও আশংকায় ভারি হয়ে উঠল। কর্নেল রুস্তমভ ওকে একটা সুযোগ দিয়ে গেছে, যতই নগণ্য হোক সেটা। রানার দুর্ভাগ্য বলতে হবে, সুযোগটা গ্রহণ করার শক্তি বা সামর্থ্য

নেই ওর।

রাশিয়ানরা কোন্ দিকে যাচ্ছে? প্রশ্নটা নিয়ে মাত্র এক সেকেন্ড চিন্তা করার অবকাশ পেল রানা। তারপরই শুনতে পেল দরজা ভাঙার আওয়াজ। এতই দুর্বল, দৌড়াবার কথা ভাবা যায় না। তবু চেষ্টা করল রানা। প্রতিবাদ করছে শরীর, নেতিয়ে পড়তে চাইছে। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার নয়। পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছে না। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, সগর্জনে নৃত্যরত কয়েকটা মূর্তি সদ্য বিস্ফোরিত দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে উঠনে ছড়িয়ে পড়ছে। মশাল, টর্চ আর হ্যারিকেনের আলোগুলোকেও নাচানাচি করতে দেখল রানা। মশালের লালচে আলোয় মিশরীয় কৃষকদের চেহারা রক্তস্নাত বলে মনে হলো। কঁক কঁক করতে করতে চারদিকে ছুটোছুটি করছে এক ঝাঁক মুরগী। অকস্মাৎ লোকগুলো যেন ক্রোধে ফেটে পড়ল, দ্বিগুণ হলো তাদের গর্জন, রানাকে দেখে ফেলেছে।

পাথর, লাঠি, থালা-বাসন, হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়ল তারা। ঝাঁকি খেয়ে ডান দিকে সরল রানা, মাথা নিচু করে বাম দিকে ফিরল, কমলা রঙের আলোর ভেতর দিয়ে ছুটে এসে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বৃষ্টির মত পড়ছে ওর গায়ে। গোটা অস্তিত্বে মৃত্যুর ছোঁয়া আর স্বাদ পাচ্ছে ও, তবু থেমে নেই, ছুটছে, প্রতি মুহূর্তে সচেতন হিংস্র জনতা কাছে চলে আসছে।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছুল রানা, এটাই ওর পালাবার একমাত্র পথ, ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। স্যাঁৎ করে এগিয়ে এল একটা হাত, ধাপ থেকে কেড়ে নিল ওর একটা গোড়ালি। এক পায়ে লাফাতে শুরু করল রানা, বন্দী পা-টা ছাড়াবার জন্যে ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ও, কাত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা, চোখের

কোণ দিয়ে দেখতে পেল সিঁড়ির নিচ থেকে অসংখ্য হাত ওপর দিকে উঠে আসছে, হাতগুলোর পিছনে মানুষগুলোর চোখে খুনের নেশা।

তারপর পড়ে গেল রানা। চোখের পলকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। ঘুসি আর লাথি মারছে, আঁচড়াচ্ছে, খামচাচ্ছে, চুল আর হাত-পা ধরে টানছে, যার যেমন সুবিধে।

একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো, ওপরের একটা ধাপ থেকে ধুলো উড়ল।

রানাকে ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো লোকগুলো, ধাপের গায়ে সদ্য তৈরি দাগটার দিকে তাকাল।

'ছেড়ে দাও ওকে!' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল কে যেন।

মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল ভিড়টা। গাল পাড়ছে লোকগুলো, রানার গায়ে থুথু ছিটাল। লম্বা, একহারা এক লোককে দেখতে পেল রানা, খাকি ইউনিফর্ম পরে আছে। চেহারাই বলে দেয় মিশরীয়। তার বেল্টে ছোট একটা লেদার হোলস্টার, ফ্ল্যাপ আর ক্লিপ পকেটসহ। ছোট্ট .৩২ অটোমেটিকটা হাতে।

নার্ভাস ভঙ্গিতে অস্ত্র ধরা হাতটা লম্বা করল সে, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার সাথে আসুন, এফেনডি।'

কি করা উচিত বুঝতে পারল না রানা, তবে জানে আলোচনা করার সময় নয় এটা। কাঁপতে কাঁপতে সিধে হলো ও, মনে হলো পড়ে যাবে, কিন্তু পড়ল না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত টন টন করছে, এখনও ঠিকমত কাজ করছে না মাথা।

কিভাবে হাঁটতে পারল, কিভাবে লোকটার পিছু পিছু বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল, বলতে পারবে না রানা। বাইরে বেরিয়ে একটা ফোক্সওয়াগেন সিডানের দরজা খুলল লোকটা, রানা দেখল

পিছনের সীটে তার একজন সঙ্গী আছে। আশ্চর্য হয়ে গেল রানা, প্রায় একই চেহারা দু'জনের। 'গাড়িতে উঠুন, প্লিজ,' প্রথম লোকটা বলল, ভিড়টার দিকে নজর রাখছে সে, ওদের সাথে সাথে তারাও বেরিয়ে এসেছে। মারমুখো জনতার দিকে হাতের অস্ত্র তুলে গুলি করার হুমকি দিল সে। সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল রানা। পিছনের লোকটা সামনে চলে এল, স্টার্ট দিল গাড়িতে।

ভিড়ের ভেতর উত্তেজনা বাড়ছে। হাত ছুঁড়ে, মুখ ভেঙচে প্রতিবাদ জানাচ্ছে লোকগুলো। গ্রামের ভেতর দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাল ড্রাইভার। ডান দিকে মোড় নিল ওরা, সামনে দেখা গেল লাইটপোস্টের সারি, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, ইন্টারন্যাশনাল রুট ফরটিফোর বরাবর দাঁড়িয়ে আছে।

নার্ভাস বোধ করছে রানা, শরীরের ক্ষতগুলোর কথা প্রায় ভুলেই গেছে। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ও, আরবীতে।

'সেটা নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।'

এক মুহূর্ত কিছু বলল না রানা। সুয়েজ ক্যানেলে জাহাজগুলোর নেভিগেশন লাইট দেখতে পেল ও। এখানে এসে হাইওয়ের সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে খালটা, পুরানো রুট ফোর-এর পাশাপাশি—এই রাস্তারই আরও দক্ষিণে ল্যান্ড করেছিল ওদের জেট। আরও খানিক দূরে একটা রেললাইনও আছে।

কে.জি.বি-র হাত থেকে বেঁচে গেছে ও, মিশরীয় কৃষকদের কাছে থেকে পালাতে পেরেছে, কিন্তু তবু বিপদ এখনও কাটেনি। ওর এখনকার ভয়, উদ্ধারকারীরা ওকে মিশরীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে কিনা। মিশরে ওর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে না রানা। মিশরের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল, ওর

অনধিকার অনুপ্রবেশ গ্রহণযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে সেই সম্পর্কে চিড় ধরবে।

'আপনার উচ্চারণ ভঙ্গি ধরতে পারছি না,' ড্রাইভার বলল। 'আপনি কোন্ দেশের লোক, প্লিজ? এশীয়? আপনার নাম কি?'

নিরাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। এখন শুধু চুপ করে থাকতে পারে ও। ওরা জানে। প্রশ্ন করছে শুধু খেলার জন্যে, কিছুই ওদের অজানা নেই। পাশের লোকটাকে আড়চোখে লক্ষ করল ও, পিছনে দ্বিতীয় লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন।

'আপনি উত্তর দিতে চান না?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার, নরম সুরে। উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে আবার বলল সে, 'আপনার সাথে কাগজ-পত্র আছে, এফেনডি?'

সংক্ষেপে জবাব দিল রানা, 'লস্ট!'

'তবে আপনি বাংলাদেশী।' বিবৃতির মত শোনাল, জিজ্ঞাসা নয়।

'গ্রামের লোকগুলো আমার সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে,' বলল রানা। 'একটা ক্রুজ শিপ থেকে ইসমাইলিয়ায় নামি আমি, একটা কাফেতে বসে কফি খাই। আমার সাথে একটা বোতল ছিল, সেটাও খালি করি। তারপর হুঁশ ফেরে মরুভূমিতে। কিভাবে কি ঘটল, আমি জানি না।'

বিশাল আকারের লোনা জলাভূমি দেখা গেল হাইওয়ের দু'দিকে, হাইওয়েটা সোজা উত্তর দিগন্তের সাথে গিয়ে মিশেছে। চাঁদ উঠছে আকাশে, জলাভূমি চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। ক্যানেলের জাহাজগুলো নেমিসিস আর নিকোলাই প্যাসিমভের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। ওর ধারণা হলো, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল বলেই ওকে এভাবে ফেলে পালিয়ে গেছে ডাচ জর্জ। তবু

ভাল যে প্যাসিমভকে নিয়ে পালাতে পেরেছে সে। রোডসে কি ঘটছে না ঘটছে সে-ব্যাপারে নিজেকে ওর কালা আর অন্ধ বলে মনে হলেও, মনে মনে জানে এইচআরসি-র যদি আদৌ কোন দক্ষতা থাকে, এতক্ষণে প্যাসিমভকে নিশ্চয়ই তারা নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু তাহলে কর্নেল রুস্তমভকে ওরকম খুশি মনে হলো কেন?

কে.জি.বি. কর্নেলের 'নতুন নির্দেশ'-টা কি ছিল?

'ক্যানেল এরিয়ায় গোলাগুলির রিপোর্ট পেয়েছি আমরা, এল বালাহ থেকে বেশি দূরে নয়। দুই রাত আগের ঘটনা,' বলল ড্রাইভার।

'আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই।'

'আমি কোন অভিযোগ করছি না,' বলল লোকটা, মৃদু কণ্ঠে।

এ-সবের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ভাবল রানা।

ড্রাইভার বলল, 'আপনার সাথে কোন কাগজ-পত্রও নেই। তাই ভাবছি, কি সেই কারণ যে-জন্যে আমাদের দেশের বীর প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রীরা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। স্বীকার করছি, এ-ধরনের জটিল পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নেই।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল রানা।

'ইউনিফর্ম দেখেই বুঝতে পারছেন, আমি সরকারের লোক, তাই না?'

মনে মনে শংকিত হলো রানা, তবে সতর্ক থাকল চেহারায় যেন প্রকাশ না পায়। 'হ্যাঁ, বোধহয়।'

'ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে আছি, সত্যি কথা বলতে কি আমাকে

উন্নতি করতে হলে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মত করে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আপনি বন্ধু দেশের নাগরিক হতে পারেন, কিন্তু আপনাকেও তো আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, তাই না?'

রানা ভাবছে, সবচেয়ে খারাপটাই ঘটে গেছে। সরাসরি মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের হাতে পড়েছে ও। মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সে ওর অনেক বন্ধু থাকলেও, তাদেরকে এই মুহূর্তে কোথায় পাবে ও? রানা একজন স্পাই, এটা যদি জানা থাকে এদের, রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে মাথায় গুলি করলেই বা কি করার আছে ওর? কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু বীর প্রেসিডেন্ট আর তাঁর মন্ত্রীদের কথা কি যেন বলল লোকটা? কোথায় যেন কি একটা গোপন ব্যাপার আছে, ঠিক ধরতে পারছে না ও। 'তোমরা আমাকে পেলে কিভাবে?' জানতে চাইল ও। দিগন্তে মাথাচাড়া দিচ্ছে পোর্ট সাঈদের আলোকমালা, লেক মানজালার একটা কোণ ছাড়িয়ে আরও অনেক সামনে।

'স্থানীয় গোলযোগ আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছে, তবে দু'দিন আগে গোলাগুলির ঘটনা ঘটার পর থেকেই এলাকায় তল্লাশী চালাচ্ছিলাম আমরা, কারণ কিছু রহস্যময় চরিত্র ঘুর ঘুর করার রিপোর্ট পেয়েছিলাম।' রানার দিকে শান্ত চোখে তাকাল সে। 'নেমিসিস নামে একটা জাহাজে উঠে তল্লাশী চালাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের। গোলাগুলির ঘটনা নাকি ওটাতেই ঘটে, পরে আমরা জানতে পারি। কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম, ক্যানেল ছেড়ে আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে জাহাজটা।'

'ইন্টারেস্টিং,' বলল রানা। 'তবে আমি স্রেফ একজন ট্যুরিস্ট।' বলার মত এই একটা মিথ্যেই আছে ওর, সেটাই ধরে

থাকল। সময় পেলে মিথ্যেটা ধরে ফেলবে ওরা, রানা জানে। ওর সাথে এমনকি জাহাজের কোন টিকেটও নেই। তবে, এতে করে খানিকটা সময় পাওয়া যাবে হাতে, যদি ওকে ওরা বেঁচে থাকার অনুমতি দেয়।

হঠাৎ হেসে উঠল ড্রাইভার। 'নাহ্, আসল কথাটা এবার বলেই ফেলি।'

'আসল কথা?'

'আপনাকে আমরা সাহায্য করছি,' বলল ড্রাইভার, হাসছে সে।

'সাহায্য করছেন?'

'পোর্ট সাঈদে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, বাংলাদেশ কনসুলেটে পৌঁছে দেব–আমার ওপর সেই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। বস্ বললেন, সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাই চেয়েছেন। যদি আপনি মাসুদ রানা হন।'

ফাঁদ হতে পারে, ভাবল রানা। মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা ইউনিফর্ম পরে না বলেই জানে ও। যদিও নতুন নিয়মে পরতেও পারে। রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল ও, 'আমিই মাসুদ রানা।'

'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক,' রানার দিকে ফিরে হাসল ড্রাইভার।

সীটে হেলান দিল রানা, সাথে সাথে মূল সমস্যাটা ফিরে এল মনে। কর্নেল রুস্তমভকে অত খুশি লাগল কেন?

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা-১৭৮

বিষকন্যা-১

দুই খণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

এবার সুন্দরী এক জলপরীর খপ্পরে পড়েছে মাসুদ রানা। তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়াতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারা। ওদিকে ধাওয়া করছে ওকে চিরশত্রু ইন্টেলিজেন্স অফিসার কর্নেল রুস্তমভ।

রোডস আইল্যাণ্ডের ভিলায় পাওয়া দগ্ধ লাশটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল না। গ্রীক কোটিপতি কোস্টাস অ্যারোনাকিস কি সত্যিই মারা গেছে?

ব্যারেলের ভেতর জিনিসটা কি শুধুই হলুদ কাদা?

বিজ্ঞানী নিকোলাই প্যাসিনভ কার হাতে পড়লেন?

বেশ জমে উঠেছে নাটক।

বাইশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

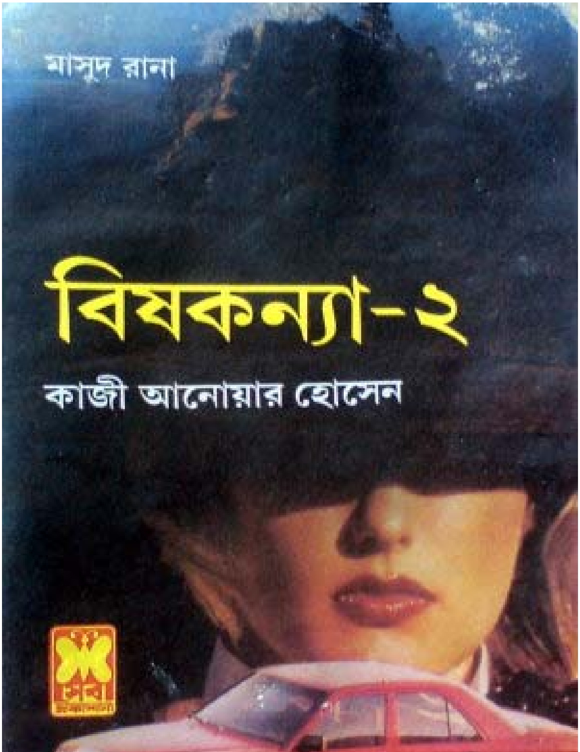
মাসুদ রানা
বিষকন্যা-২
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

বিষকন্যা-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

যত্ন আর খাতিরের বহর দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলো মাসুদ রানা। মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স-এর একটা মার্সিডিজ গাড়ি বাংলাদেশ কনসুলেট থেকে পরদিন বিকেলে তুলে নিলো ওকে, পৌঁছে দিলো পোর্ট সাঈদ এয়ারপোর্টে। ওখানে ওকে বিদায় জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। কাস্টমসের ঝামেলা পোহাতে হলো না, পথ দেখিয়ে অফিসার ওকে একটা মিশরীয় প্লেনে তুলে দিলেন। উদ্ধার পাবার পর পোর্ট সাঈদে ফিরে কিছুক্ষণ ইন্টেলিজেন্স অফিসে বসতে হয়েছিল রানাকে, তখন গোসল ও খাওয়াদাওয়া করার আমন্ত্রণ জানানো হয়, তার আগে নতুন একটা সুট উপহার দেয়া হয় ওকে। সেই স্যুটটাই এখনো পরে আছে রানা।

রোডসে পৌঁছেও প্রায় ভি.আই.পি. অভ্যর্থনা পেলো রানা। একজন গ্রাউণ্ড ক্রুম্যান পতাকা নেড়ে ওর প্লেনটাকে পথ দেখালো, পার্কিং অ্যাপ্রনে থামলো জেট। প্লেনটায় রানা একাই আরোহী, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দেখলো অদূরে একটা মার্সিডিজ অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

মার্সিডিজে উঠে বসার আগে জানালা দিয়ে ভেতরে তাকালো রানা। প্রিয় একটা মুখ দেখতে পেয়ে বুকের রক্ত নেচে উঠলো ওর। এখানেও কাস্টমসের কোনো ঝামেলা পোহাতে হলো না। গ্রীক ইন্টেলিজেন্স-এর দু'জন অফিসার মার্সিডিজ থেকে নেমে করমর্দন করলো রানার সাথে, শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলো। রানাকে নিয়ে ওর প্রিয় বন্ধু ছেড়ে দিলো গাড়ি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে রোডস টাউনের দিকে তীর বেগে ছুটলো মার্সিডিজ।

খানিকক্ষণ কোনো কথা হলো না। গাড়িতে দু'জন মাত্র মানুষ, ড্রাইভারের পাশে রানা। দু'জনেই নাক বরাবর সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, পরস্পরের উপস্থিতি সম্পর্কে যেন সচেতন নয়।

তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানা, 'মারবো শালা এক লাথ্! সাধু বাবাজির ভেক ধরে মৌনব্রত পালন করছিস, মতলবটা কি?'

সাথে সাথে কিছু বললো না সোহেল আহমেদ। খানিক পর খেদ প্রকাশ পেলো তার গলায়, 'দুনিয়াটার যে কী হলো! কৃতজ্ঞ মানুষ আজকাল আর দেখা যায় না।' তারপর অকস্মাৎ রানার পাঁজরে কনুই দিয়ে মস্ত এক গুঁতো মারলো সে। 'শালা, নরক থেকে তুলে এনে নতুন জীবন দান করলাম, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত পাবো না?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো রানা। 'এই নে, প্রতিদান। মনে থাকে যেন, শোধবোধ হয়ে গেল। তোর কাছে আমার আর কোনো ঋণ নেই।'

'প্রাণ বাঁচালাম, তার বিনিময়ে এক প্যাকেট সিগারেট?' হাঁ হয়ে গেল সোহেল।

ঠোঁটে সদয় হাসি নিয়ে মাথা নাড়লো রানা। 'এক প্যাকেট

নয়, একটা,’ ভুলটা ধরিয়ে দিলো ও।

বোবা বনে গেল সোহেল। তারপর বিস্ফোরণ ঘটলো গাড়ির ভেতর, ‘কি বললি?’

‘মুখ বন্ধ কর, আলাজিভ দেখা যাচ্ছে,’ শান্ত সুরে বললো রানা।

রানার শান্ত ভাবটাই গায়ে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো সোহেলের, অকস্মাৎ ব্রেক কষে গাড়ি থামালো সে, মারমুখো ভঙ্গিতে বললো, ‘তোকে আমি কোথাও পৌঁছে দিতে পারবো না, শালা, নেমে যা গাড়ি থেকে।’

আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালো রানা, সোহেলের কথা যেন শুনতেই পায়নি। তারপর নরম সুরে বললো, ‘আহা, মাথা গরম করছিস কেন? হিসেবটা ধরিয়ে দিলেই তো হলো!’

‘হিসেব? কিসের হিসেব?’

‘আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে একটার বেশি সিগারেট তোর পাওনা হয় না।’

‘মানে?’

‘আচ্ছা, ধর, তুই কাউকে আমার ব্যাপারে সুপারিশ করিসনি। ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্সও আমাকে খুঁজে পায়নি,’ বললো রানা। ‘হিংস্র জনতার হাতে আমি মারা গেছি। যথাসময়ে খবরটা পেলি তুই। তারপর?’

‘তারপর কি?’

‘মারা গেছি, কাজেই আমার আর কোনো ব্যাপার নেই,’ বললো রানা। ‘কিন্তু তোর ব্যাপারটা কি হবে? কাজে মন বসাতে পারবি? ভুলে যেতে পারবি আমাকে? তোর আত্মহত্যা করার ইচ্ছে

হবে না? কিংবা প্রতিশোধ নেয়ার? খেতে বসেছিস, আমার প্রিয় খাবারগুলো দেখলে তোর আর খাওয়ার রুচি থাকবে? আমার কোনো বান্ধবীর সাথে দেখা হলে তোর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠবে না? বুকে হাত রেখে বলতে পারিস, আমি মারা গেলে তোর দিনগুলো সুখে-শান্তিতে কাটবে?' হেসে উঠলো রানা, সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো সোহেলের দিকে। 'কাজেই, আমার জন্যে নয়, যা কিছু করেছিস সবই নিজের স্বার্থে। হিসেবটায় যদি কোনো ভুল থাকে তো বল, শুধরে নেবো।'

রানা থামার আগেই গাড়ি আবার ছেড়ে দিয়েছে সোহেল, চোখ দুটো যাতে রানা দেখতে না পায় সেজন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে সে।

হাসতে হাসতে রানা বললো, 'সত্যি কথা বলতে কি, সিগারেটটা তোকে আমি এমনি অফার করেছি, প্রতিদান হিসেবে নয়। নিজের উপকার করেছিস, তার আবার প্রতিদান কি?'

'ঠিক আছে,' বলে প্যাকেটটা রানার হাত থেকে তুলে নিলো সোহেল, ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা তাড়াতাড়ি পকেটে ভরে রাখলো।

হৈ-চৈ জুড়ে দিলো রানা, 'কি ব্যাপার? কি করছিস?'

'নিজের উপকার,' নির্লিপ্তকণ্ঠে বললো সোহেল। 'অভ্যেস হয়ে গেছে কিনা।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সশব্দে হেসে উঠলো দু'জন।

হাসি থামতে রানা জানতে চাইলো, 'কাজের কথা হোক। ঈজিপশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের কাকে ধরেছিলি বলতো?'

'ওদের কাউকে না,' জানালো সোহেল। 'রাষ্ট্রপ্রধানকে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে।'

‘মাই গড! তাইতো বলি! একেবারে যাদুর মতো কাজ হয়েছে, বুঝলি! আমাকে ওরা জামাই আদর করেছে। আর গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারটা? ওরা নিশ্চয়ই পুলিশকে বোঝাতে পেরেছে, আমি নির্দোষ?’

মাথা নাড়লো সোহেল। ‘গ্রীক ইন্টেলিজেন্স অনুরোধ করায় পুলিশ তোকে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় বরাদ্দ করেছে মাত্র। এর মধ্যে তোকে প্রমাণ করতে হবে কোস্টাস অ্যারোনাফিসের ভিলায় যা ঘটেছে তার জন্যে তুই দায়ী নোস। এখনো তোকে ওরা সন্দেহের তালিকায় সবার ওপরে রেখেছে, রানা।’

‘কিন্তু তুই কি জানিস, কোস্টাস অ্যারোনাফিস বেঁচে আছে? মিশরে রওনা হবার আগে এয়ারপোর্টে দেখেছি তাকে আমি।’

‘জানতাম বেঁচে আছে সে। কিন্তু তার ভিলায় মারা গেছে দু’জন লোক।

অফ দ্য রেকর্ড, গ্রীক ইন্টেলিজেন্সে আমাদের বন্ধুরা বিশ্বাস করতে চায়, ঘটনাটার সাথে তোর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তদন্তে ঢিলেঢালা ভাব দেখানোর ঝুঁকি তারা নিতে পারে না। খবরের কাগজে যদি ছাপা হয় যে বাংলাদেশের একজন স্পাই ঘটনার সাথে জড়িত ছিলো জানা সত্ত্বেও তারা তাকে ছেড়ে দিয়েছে।’

‘আটচল্লিশ ঘন্টা তো? দেখা যাক…।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সোহেল বললো, ‘তার বেশি অপেক্ষা করতে পারবে না ওরা। তবে সমস্যা হবার কথা নয়, কারণ তার অনেক আগেই গ্রীস ছেড়ে চলে যাবি তুই। কিন্তু যদি না যাস, ওরা তোকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করতে বাধ্য হবে। ডিটেনশনে পাঠাতে

পারে, তারমানে অনির্দিষ্টকাল আটকাদেশ দিতে পারে কোর্ট। সেক্ষেত্রে আমরা তোকে কোনো রকম সাহায্যই করতে পারবো না। কথাটা মনে রেখে যা কিছু করার করতে হবে তোকে।'

সীটে হেলান দিলো রানা, একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো চেহারা। জানালার বাইরে সূর্যদেবতা হেলিয়স-এর প্রিয় দ্বীপ নীল আকাশের নিচে রোদে ঝলমল করছে। মন্টি স্মিথ রোডস টাউনের পুব সীমায় মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে, কয়েক কিলোমিটার সামনে। ওই পাহাড়ের চূড়া থেকে স্মিথ নামে একজন ইংরেজ স্পাই নেপোলিয়নের জাহাজ বহরের ওপর নজর রেখেছিল।

চোখ ফিরিয়ে রানাকে লক্ষ করলো সোহেল, 'প্রায় পৌঁছে গেছি,' বললো ও।

'নিকোলাই প্যাসিমভ কি এখানে আছেন?'

'না থাকার কি কারণ?'

রানা কিছু বললো না। সুয়েজ ক্যানেলে যা ঘটেছে, সবই প্রায় জানা আছে সোহেলের। কনসুলেটে রানার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিল সে। সত্যিই তো, রুশ বিজ্ঞানীর রোডসে না থাকার কোনো কারণ নেই। রুশ ভিন্ন মতাবলম্বীকে ডাচ জর্জ সরাসরি এখানে নিয়ে আসবে, তাঁকে এইচআরসি-র হেফাজতে রাখা হবে, এটাই তো যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, কর্নেল রুস্তমভের সাথে ওর দ্বন্দ্বের কথা মনে রেখে, সামান্যই স্বস্তিবোধ করলো রানা। গ্রীক কোটিপতি প্রসঙ্গে ফিরে এলো ও। 'তুই বললি, তোরা জানতিস কোস্টাস অ্যারোনাফিস বেঁচে আছে?'

'আমরা সন্দেহ করেছিলাম ব্যাপারটা। ভিলায় যে লাশগুলো পাওয়া গেছে, দু'জনকেই সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।'

'দ্বিতীয় লাশটা কার?'

‘একজন মার্কিন নাবিক, এডওয়ার্ড গ্রীন।’

‘এই একই এডওয়ার্ড গ্রীন কি হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস-এর হয়েও কাজ করে?’ অবাক হয়ে জানতে চাইলো রানা। ‘সে-ই কি নিকোলাই প্যাসিমভকে নেমিসিসে তুলেছিল?’

‘ঠিক তাই। তোর কোনো ধারণা আছে, রোডসে এলো কি করে লোকটা? এখানে কি করছিল সে?’

মাথা নাড়লো রানা। ‘না।’ এক মুহূর্ত পর বললো, ‘এ-ব্যাপারে এইচআরসি কর্মকর্তাদের কি বলার আছে?’

‘প্রথমে তারা গ্রীনকে সি. আই. এ.-র লোক বলে মানতে চায়নি। গ্রীনের ডোশিয়ে দেখবার পর বলছে, সি. আই. এ. রোপণ করেছিল তাকে, তাদের অজ্ঞাতে।’

‘হুম। তাদের অজ্ঞাতে এরকম আরো কতো চর ওখানে লুকিয়ে আছে কে জানে।’

‘তোর এই কোস্টাস অ্যারোনাফিস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি,’ নামটা উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাব কঠোর হয়ে উঠলো সোহেলের। ‘সে-ই নেমিসিসের মালিক, জানিস তো?’

‘হ্যাঁ, চন্দন আমাকে বলেছে।’

‘আরো আছে। লোকটা আর্মস স্মাগলার, বিপুল টাকার মালিক হওয়ার পিছনে সেটাই আসল রহস্য। লেবাননের গৃহযুদ্ধকে পুঁজি করে নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছে।’

ছোট্ট খাঁড়িটার কথা মনে পড়লো রানার, অ্যারোনাফিস ভিলার সরাসরি নিচে, পাথুরে প্রাচীর তিন দিক থেকে প্রায় আড়াল করে রেখেছে। ‘তার ইয়টটা যেখানে রাখা হয়,’ বললো রানা, ‘জায়গাটা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রকৃতির একটা দান, স্মাগলিঙের

কাজে লাগাচ্ছে অ্যারোনাফিস।’

‘আফ্রিকার অনেক দেশের সাথে অস্ত্রের অবৈধ ব্যবসা করছে লোকটা। শুধু আর্মসই হয়তো নয়, চোরাই শিল্পকর্ম বা ড্রাগসের ব্যবসাও করে বলে সন্দেহ করছি। ভালোভাবে তার অতীত জানতে হলে আরো সময় দরকার।’

‘সন্তুষ্ট করার মতো কিছু বলছিস না।’

‘লোকটা আসলে সুযোগসন্ধানী, তার মতো লোভী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। তবে, বহিরাবরণ বা ইমেজ সম্পর্কে ভারি সচেতন। যে-কোনো বিচারে সাধারণ ক্রিমিনাল তাকে বলা যাবে না।’ রোডস টাউনের শহরতলীতে পৌঁছুলো গাড়ি, রাস্তার দু’পাশে ইটালিয়ান স্থাপত্যরীতির ঔৎকর্ষ নিয়ে সারি সারি দালান-কোঠা, প্রতিটি বাড়ির সামনে সুদৃশ্য বাগান। সেদিকে না তাকিয়ে বলে চলেছে সোহেল, ‘নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে, তবে মায়ের তরফ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যোগাযোগ ছিলো, যদিও তার বাবা সেগুলো ব্যবহার করতে শেখেনি। লেখাপড়ায় ভালো ছিলো কোস্টাস অ্যারোনাফিস। গ্রীক ফরেন সার্ভিসে ভালো একটা পদ পেতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি। ওখানে থাকতেই অসৎ কিন্তু ক্ষমতাবান কিছু লোকের সাথে পরিচয় হয়। লেবাননে সিভিল ওঅর তুঙ্গে উঠলো, সে-ও ইন্ধন যোগাবার সুযোগ পেয়ে গেল।

‘তারও আগে টন টন অস্ত্র গোপনে পাচার করার কৃতিত্ব দেখিয়ে সম্ভাব্য ক্রেতাদের মনে আস্থার ভাব এনেছে সে। ইউরোপের প্রায় সব দেশ থেকে অস্ত্র কিনতো, সীল করা ওয়্যারহাউসে তোলা হতো সে-সব, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের ঘুষ দেয়ার ফলে সরকারী সংস্থা থেকে ইন্সপেকশনের জন্যে কাউকে পাঠানো

হতো না। প্রায় রাতারাতি মিলিওনেয়ার বনে যায় অ্যারোনাফিস। এই টাকা দিয়ে আরো প্রভাবশালী লোকদের পকেটে ভরে সে, ভূমধ্যসাগরীয় অন্তত ছ'টা দেশের প্রোটেকশন কিনে ফেলে। একই সাথে আইনসম্মত ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করে সে। জাহাজ কেনে, এমনকি ত্রিপলিতে একটা শিপইয়ার্ডও। কোথায় যেন তার একটা রিফাইনারিও আছে। তবে, এখনো লোভ তার মেটেনি। মোটা লাভ দেখলে নিজেকে সামলে রাখতে পারে না।'

পুরনো শহরের গম্ভীরদর্শন পাঁচিল পেরিয়ে সরু রাস্তায় বেরিয়ে এলো মার্সিডিজ। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে সোহেল, চারপাশে গিজগিজ করছে ট্যুরিস্ট। রানার হোটেলের পাশে থামলো সে।

'মনে হচ্ছে কে.জি.বি. পাহারা বসিয়েছে এখানে,' হোটেলের লবিতে ঢুকেই বিড়বিড় করলো রানা।

লবি এলিভেটরের দিকে এগোলো ওরা, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো সোহেল। ফিসফিস করে বললো, 'হ্যাঁ, আমিও ডেস্ক ক্লার্ককে মাথা দোলাতে দেখলাম। অবাক হওয়ার কিছু নেই, ওদের টিম-ওঅর্ক অত্যন্ত ভালো।'

বিশাল একটা ফুলদানিতে একগাদা গোলাপ রাখা হয়েছে, এলিভেটরের বোতামটা তার ওপরে। সেটায় চাপ দিয়ে অপেক্ষা করার সময় চট করে লবির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো রানা। মেঝেতে ইসলামী সূচীশিল্পশোভিত কার্পেট, দেয়ালে মধ্যযুগীয় লণ্ঠন। ডেস্ক ক্লার্কের সূক্ষ্ম সংকেত গ্রহণকারী ব্যক্তিটিকে নিবিষ্টচিত্তে খবরের কাগজ পড়তে দেখলো ও।

একজন ব্যবসায়ী বা ট্যুরিস্টের কাপড় পরে থাকলেই যেন স্বাভাবিক হতো, কিন্তু ডেনিম পরা লোকটাকে ভারতীয় নাবিকদের মতো লাগলো রানার। লম্বা-চওড়া চেহারা, পেশীবহুল শরীর, শক্ত

চোয়াল। সরাসরি রানার দিকে নয়, চোখ তুলে সিলিঙের দিকে একবার তাকালো সে। রানা দেখলো, গোলাকার মুখে চোখ দুটো তার কালো। কালো কোঁকড়ানো চুল। কে.জি.বি. বিভিন্ন দেশের লোকদের চর হিসেবে কাজে লাগায়, জানে রানা। মিশরে যাদের দেখেছে, তাদের মধ্যে লোকটা অবশ্য ছিলো না।

কে.জি.বি-র উপস্থিতি দু'রকম অনুভূতি এনে দিলো রানার মনে। ওদেরকে অপেক্ষা করতে দেখে উদ্বেগ বোধ করলো ও, কর্নেল রুস্তমভকে সন্তুষ্ট দেখার পর এখানে ওদের উপস্থিতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে তো সমস্ত সংকট ওদের কাটিয়ে ওঠার কথা।

আরেকটা কথা ভাবলো রানা, মাঠ ছেড়ে ওরা সরে না যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, নিকোলাই প্যাসিমভ এখনো ওদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছেন। সেদিক থেকে ব্যাপারটা স্বস্তিকর।

আড়িপাতা যন্ত্রের সন্ধানে প্রথমবারই স্যুইটটায় তল্লাশী চালিয়েছে রানা, আজও একবার চালালো। পাথুরে মূর্তির মতো অপেক্ষা করছে সোহেল। অসহিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ নেই চেহারায়। আসবাব-পত্রের কোনোটাই নাড়াচাড়া করা হয়নি, তবে একজোড়া খুদে ট্র্যান্সমিটার পেলো রানা। একটা টেলিফোনে, অপরটা বাতির একটা সুইচে। হাতের তালুতে নিয়ে সোহেলকে দেখালো ও। ঠাণ্ডা চোখে দেখলো সোহেল, কোনো মন্তব্য করলো না। জুতো দিয়ে চ্যাপ্টা করে টয়লেটে ফেলে দিলো রানা ওগুলো।

'আমার সাথে উঠে এলি যে তুই?' সোহেলকে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কি ব্যাপার বল তো?'

'আগেই ব্যাখ্যা করা উচিত ছিলো,' বললো সোহেল। 'একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমাদের।'

‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে? কার সাথে?’

‘হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারের সাথে।’

‘আচ্ছা।’ সুটকেসটা বিছানায় ফেলে খুললো রানা। ‘তার সাথে কথা হয়েছে তোর?’

‘না। তুই ল্যাণ্ড করার খানিক আগে এথেন্স থেকে পৌঁছুই আমি,’ বললো সোহেল। ‘এখানে তিনি তাঁর ইয়টে আছেন। আমার বিশ্বাস, ডাচ জর্জ আর নিকোলাই প্যাসিমভকে সাথে করে এনেছেন তিনি।’

কাপড় পাল্টাচ্ছে রানা। ‘তা যদি হয়, তোর মনে হয় না, আমার কাজ শেষ হয়েছে এখানে?’

মাথা নাড়লো সোহেল। ‘রোডস আইল্যাণ্ড থেকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিতে হবে নিকোলাই প্যাসিমভকে,’ বললো সে। ‘যতোক্ষণ তাঁর বিপদ না কাটে, তোর কাজ শেষ হবে না।’

‘রোডস আইল্যাণ্ড থেকে তাঁকে সরানো, নিরাপদে সরানো অত্যন্ত কঠিন হবে,’ গম্ভীর সুরে বললো রানা।

‘সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে,’ বললো সোহেল । ‘এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমাদের সাথে পুলিশ থাকবে। একটা চার্টার করা প্লেনে তোলা হবে ভদ্রলোককে।’ হাতঘড়ি দেখলো সে। ‘দেড় ঘন্টা সময় আছে। সুইডেনে পৌঁছে তাঁকে তুলে দেয়া হবে ঢাকা ফ্লাইটে। ওখানে রুশ দূতাবাস আর আমাদের লোক অপেক্ষা করবে, সাংবাদিকদের নিয়ে। তুই তাঁর সাথে পুরোটা পথ থাকছিস।’

‘কিন্তু তিনি যদি বাংলাদেশে যেতে রাজি না হন?’ জিজ্ঞেস

করলো রানা।

'বোঝাতে হবে। নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে তাঁকে।'

'কর্নেল রুস্তমভের মতো তাঁরও যদি ধারণা হয়, আমরা আমেরিকানদের পক্ষে কাজ করছি? তিনি যদি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে না পারেন? তিনি যদি জেদ ধরেন, গোঁয়ার্তুমি করেন, আমরা তাঁর কথায় কান দেবো না,' গম্ভীর সুরে বললো সোহেল। 'নিজেদের কাছে আমরা পরিষ্কার, তাকে পুঁজি করে বাংলাদেশ কোনো স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে না। ভালো কথা, ঢাকায় পৌঁছে দিন কয়েকের জন্যে গায়েব হয়ে যাবি তুই। বসকে বলে আগেই তোর ছুটি মঞ্জুর করিয়ে রেখেছি।'

'তুই ভয় পাচ্ছিস, রুস্তমভ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ঢাকা পর্যন্ত হাত বাড়াবে?'

'ভয় পাচ্ছি না, আমি জানি।'

'ইথিওপিয়ায় যাবার কি হবে?' জানতে চাইলো রানা। 'ওখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এই সময় জলপরী মেমোর সাথে জড়িয়ে ফেলা হলো আমাকে।'

'ওখানকার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক।'

গাঢ় সবুজ টাইয়ের নটটা ঠিকঠাক করলো রানা, বগলের তলায় হোলস্টারটা অ্যাডজাস্ট করলো। পোর্ট সাঈদ থেকে একটা .৩৮ স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন সংগ্রহ করেছে ও। ব্রাউন জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে সোহেলের দিকে তাকালো ও।

'কি হলো, কি ভাবছিস?'

আরো এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে রানা বললো, 'আফ্রিকার কথা বললি তুই। ক্যানেল দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলো নেমিসিস। সন্দেহ নেই, রাশিয়ানরা জাহাজটা দখল করে নেয়ার আগে। খালি

হোল্ড নিয়ে আফ্রিকার দিকে যাচ্ছিলো কেন?'

'ডাইভারশন, তোর ধারণা? কি উদ্দেশ্যে?' সোহেলের প্রশ্নের মধ্যে অসহিষ্ণু একটা ভাব রয়েছে। হাতঘড়ি দেখলো সে। নেমিসিস সম্পর্কে তেমন কোনো আগ্রহ নেই বলে মনে হলো। রুশ বিজ্ঞানীকে পাওয়া গেছে ধরে নেয়ার পর আগ্রহ থাকার কথাও নয়।

'জাহাজটা খালি ছিলো কেন, আমি জানি না,' নিচু গলায়, যেন নিজের সাথে কথা বলছে রানা। 'তবে আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে রাশিয়া থেকে ওটা রওনা হয়েছিল ইয়েলোকেক কার্গো নিয়ে।'

'ইউরেনিয়াম অক্সাইড?' চোখ বড় করলো সোহেল, তীক্ষ্ণ চোখে রানার মুখভাব লক্ষ করলো। 'বলিস কি!'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'জেনেই বলছি আমি।'

'জিনিসটাকে পরিশোধিত করার পর উইপনস-গ্রেড ইউরেনিয়ামে পরিণত করা যায়!'

'জানি। নেমিসিসের ডেকে হলদেটে দাগ দেখেছি আমি, ফরওয়ার্ড হ্যাচ কাভারের পাশে। অ্যারোনাফিসের ভিলার কাছে, উপকূল থেকে সামান্য দূরে, একটা ব্যারেলেও ওই জিনিস দেখেছি। আমার ধারণা, এখানেই নামানো হয় কার্গো, সম্ভবত অন্য কোনো জাহাজে তোলা হয়েছে। কাজটা করার সময় একটা ব্যারেল পানিতে পড়ে যায়।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো সোহেল, তারপর বললো, 'মনে হচ্ছে ইউরেনিয়াম শিপমেন্ট নিয়ে কিছু কৌশল করেছে অ্যারোনাফিস, তার আয়োজনের কারণেই মনে হচ্ছিলো নিকোলাই প্যাসিমভ হারিয়ে গেছেন।'

‘কৌশলটা হাইজ্যাকিংও হতে পারে।’

‘তার নিজের জাহাজ?’

‘নিজের জাহাজ বলেই তো কাজটা সহজ হয়েছে। তবে কার্গোটা নিজের নয় তার। কেউ নিশ্চয়ই আগেই মূল্য পরিশোধ করেছে, তা না হলে জিনিসটা লোড করা হতো না।’

সোহেল চিন্তিত হলো। ‘প্রসেস করা এক জাহাজ ইউরেনিয়াম ওর–এর দাম হবে, কম করেও, একশো মিলিয়ন ডলার, ব্ল্যাকমার্কেটে...।’

‘আসল বিপদটা অন্যখানে,’ বললো রানা। ‘কি কাজে ব্যবহার করা হবে তার ওপর নির্ভর করে।’

‘ওই ইউরেনিয়াম অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে, রানা,’ দৃঢ়কণ্ঠে বললো সোহেল। ‘কোস্টাস অ্যারোনাফিসের মতো লোক দুনিয়াটাকে ধ্বংস করার উপকরণ অপাত্রে দান করতে পারে, তার দ্বারা কাজটা সম্ভব। ইসরায়েল বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কোনও দেশ যদি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়, দুনিয়ার মানুষের ঘুম হারাম হয়ে যাবে।’

দুই

টাকার লোভে সভ্যতার সমস্ত বাঁধন অগ্রাহ্য করে অতিরিক্ত বেড়ে উঠেছে কোস্টাস অ্যারোনাফিস। ব্যক্তিস্বার্থ অন্ধ করে দিয়েছে তাকে, মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ তার বিবেচ্য বিষয় নয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্ষমতালোভী কোনো একনায়ক যদি অ্যারোনাফিসের কাছ থেকে পাওয়া ইউরেনিয়াম অক্সাইড পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

'দ্বীপ ছেড়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে আমাকে,' বললো সোহেল। 'ওয়ার্ল্ড ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিকে সতর্ক করা দরকার।'

'কিন্তু সবাইকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না,' বললো রানা। 'সবাই যদি জানতে পারে ব্যাপারটা, ইউরেনিয়াম হাত করার জন্যে দুনিয়া জুড়ে একটা উন্মত্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে।'

'বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছিস। খুনোখুনি কাণ্ড বেধে যাবে।'

'আটচল্লিশ ঘন্টা না পেরুনো পর্যন্ত এখানেই থাকতে চাই

আমি,' বললো রানা। 'ইউরেনিয়াম রহস্যের চাবি হয়তো এখানেই কোথাও আমাদের নাকের ডগায় রয়েছে।'

একটা ভুরু উঁচু করে তাকালো সোহেল। 'অ্যারোনাফিস?'

'ঘটনাটা শুরু হয়েছে এখান থেকে, তাই না? আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, শেষও হবে এখানে।'

'কোথায় আছে সে, তোর কোনো ধারণা আছে?'

মাথা নাড়লো রানা। 'রোডসে থাকলে আমি আশ্চর্য হবো না।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে সোহেল বললো, 'যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবি তুই, প্রয়োজনে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্টটা এরকম বিপজ্জনক মোড় নিতে পারে বলে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন বস্, সেজন্যেই তোকে জেড ক্লিয়ার্যান্স দিতে বলেছিলেন।'

নিঃশব্দে হেসে মাথা ঝাঁকালো রানা, তারপর বললো, 'তথ্য বা আভাস পাবার কতো বিচিত্র উৎসই না আছে বুড়োর।'

'এবার তাহলে বেরুতে হয় আমাদের,' বললো সোহেল। 'অ্যাপয়েন্টমেন্টটা অত্যন্ত জরুরী।'

ডেনিম পরা লোকটা এখনো রয়েছে লবিতে। অলস পায়ে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এলো সে, মার্সিডিজটাকে পাহাড় থেকে নেমে পুরনো শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো।

নিয়া আগোরা অর্থাৎ নতুন বাজারে পৌঁছুলো মার্সিডিজ। সবুজ টালি দিয়ে ছাওয়া সার সার তোরণের নিচে দাঁড়কাকদের মিটিঙ বসেছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি থেকে ওরা যেন একটা গরম তন্দুরের ভেতর বেরিয়ে এলো। বাতাস থেমে আছে, চারপাশে

ট্যুরিস্টদের ভিড়। তোরণের নিচে দাঁড়িয়ে ছয় কোনা উঠানটাকে রীতিমতো জ্যান্ত বাজার বলেই মনে হলো রানার। কাফে আর স্যুভেনির শপে বিরতিহীন বেচা-কেনা চলছে। গায়ে গায়ে ঠেকে আছে ফল, তরিতরকারি, মাংস আর সীফুড উপচে পড়া স্ট্যাণ্ডগুলো। কাছাকাছি একটা মসজিদ থেকে আগরবাতির গন্ধ ভেসে আসছে। চার্চটা আগেও দেখেছে রানা, বাজারটার সাথেই ইটালিয়ান ফ্যাসিস্টরা তৈরি করেছিল। ইটালিয়ান শাসকদের জন্যে দ্বীপটাকে গ্রীষ্মকালীন অবকাশযাপন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার একটা মহাপরিকল্পনা করেছিলেন মুসোলিনী, বাজারটা সেই পরিকল্পনারই একটা অংশবিশেষ। থেমে থাকা বাতাসে ফুলের গন্ধও রয়েছে, বাজার ও বাগানের এমন সহাবস্থান আর কোথাও দেখেছে কিনা মনে করতে পারলো না রানা।

একটা রাস্তা ধরে ম্যানড্রাকি হারবারের সামনে চলে এলো ওরা। ফুটপাতে বেকার বা ভবঘুরে যুবকদের ইতস্তত পদচারণা লক্ষ করা গেল। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে এগোলো ওরা। একটা কাফের সামনে থামলো সোহেল। রানার দিকে একবার তাকিয়ে আরেক দিকে ফিরলো সে, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেন্ট জন চার্চের কাছে নোঙর করা একটা একশো ফুটি মোটর ইয়ট দেখলো রানা। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকালো ও, পিছু নেয়ার কোনো আভাস পেলো না। হোটেলের লবিতে দেখা পেশীবহুল লোকটার কথা মনে পড়ে গেল।

গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক হয়ে ইয়টে উঠলো ওরা। নীল জমিনের ওপর হলুদ ক্রসচিহ্ন, সুইডেনের পতাকা, হালকা বাতাসে নড়ছে। ইয়টটা ভারি সুন্দর, বোঝাই যায় ধনী কোনো লোকের শখের জিনিস।

সেগুন কাঠের তৈরি একটা আফটার ডেক পেরুলো ওরা, সাদা আর লাল টেবিল-চেয়ারগুলোকে পাশ কাটালো। ডেক আর রেইল ঝকঝক তকতক করছে। দিগন্তরেখার দিকে একবার তাকালো রানা। হারবারের প্রবেশমুখে দেখা গেল সেন্ট নিকোলাস দুর্গ, হলদেটে পাথুরে গোড়ায় আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ। চ্যানেলের দু'দিকে খাড়া হয়ে রয়েছে পাথরের স্তম্ভ, মাথায় সিম্বলস অভ রোডস, একটায় ব্রোঞ্জের তৈরি পুরুষ-হরিণ, অপরটায় স্ত্রী-হরিণ। জেটিটাও পাথরের তৈরি, শেষ মাথায় ড্রাম আকৃতির উইণ্ডমিল, মধ্যযুগের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন দুর্গ থেকে তীর পর্যন্ত প্রসারিত।

তিনি বসে আছেন কুঁজো হয়ে। কড়া ভাঁজের লাল ইউনিফর্ম পরা এক চীনা লোক ডেক সুপারস্ট্রাকচার ঘুরে বেরিয়ে এলো ওদের সামনে, পরিচয়-পত্র দেখতে চাইলো। আড়ালে রাখা মাইক্রোফোন থেকে কোমল মিউজিকের শব্দ ভেসে আসছে। এয়ার-কণ্ডিশনিং মেশিনারির মৃদু গুঞ্জন ঢুকলো কানে।

ইয়টের খোলে অনবরত আঘাত করছে ছোটো ছোটো ঢেউ।

দরজাটা গোল, ঝাপসা কাঁচ লাগানো। অ্যাটেনড্যান্টের পিছু পিছু বিশাল এক সেলুনে ঢুকলো ওরা। মেঝেতে পুরু কার্পেট, সাদার ওপর সোনালি আর নীল নক্সা। সেলুনের বাতাস হিম শীতল। মূল্যবান পোশাক পরা সম্মানী অতিথিদের দিকে তাকালো রানা। বেশ কয়েকজনকে চিনতে পারলো ও। ইটালিয়ান কাউন্ট, ফ্রেঞ্চ অভিনেতা, সুইডিশ মডেল, জার্মানীর টেনিস তারকা বেশিরভাগই ইউরোপীয়। ককটেলের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে সবাই, মৃদুকণ্ঠে আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। সেলুনের দেয়ালগুলো বাঘের চামড়া দিয়ে মোড়া।

কেউ তারা ওদেরকে লক্ষ করলো না।

পথ দেখিয়ে একটা স্টাডিতে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে। চামড়া মোড়া একটা ডেস্কের পিছনে বসে আছেন সোরেৎসেন বারকেইনহেইমার। ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে আছে তাঁর, প্রথমেই লক্ষ করলো রানা।

সাদা লিনেনের ব্লেজার পরে আছেন ভদ্রলোক, ব্রেস্ট পকেট রঙিন হয়ে আছে লাল রুমালের কোণ বেরিয়ে থাকায়। কলারের দুই প্রান্তে মুক্তো বসানো সোনার বোতাম ঝলমল করছে। মাথায় ক্যাপ, কিনারায় বেরিয়ে থাকা ধবধবে সাদা চুলও যেন তাঁর অলংকার। কিন্তু তিনি বসে আছেন কুঁজো হয়ে।

খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, কথা বলার শক্তি নেই তাঁর।

তারপর তিনি শিরদাঁড়া খাড়া করার চেষ্টা করলেন, বললেন, 'নিকোলাই প্যাসিমভকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। মুক্তিপণ না দিলে তাঁকে ওরা ছাড়বে না।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লা…,' বসলো সোহেল, দেখে মনে হলো বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে।

'আমার লাগছে না,' তিক্তকণ্ঠে বললো রানা। পরিকল্পনায় গলদ নয়, এ যেন ওর ব্যক্তিগত পরাজয়। ওর সাথে বেঈমানী করা হয়েছে। পাল্টা আঘাত হানার জন্যে অস্থিরতা অনুভব করলো ও।

লালচে হয়ে উঠলো সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারের মুখ। 'ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন, মি. রানা?'

চাবুকের মতো শব্দ বেরিয়ে এলো তাঁর গলা থেকে। নিজেকে সামলে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। অর্থ এবং ক্ষমতা, দুটোই বিপুল পরিমাণে আছে তাঁর, কারো খোঁচা হজম করার ধাত নয়।

বারকেইনহেইমারের বলার ভঙ্গি আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিলো, মুঠো করা একটা হাত ডেস্কের ওপর রেখে সুইডিশ ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকলো রানা, চোখ দুটো কঠিন। 'বোঝাতে চাইছি, আপনারা একটা সংগঠন চালাচ্ছেন আনাড়ি, বাচাল আর ভাঁড়দের নিয়ে...।'

'রানা!' বাধা দিলো সোহেল।

কিন্তু থামলো না রানা। এ-ধরনের একটা অপারেশনে জড়িয়ে পড়াই উচিত হয়নি হিউম্যান রাইটস কংগ্রেসের। আপনাদের না আছে ট্রেনিং, না আছে যোগ্যতা। শুধু পাবলিসিটির লোভে... ।'

'শান্ত হোন, মি. রানা,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন বারকেইনহেইমার। 'আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, অত্যন্ত উঁচুদরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সমস্যার সমাধানে কাজ করছি আমরা...যারা...।'

'খুব ভালো কথা,' বললো রানা। 'কিন্তু আপনাদের আদর্শের বলি হয়েছে এথেন্সে আমাদের একজন এজেন্ট, কারণ আপনি বা আপনার প্রতিনিধি ডাচ জর্জ ওখানে আমাদের মিটিংটার কথা গোপন রাখতে ব্যর্থ হন। আপনাদেরই অনভিজ্ঞতার জন্যে নিকোলাই প্যাসিমভকে হারিয়েছি আমরা, এখন তাকে প্রাণ হারাতেও হতে পারে। অথচ আমরা ভাবছিলাম নিরাপদে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া যাবে।'

'যা হবার হয়েছে,' বললো সোহেল। 'এখন ভাবতে হবে...।'

তার দিকে ফিরে বারকেইনহেইমার বললেন, 'ধন্যবাদ, মি.

সোহেল।’ রানার দিকে সতর্ক চোখে তাকালেন তিনি, এখনো তাঁর দিকে ঝুঁকে রয়েছে রানা।

‘ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার,’ বললো সোহেল। ‘আসুন শুরু করি… ।’

‘ডাচ জর্জ কোথায়?’ ব্যাখ্যা চাইলো রানা। ‘কোথায় কি গোলমাল হয়েছে তার মুখ থেকে শুনতে চাই আমি।’

রানা বাধা দেয়ায় বিস্মিত হলো সোহেল।

‘মি. ডাচ জর্জ কোথায়, সে-ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন এইচআরসি কর্মকর্তা, তাকালেন সোহেলের দিকে। ‘আপনি, স্যার, বলছিলেন…।’

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবেন, বারকেইনহেইমারকে সে-সুযোগ দিতে রাজি নয় রানা। ‘কিডন্যাপাররা যখন এলো, নিকোলাই প্যাসিমভকে তখন কোথায় রেখেছিলেন আপনারা?’ কঠিন সুরে প্রশ্ন করলো ও।

বারকেইনহেইমারের দৃষ্টি ঝাড়া তিন সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকলো রানার মুখের ওপর। রানা প্রসঙ্গটা ধরে রাখতে চাইছে লক্ষ করে চুপ করে থাকলো সোহেল, জানে সঙ্গত কারণ ছাড়া জেদ ধরার মানুষ নয় ও।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বারকেইনহেইমার বললেন, যেন অবোধ একটা শিশুর সাথে কথা বলছেন তিনি, ‘আপনি বুঝতে পারছেন না? নিকোলাই প্যাসিমভকে হাতেই পাইনি আমি। নিকোলাই প্যাসিমভ বা ডাচ জর্জ, ওদের কাউকে আমি দেখিনি পর্যন্ত।’

‘জর্জ তাহলে তাকে আপনার কাছে আনেনি?’ জিজ্ঞেস করলো রানা, হঠাৎ করে যেন ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছে ও। ‘আনার ইচ্ছেও তার আসলে ছিলো না। সেজন্যেই আমাকে

বিপদে ফেলে মিশর থেকে পালায় সে। বাস্টার্ডটাকে ধরতে পারলে...।'

রানার দিকে অবাক হয়ে তাকালো সোহেল। 'কিন্তু আমি জানতাম মিশর থেকে তুইই জর্জকে বেরিয়ে আসতে বলেছিস!'

'আমাকে ফেলে পালায় সে। তার সাথে মিলি পুলটিসও। নেমিসিস থেকে পাঁচ-সাত মিনিট পর রওনা হই আমি। হাইওয়েতে ফিরে দেখি প্লেনটা নেই।'

'আমাকে সে-কথা আগে বলিসনি কেন?' জানতে চাইলো সোহেল।

'ভেবেছিলাম প্যাসিমভকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসার জন্যেই আমার জন্যে অপেক্ষা করেনি জর্জ,' বললো রানা। 'সে যে বেঈমানী করেছে সেটা এখন বুঝতে পারছি। প্যাসিমভ নিরাপদ আছেন, এতেই আমি খুশি ছিলাম। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারটাই তো আসল কথা।' মাথা নাড়লো রানা। 'জর্জ আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে। প্যাসিমভকে আটকে রেখে টাকা কামানোর ইচ্ছে তার, অথচ ওদিকে আমি আরেকটু হলে খুন হয়ে যাচ্ছিলাম!' চেহারায় ক্লান্তি, ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো ও। চেয়ারের পিছনটা ঘষা খেলো কিডনির ওপর ক্ষতটায়, ব্যথাটা নিঃশব্দে হজম করলো। রাশিয়ান লাথির কথা মনে পড়ে গেল ওর, সামনের দিকে সরে বসলো একটু।

কোমল মিউজিকের শব্দ ওর স্নায়ুতে যেন খোঁচা মারছে।

কয়েক সেকেণ্ড কেউ কোনো কথা বললো না।

তারপর বারকেইনহেইমারের দিকে তাকালো রানা। 'আপনি জানেন, ডাচ জর্জ সি.আই.এ-র লোক কিনা?'

'অসম্ভব! কি বলছেন!' তীব্র প্রতিবাদ জানালেন ভদ্রলোক।

‘কিন্তু এডওয়ার্ড গ্রীন যে সি.আই.এ-র লোক তার প্রমাণ আছে আমাদের কাছে,’ বললো রানা। ‘সে যদি হয়, জর্জের হতে বাধা কোথায়?’

‘গ্রীনকে রোপণ করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এইচআরসি-র সবাই…।’

‘বলুন জানেন না, অসম্ভব বলছেন কেন? এমন কি, আপনাকেও যদি আমরা সি.আই.এ-র লোক বলে সন্দেহ করি, আমাদের দোষ দিতে পারেন না।’ রানার রাগ এখনো কমেনি।

অসহায় ভঙ্গিতে সোহেলের দিকে তাকালেন বারকেইনহেইমার, চোখে সাহায্যের আবেদন।

সোহেল নির্লিপ্ত, চুপ করে থাকলো।

‘সত্যি কথা বলতে কি, গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে,’ ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বললেন এইচআরসি কর্মকর্তা। ‘মি. ডাচ জর্জ যে এ-ধরনের কিছু করতে পারেন, আমি ভাবতেই পারছি না…।’

‘ভাবতে পারছেন না, কারণ আপনারা অনভিজ্ঞ,’ কঠিন সুরে বললো রানা। ‘আপনি নিশ্চয়ই এ-কথাও ভাবতে পারছেন না যে ইতিমধ্যে দশ-বারোটা সীমান্ত পেরিয়ে প্যাসিমভকে নিয়ে এমন একটা দেশে চলে গেছে জর্জ যে তাদের কোনো খবরই যোগাড় করা সম্ভব নয়, বা খবর যোগাড় করা সম্ভব হলেও সে-দেশের সরকার ওদেরকে বহিষ্কার করতে বা কারো হাতে তুলে দিতে রাজি হবে না?’

সোহেল জানতে চাইলো, ‘মুক্তিপণের শর্তগুলো কি, মি. বারকেইনহেইমার?’

‘দশ মিলিয়ন ডলার।’

‘নগদ?’

‘সার্টিফায়েড চেক, জেনেভার অটোব্যাংক-এর একটা নাম্বারড অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। কাল রাত দশটার মধ্যে।’

‘আর প্যাসিমভ?’

‘রোডস টাউনের কোথাও মুক্তি দেয়া হবে, আমরা তাঁকে খুঁজে নেবো।’

দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলো সোহেল, ‘আমরা মুক্তিপণ দেবো না। যা পারে করে নিক জর্জ। প্যাসিমভ ছাড়া আর কিছু নেই তার হাতে। ভদ্রলোকের কোনো ক্ষতি করবে সে, আমার বিশ্বাস হয় না। তাকে আমরা খুঁজে বের করবো, যেখানেই লুকিয়ে থাকুক। জিম্মির বদলে খুব বেশি হলে নিজের স্বাধীনতা পেতে পারে সে, তার বেশি কিছু না।’

গম্ভীর মুখে ডেস্কের দেরাজ খুললেন বারকেইনহেইমার, একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিলেন সোহেলের দিকে। ‘আমার ভয়, অতো সহজ নয় ব্যাপারটা, মি. আহমেদ। আজ সকালের ডাকে পেয়েছি এটা, ব্ল্যাকমেইলারের চিঠি। পড়ে দেখুন, প্লিজ।’

টাইপ করা কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সোহেল আর রানা। পড়া শেষ হতে দৃষ্টি বিনিময় করলো ওরা। ‘এতে বলা হয়েছে, এই একই মেসেজের একটা করে কপি আমেরিকান ও রাশিয়ানদের কাছেও পাঠানো হয়েছে,’ বারকেইনহেইমারের দিকে ফিরে বললো সোহেল।

‘ঠিক তাই।’

‘চতুর শিয়াল! আমেরিকান ও রাশিয়ানরাও জানে, এইচআরসি-কে একই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবটা যে-কোনো

এক পক্ষকে দেয়া হলে সময় ক্ষেপণের কথা ভাবা যেতো। কোনো পক্ষই এখন আর সে-ঝুঁকি নিতে পারবে না। তিন পক্ষেরই ভয়, প্রতিপক্ষ না পুরস্কারটা ছিনিয়ে নেয়। পরস্পরকে আমরা বিশ্বাস করি না, এই অবিশ্বাসটাকেই কাজে লাগাচ্ছে জর্জ।'

'তারপর, প্যাসিমভ মুক্তি পেলে,' বললো রানা, 'নতুন আরেক প্রতিযোগিতা শুরু হবে-কারা তাঁকে আগে খুঁজে পায়।'

বারকেইনহেইমার বললেন, 'এ অতি জঘন্য কাজ! অন্যায়, অসৎ এবং নিন্দনীয়।'

'চিঠিটা অন্তত একটা রহস্যের সমাধান এনে দিয়েছে,' বললো রানা। 'এখন বুঝতে পারছি, কেন কর্নেল রুস্তমভকে অতো খুশি খুশি লাগছিল। প্যাসিমভকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, এই খবরটা মিশরে থাকতেই পেয়েছিল সে, নতুন নির্দেশে রোডসে এসে তদন্ত চালাতে বলা হয়েছিল তাকে। তার জানা ছিলো না যে কিডন্যাপাররা আমাদের সাথেও যোগাযোগ করেছে বা পরদিন সকালে করবে।'

'সেজন্যেই কি তোকে লোকটা খুন করেনি?' জানতে চাইলো সোহেল।

'হতে পারে। কিংবা তার তরফ থেকে ব্যাপারটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিলো। নিজের হাতে না মেরে খানিকটা দয়া দেখালো আমাকে। এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত সে।'

'তাহলে তো,' বললেন বারকেইনহেইমার, 'মি. প্যাসিমভকে কিডন্যাপাররা রাস্তায় ছেড়ে দিলে খুশিই হবে কর্নেল লোকটা, সত্যি যদি চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে সে।'

'আয়োজনটা করার পিছনে জর্জের উদ্দেশ্য হলো, পুরস্কার

নিয়ে কাড়াকাড়ি করবো আমরা, পালাবার সুযোগ হবে তার।' চোয়ালে হাত ঘষলো রানা। 'তবে তার আয়োজনে ত্রুটিও আছে। ছোট্ট, তবে আছে।'

'কি সেটা, রানা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো সোহেল।

'ত্রুটিটা হলো, কাল রাত দশটা পর্যন্ত জর্জকে রোডসের আশপাশে থাকতে হবে, প্যাসিমভকে মুক্তি দেয়ার জন্যে।'

বারকেইনহেইমার উৎফুল্ল হলেন না। 'মি. জর্জ এরই মধ্যে হয়তো রোডস ছেড়ে চলে গেছেন। মি. প্যাসিমভ খুন হয়েছেন কিনা তাই বা কে বলবে?' গলার ভেতর কথা আটকে যাওয়ায় বিষম খেতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর চেহারায় উদ্বেগ আর চোখে বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠলো। এরপর কথা বললেন চিৎকার করে, 'আপনারা বসে আছেন কি মনে করে? শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভিজবে? মুক্তিপণের টাকা দিয়ে মি. প্যাসিমভকে উদ্ধার করা উচিত আমাদের। দেরি করা হলে ভদ্রলোক মারা যেতে পারেন, বুঝতে পারছেন না?'

'কেন, রাশিয়ানরা যদি মি. প্যাসিমভকে ফিরে পায়, অসুবিধেটা কি?' হঠাৎ শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমি যতোদূর জানি, মি. প্যাসিমভ স্বদেশেই ফিরে যেতে চান।'

'অসম্ভব! তা আমরা হতে দিতে পারি না! এতো কাঠ-খড় পুড়িয়ে তাঁকে আমরা রাশিয়া থেকে বের করে আনলাম কি এইজন্যে?'

'আগেই বলেছি, আপনাকে আমরা সি.আই.এ-র চর মনে করলে দোষ দিতে পারবেন না।' হাসলো রানা। 'আচ্ছা, বলুন তো, প্যাসিমভকে নিয়ে ঠিক কি করতে চান আপনারা?'

'কেন, তাঁর জন্যে আমরা ইউরোপ বা আমেরিকায় নিরাপদ

আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবো। তিনি যেখানে থাকতে চান সেখানেই তাঁকে রাখবো...।'

'তারমানে, তিনি যা চান তাই হবে, এইতো? প্যাসিমভ নিজে আমাকে জানিয়েছেন, তিনি রাশিয়ায় ফিরে যেতে চান। এখন বলুন, এ-ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে?'

'তিনি তাই বলেছেন?' বারকেইনহেইমার যেন চুপসে গেলেন। 'সত্যি?'

'সত্যি।'

কয়েক সেকেণ্ড মাথা নিচু করে চিন্তা করলেন বারকেইনহেইমার। তারপর বললেন, 'বেশ, বুঝলাম, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন। কিন্তু, তারপরও, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। যেহেতু এইচআরসি তাঁকে রাশিয়া থেকে বের করে এনেছে, তিনি ফিরে যেতে চাইলে তাঁকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বটাও পালন করবো আমরা। আমরা তাঁকে কে.জি.বি-র হাতে তুলে দিতে পারি না, কিভাবে জানবো তারা তাঁকে পাওয়া মাত্র খুন করবে না?'

'আপনার সাথে একমত আমরা,' বললো রানা। 'সেজন্যেই ভাবছি, আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি। প্যাসিমভ সাধারণ কোনো মানুষ হলে আলাদা কথা ছিলো। বর্তমান দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের অন্যতম তিনি।'

'কিন্তু মুক্তিপণের টাকা? অতো টাকা যোগাড় করা এইচআরসি-র পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কে.জি.বি-র পক্ষে অসম্ভব নয়,' বললো রানা। 'কাজেই আমরা ধরে নিচ্ছি, টাকাটা তারাই দেবে।'

‘কিন্তু যদি না দেয়?’

‘এটুকু ঝুঁকি নিতে হবে আমাদের,’ বললো রানা। ‘যদি দেয়, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে, কে আগে খুঁজে বের করতে পারে নিকোলাই প্যাসিমভকে।’ সোহেলের দিকে ফিরলো ও। ‘এখানে অন্তত আরো দু’জন লোক লাগবে, সোহেল। রাশিয়ানদের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখা দরকার।’

বারকেইনহেইমার এখনো সংশয়ে ভুগছেন। ‘কিন্তু, ধরুন, কে.জি.বি. টাকা দিলো, কিন্তু মি. জর্জ মি. প্যাসিমভকে মুক্তি দিলো না? তখন কি হবে?’

‘জর্জ ছেড়ে দেবে তাঁকে,’ বললো রানা।

‘কি করে জানলেন আপনি?’

‘জর্জকে আমি চিনি। নগদ নারায়ণের ভক্ত সে। অভাব তার লেগেই আছে। আরো বড় কারণ, রাশিয়ানদের সাথে বেঈমানী করার সাহস তার নেই। টাকা পেয়ে প্যাসিমভকে যদি না ছাড়ে, রাশিয়ানরা ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে, এটা সে খুব ভালো করেই জানে।’

এয়ারপোর্টে যাবার পথে রানাকে লিফট দিলো সোহেল। ‘মি. প্রেসিডেন্টের অনুগামী দলের সাথে আজ রাতে আমার দেখা করার কথা, বনে,’ বললো সে। ‘এখানকার পরিস্থিতি তোকেই সামলাতে হবে।’

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। একবার জ্বলার পর নিভে গেল স্ট্রীট ল্যাম্পগুলো, তারপর আবার জ্বললো। পশ্চিমের আকাশে এখনো খানিকটা লালচে আভা লেগে রয়েছে। পুরনো শহরকে ঘিরে থাকা উঁচু পাঁচিল ম্লান আকাশের গায়ে ভূতুড়ে আর রহস্যময় লাগলো।

‘প্রেসিডেন্টকে আমার ধন্যবাদ দিবি,’ বললো রানা।

‘এথেন্সে যাত্রাবিরতির সময় রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করবো,’ বললো সোহেল । ‘সাযযাদ আর নাঈম, চন্দন টিম লিডার, তোকে রিপোর্ট করবে। তবে দায়-দায়িত্ব সব তোর।’

‘ঠিক আছে, তবে কমাণ্ডপোস্ট আগলে থাকার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।’

‘জানি, তোকে দৌড়-ঝাঁপ করতে হতে পারে।’

‘আরেকটা কথা, ওরা যেন একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আমার সাথে যোগাযোগ না করে।’

‘ঠিক আছে।’

মিউনিসিপ্যাল পার্কে ফেরিওয়ালারা দম্পতিদের ঘিরে ধরেছে, ফুল বা চীনাবাদাম না কিনলে পরিত্রাণ নেই। কয়েক মুহূর্ত পর রানার হোটেলের সামনে থামলো মার্সিডিজ। ছোট্ট চৌরাস্তাটায় প্রচুর লোকজন, কৃত্রিম ঝর্নার চারধারে বসে আছে আড্ডাবাজ যুবকরা, সুন্দরী মেয়ে দেখলে কেউ শিস দিচ্ছে, কেউ হাত দিয়ে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে শার্টের কলার বা মাথার চুল।

‘এরপর কি করবি তুই?’ জিজ্ঞেস করলো সোহেল। তাকিয়ে আছে হোটেলে প্রবেশপথের দিকে।

‘রঁদেভো হোটেলে ফোন করবো, খোঁজ নেবো মিলি পুলটিস কাজে ফিরে এসেছে কিনা। ওখানেই গান গায় সে।’

‘মেয়েটা হয়তো দরকারী অনেক কথা জানে,’ বললো সোহেল।

গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করলো রানা, কথা বললো জানালার দিকে ঝুঁকে, ‘ইন্টারকনের ক্যাসিনোতেও যাবো আমি।

ডাচ জর্জের একটা আড্ডা ওটা, ওখানে তার অনেক বন্ধু-বান্ধবও আছে।’

‘সাবধানে থাকিস, রানা।’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা। হাসলো, ‘রাস্তা পেরোবার সময় দুই দিক দেখে নেবো, গাড়ি ঘোড়া…’

মার্সিডিজ চলে যাবার পর প্রথম যেটা লক্ষ করলো রানা, নাবিকের ডেনিম পরা পেশীবহুল লোকটা রাস্তার ওপারে ফুটপাত ধরে হাঁটছে, সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে।

পরমুহূর্তে শিরদাঁড়ায় অনুভব করলো গান মাজলের কঠিন ধাতব স্পর্শ।

তিন

‘মাফ করবেন। দয়া করে গাড়িটায় উঠবেন, মি. রানা?’ অস্ত্রের পিছনে ভারি গলাটা টান টান, চাপা।

সোহেলের মার্সিডিজ এইমাত্র চলে গেছে, খালি জায়গাটায় আরেকটা মার্সিডিজ এসে দাঁড়ালো। গাঢ় নীল এটা। রানার মনে হলো, এই গাড়িটাকেই বোধহয় কোস্টাস অ্যারোনাফিসের ভিলার কাছে দেখেছিল ও। দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঢোকার কোনো ইচ্ছে নেই রানার। ‘কি ব্যাপার? কঠিন সুরে জানতে চাইলো ও। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলো চাষীর মতো দেখতে অস্ত্রের পিছনে লোকটা আর

কেউ নয়, লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি। কে.জি.বি-র আরেক লোক জাগোরস্কির পিছন থেকে আসছে। তৃতীয় একজন বসে আছে মার্সিডিজের ব্যাক সীটে। ডেনিম পরা লোকটা রাস্তা পেরুচ্ছে। ড্রাইভারকে নিয়ে ওরা পাঁচজন। রানা একা।

'কথা পরে হবে, মি. রানা। দয়া করে গাড়িতে উঠুন। প্লিজ।'

পাঁজরে আগ্নেয়াস্ত্রের খোঁচা নিয়ে ইতস্তত করছে রানা, মুখের ভেতরটা তেতো লাগছে। চারদিকে হাঁটাচলা করছে প্রচুর লোকজন, তবে অস্ত্রটাকে আড়াল করে রেখেছে জাগোরস্কির পিঠ আর গাড়িটা। কেউ অস্থির নয়, কাজেই পথিকরা ওদেরকে একটা দল বলে মনে করছে। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে তীরবেগে ছুটে গেল একটা মোটর স্কুটার।

বন্দী হতে না চাইলে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে রানাকে।

ওর শরীর কোমরের কাছে মোচড় খেলো, হাত ঝাপটা দিয়ে পলকের জন্যে অস্ত্রটাকে আরেক দিকে সরিয়ে দিলো ও, তারপর জাগোরস্কির কব্জি ধরে তারই হাঁটুর ওপর সজোরে বাড়ি মারলো। রানার এতো কাছাকাছি দাঁড়ানো উচিত হয়নি তার, যদিও সেটা কে.জি.বি-র সমস্যা। ভোঁতা ম্যাকারভ পিস্তল ডিগবাজি খেতে খেতে ছুটে গেল একদিকে, সেই সাথে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো জাগোরস্কি। কংক্রিট রাস্তার ওপর পড়ে পিছলে আরো খানিক দূর সরে গেল অস্ত্রটা। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কে.জি.বি. এজেন্টের দিকে মনোযোগ দিয়েছে রানা, জাগোরস্কির পিছনে রয়েছে সে। আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা, কোটের ভেতরে হাত ঢোকালো। তার দুই ঊরুর সন্ধিস্থল লক্ষ্য করে লাথি চালালো রানা, প্রতিপক্ষ স্যাঁৎ করে একপাশে সরে যাওয়ায় ব্যর্থ হলো সেটা। ফোঁস করে

নিঃশ্বাস ফেলে চরকির মতো ঘুরলো জাগোরস্কি, ধাক্কাটা পেটে গ্রহণ করলো রানা, কোমর ঝাঁকিয়ে মার্সিডিজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে সাহায্য করলো জাগোরস্কিকে। জাগোরস্কি গাড়ির গায়ে পিঠ দিয়ে পড়েছে দেখে সরাসরি তার নাক বরাবর ঘুসি চালালো রানা, অরক্ষিত নাকটাকে আক্ষরিক অর্থেই সমতল করে দিলো ও। দ্বিতীয় লোকটাকে নিরস্ত্র করার জন্যে মরিয়া হয়ে ঘুরলো, কিন্তু মনে হতাশা আর শরীরে শিরশিরে একটা ভাব নিয়ে অনুভব করলো, হেরে গেছে ও।

আরেকটা ম্যাকারভ অটোমেটিক লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দুই চোখের মাঝখানে।

এতোই পরিষ্কার একটা দৃশ্য, মুহূর্তটি হতভম্ব করে দিলো রানাকে। গান ব্যারেলের ভেতর কুৎসিত গভীরতা, উত্তেজনায় অধীর চ্যাপ্টা মুখটা যেন ভেঙচি কাটছে, পুরু ঠোঁট দুটো ভেতর দিকে ভাঁজ হয়ে ঢেকে দিয়েছে দু'সারি দাঁত।

পরমুহূর্তে পেশীবহুল একটা হাত ক্ষিপ্র সাপের মতো ছোবল মারলো, সেই সাথে প্রকাণ্ড একটা মুঠোর ইস্পাতকঠিন গিঁটগুলো থেঁতলে দিলো মুখটাকে।

মুঠোটার মালিক ডেনিম পরা লোকটা, যাকে ভুল করে ওদের দলের লোক বলে ভেবেছিল রানা...।

কে.জি.বি. এজেন্টের পতন ঘটলো যেন একটা ট্র্যাপ-ডোরের ভেতর দিয়ে। গাড়ির ভেতর থেকে অপর লোকটা চিৎকার করে কি যেন বললো, ক্যাঙ্গারুর মতো লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল রানা। সিকি সেকেণ্ড পর গাড়ি থেকে ভোঁতা আওয়াজ হলো, বেরিয়ে এলো একটা বুলেট।

রাস্তার ওপর কনুই আর হাঁটু দিয়ে ধীরগতিতে লাটিমের মতো ঘুরছে জাগোরস্কি, অস্ত্রের খোঁজে এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছে। রাস্তায় পিঠ দিয়ে পড়ে আছে দ্বিতীয় কে.জি.বি. এজেন্ট, বাতাস টেনে বুক ফুলিয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে পাশ ফিরলো সে, ঢিলে হয়ে থাকা একটা চোয়ালে হাত বুলিয়ে সাড়া পাবার চেষ্টা করছে। ফুটপাতের সচল ভিড় যেন কড়া ধমক খেয়ে স্থির পাথর হয়ে গেছে।

ছুটলো রানা, একটা কোণ ঘুরলো, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো। প্রকাণ্ডদেহী লোকটা দৌড়াচ্ছে না বলে লাফাচ্ছে বলাই ভালো, চোখের নিমেষে রানার পাশে চলে এলো সে। কে.জি.বি. এজেন্টদের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'আগের জন্মে কি যেন বলেছিলে নামটা?' জিজ্ঞেস করলো ও, ইংরেজিতে।

ফ্যাচ-ফ্যাচ শব্দ হলো, প্রকাণ্ডদেহী লোকটা হাসছে। 'মনির,' বললো সে, বিশুদ্ধ বাংলায়। 'মনির হোসেন। চলুন, স্যার, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি।'

তাজ্জব বনে গেছে রানা। 'দাঁড়াও হে, এক মিনিট,' বলে মনির হোসেনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো ও। 'তুমি…তুমি বাঙালী?'

রানাকে বাংলা বলতে শুনে হাঁ হয়ে গেল বিশালদেহী মনির হোসেন।

'স্যার, আ-আপনিও তাহলে…ইয়া গাফুরুর রহিম!'

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখলো, মার্সিডিজ থেকে লাফ দিয়ে নামলো ড্রাইভার, তার পিছু পিছু ব্যাক সীটের লোকটা। দু'জন মিলে ধরাধরি করে আহত লোকটাকে গাড়িতে তুললো। পরমুহূর্তে

ছুটলো মার্সিডিজ, সামনের খোলা দরজা লক্ষ্য করে লাফ দিলো জাগোরস্কি।

‘ওরা আপনাকে ধরার জন্যে এলো না কেন, স্যার?’ জিজ্ঞেস করলো মনির হোসেন, এখনো সশব্দে হাঁপাচ্ছে সে।

‘আমার মতো ওরাও পুলিশের হাতে পড়তে চায় না,’ বললো রানা। ‘কপাল মন্দ ধরে নিয়ে সুযোগ থাকতে পালাচ্ছে।’ মিশরে থাকতে ওরা যে ভুল করেছে তা বুঝতে পেরেছে কে.জি.বি. এজেন্টরা, সেটা সংশোধনের জন্যে ফাঁদ পেতেছিল। আবার ওরা ওকে ধরার জন্যে ফিরে আসবে, জানে রানা। বড় করে শ্বাস টেনে মনির হোসেনের দিকে ফিরলো ও, খুঁটিয়ে লক্ষ করলো তাকে।

‘স্যার, ওরা কি রাশিয়ান?’

‘শুধু রাশিয়ান হলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম,’ বললো রানা। ‘রাশিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওরা, কে.জি.বি-র রুস্ত মভ গ্রুপ।’ হঠাৎ খেয়াল হলো রানার। ‘তুমি জানলে কিভাবে?’

আবার সেই অশ্লীল ফ্যাচ-ফ্যাচ শব্দ করে হাসলো মনির হোসেন। ‘আমি অনেক কিছু জানি, স্যার।’

‘তোমার পরিচয় কি? আমার পিছু নিয়েছিলে কেন? আমাকে সাহায্যই বা করলে কি মনে করে?’

‘আপনি, স্যার, মাসুদ রানা।’ সবজান্তার হাসি ফুটলো মনির হোসেনের মুখে।

‘তুমি আমাকে চেনো?’

‘জ্বী, স্যার।’

‘কে তুমি?’

গোল মুখ থেকে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঘাম মুছলো মনির

হোসেন। 'আমার আসল পরিচয়–বাঙাল ও কাঙাল, স্যার। ভুখা মানুষ। টাকার জন্যে হন্যে হয়ে আছি। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে চুরি তো আর করতে পারি না। দেশের নাম ডুববে। কিন্তু, স্যার, যদি জানতাম আপনি আমার দেশী…।'

'বেশি কথা না বলে নিজের পরিচয়টা দাও,' বিরক্তির সাথে বললো রানা ।

'বিক্রি করার মতো একটা গল্প আছে আমার কাছে, স্যার,' বললো মনির হোসেন, গম্ভীর। 'আপনি আগ্রহের সাথে শুনতে চাইবেন।'

তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো রানা।

'আপনি হোটেলে ফেরেন কিনা দেখার জন্যে দু'দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম, স্যার। আপনি এলেন ঠিকই, কিন্তু সাথে ফাঁপা আস্তিন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোক আপনার কাছ থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। কে উনি, স্যার?'

'তুমি চিনবে না,' বললো রানা।

'আমার আর দেরি করতে ভালো লাগছে না, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আসুন, স্যার।'

ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করলো মনির হোসেন, ম্যানড্রাকি স্ট্রীটের দিকে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে তার পিছু নিলো রানা।

ঢাল বেয়ে প্লাটিয়া সিমিস-এ এলো ওরা, গথিক খিলানওয়ালা অস্ত্রাগারটাকে পাশ কাটালো, খিলানগুলোর মসৃণ করা পাথর কৃত্রিম আলোয় চকচক করছে। ভ্রমণ বিলাসীরা ঘুর ঘুর করছে

চারপাশে, চাপাকণ্ঠে বিস্ময়ধ্বনি, যেন ভয় পাচ্ছে জোরে কথা বললে প্রাচীন দেবতাদের ঘুম ভেঙে যাবে–যীশুর তিনশো বছর আগে তৈরি একটা মন্দিরের উঠনে তাঁদের মূর্তিগুলোই শুধু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ডানদিকে সাইমি গেট, ভেতরে তাকালে বাণিজ্যিক বন্দরের খানিকটা দেখা যায়, সে-যুগে নাম ছিলো এমবোরিয়ো, চারদিক থেকে দুর্গপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পাইরিয়াস থেকে আসা বেশিরভাগ জাহাজ আর নৌকো ওখানেই নোঙর ফেলতো। সাদা একটা লাইনার রয়েছে এই মুহূর্তে, কয়েকশো পোর্টহোল থেকে আলোর আভা বেরিয়ে আসছে।

হন হন করে ফ্রিডম গেট পেরিয়ে এলো ওরা। কেউ কোনো কথা বলছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা। উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছু চোখে পড়লো না।

রানাকে আকটি বুবুলা-র দিকে নিয়ে যাচ্ছে মনির হোসেন। প্রকাণ্ড বাঁধের ওপর উঠে এলো ওরা, ম্যানড্রাকি হারবারের সাগরমুখী দিকটাকে এই বাঁধই রক্ষা করছে। রানাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল মনির হোসেন। রানার চেহারায় বিস্ময় লক্ষ্য করলো সে। রানা দেখলো, সামনে কিছু নেই, আছে শুধু তিনটে প্রাচীন উইণ্ডমিল আর ফোর্ট সেইন্ট নিকোলাস, মাথায় লাইটহাউসের খুদে আলোটা জ্বলজ্বল করছে।

পুরনো শহর পিছনে ফেলে আসায় বাতাসে শীত শীত ভাব রয়েছে, বাঁধের নিচে নোঙর ফেলা কয়েকটা লঞ্চ আর স্টিমার দেখা গেল। হারবারের পানিতে আলোর প্রতিফলন চোখ-ধাঁধিয়ে দিলো ওদের।

দূরের কয়েকটা তাঁবু আকৃতির কাফে থেকে গান-বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে।

হাঁটার গতি এক সময় কমিয়ে আনলো মনির হোসেন, রানা পাশে আসার পর বললো, 'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পাগল ভাবছেন, স্যার। ভাবছেন, এদিকে কেন নিয়ে এলাম আপনাকে। গল্পটাই সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করবে, স্যার। জায়গাটা আপনার নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না?'

'আমি অপেক্ষা করছি,' হাঁটতে হাঁটতে বললো রানা। 'রাশিয়ানদের কথা তুমি কোত্থেকে জানলে?'

'সবই সময় মতো জানতে পারবেন, স্যার। সবই তো আমার গল্পের অংশ। বিড়ালের ভাগ্যে যেমন শিঁকে ছেঁড়ে, তেমনি আমার ভাগ্যেও ছিঁড়েছে, দু'দিন অপেক্ষা করার পর আপনার দেখা পেয়েছি।'

'আমি ফিরে আসতে পারি, এ-কথা তোমার মনে হলো কেন?'

'হোটেলের রেজিস্টার দেখে। আপনি বিল মেটাননি। ডেস্ক ক্লার্ককে অল্প কিছু ড্রাকমা ঘুষ দিয়ে আপনার নামটাও আমি জেনে নিই।' বাঁধের কিনারা থেকে নিচের দিকে থুথু ফেললো সে। 'তা, স্যার, দেশে আপনার কে কে আছেন? শাদী করেছেন?'

'ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাক,' বললো রানা। 'গল্পটা কি শোনাও দেখি এবার। আমার কথা তুমি জানলে কিভাবে।'

থামলো মনির হোসেন, রানার দিকে ফিরলো। 'মেয়েটা সুন্দরী, স্যার। নাম...মিলি...পুলটিস। আপনি তাকে চেনেন, তাই না?'

বিস্মিত হলো রানা। কিছু বললো না ও। চিন্তা করছে।

'গ্রীক মেয়ে, দেবীর মতোই দেখতে, কিন্তু ভারি ছটফটে। বেশ লম্বা, চোখ ফেরানো যায় না।' ফ্যাচ-ফ্যাচ করে কুৎসিত হাসলো মনির হোসেন। 'সেক্সি।'

'কোথায় সে?' চাপা গলায় গর্জে উঠলো রানা। নিচের ঠোঁট একবার কামড়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো মনির হোসেন। 'যেখানেই থাকুক, এ-জীবনে আপনাকে দেখতে পাবে বলে আশা করছে না…।'

'দেখতে চায় না বলে, নাকি…?'

'তার ধারণা, নির্ঘাত আপনি মারা গেছেন, স্যার। পাঁচমনের সাথে তাকে আমি কথা বলতে শুনেছি…নামটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারি না, স্যার।'

রানার হার্টবিট অকস্মাৎ বেড়ে গেল। 'প্যাসিমভ। তাকে দেখেছো তুমি?'

'বুড়ো একদম বোবা সেজে আছে, স্যার। আহ্, স্যার, কি যত্ন! শেষ বয়েসে অমন সুন্দরী যদি পাই, স্যার, আমিও আরামে চোখ বুজে পড়ে থাকবো।'

'প্রথম থেকে শুরু করো,' বললো রানা, নির্দেশের সুরে।

'প্রথম থেকে? ঠিক আছে। এক হপ্তার মতো হবে, পাথরের স্ত ূপে আটকা পড়ে ছিলাম আমি, স্যার। আমাদের জাহাজ কোম্পানী…।'

'জাহাজ? নেমিসিস?' দ্রুত জানতে চাইলো রানা।

'কি?'

'তোমাদের জাহাজের নাম নেমিসিস?'

'না। তা কেন হবে? নাইট স্টার, স্যার। পানামায় রেজিস্ট্রি করা। যাই হোক, ক্যাপটেন আমাদেরকে জানালো, কোম্পানী

লালবাতি জ্বেলেছে। আমাদের বেশিরভাগ ক্রুকে বেতন ছাড়াই তীরে নামিয়ে দেয়া হলো। এরকম যে মাঝে-মধ্যে ঘটে না, তা নয়। অল্প কয়েকজন ক্রু নিয়ে জাহাজটা ফেরত গেল মার্সেলেস-এ। পকেটে বেশি টাকা নেই যে ভালো কোনো হোটেলে উঠবো বা ঘুষ দিয়ে আরেক জাহাজে কাজ জুটিয়ে নেবো। দেশে ফেরার তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই ওদিকের ওই উইণ্ডমিলে ঠাঁই নিলাম।'

অন্ধকারের ভেতর অস্পষ্ট কাঠামোটার দিকে হাত তুললো মনির হোসেন। 'তারপর, স্যার, তিন দিন আগে, হঠাৎ করে হাজির হলো উইণ্ডমিলে। মিলি, পাঁচমন, থুড়ি, প্যাসিমভ, আর ডাচ জর্জ নামে এক লোক। তখনও ভোর হতে দেরি আছে, স্যার...।'

ভালো করে উইণ্ডমিলটা দেখার চেষ্টা করলো রানা, মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দরজা বা নিঃসঙ্গ চৌকো জানালা দিয়ে বাইরে কোনো আলো আসছে না। 'তারা কি এখনো ওখানে আছে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো ও।

'না। তবে কোথায় আছে আমি জানি...মানে, আন্দাজ করতে পারি। আপনি ওদের খোঁজ পেতে চান, স্যার?'

'চাই।'

'খরচা আছে, স্যার।'

নামগুলো ঠিক বলেছে লোকটা, ভাবলো রানা। সন্দেহ নেই, আরো কিছু জানে সে। 'টাকা পাবে,' বললো ও। 'কিন্তু বিনিময়ে আমার উপকার হওয়া চাই।'

'আপনি আমার দেশী লোক, স্যার, আলোচনা করে একটা রফায় আসা যাবে,' বললো মনির হোসেন। 'কি জানেন, কথা

ছিলো ডাচ জর্জকে সাহায্য করবো আমি। সে আমাকে জানালো, রাশিয়ানরা প্যাসিমভকে ধরতে চায়, আমাকে তাদের পাহারাদার হিসেবে কাজ করতে হবে, দুই বা তিন দিন। পাঁচশো ডলার পাবো। বললো, আমাকে দেখতে হবে প্যাসিমভ যেন উইণ্ডমিল ছেড়ে বেরুতে না পারে। কারণ তাতে নাকি তার নিজেরই বিপদ হবে। আর, কেউ যদি এদিকে আসে, নয়-ছয় বুঝিয়ে তাদেরকে সরিয়ে রাখতে হবে।'

উইণ্ডমিলের সামনে চলে এলো ওরা। পাথরের বিশাল একটা ব্যারেল, মোচাকৃতি ছাদ। ভেতরে ঢুকে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালছে মনির হোসেন, ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা দীর্ঘ বাঁধের দিকে তাকালো রানা। কেউ ওদেরকে অনুসরণ করে আসছে না। মৃদু বাতাসে উইণ্ডমিলের খালি স্পারগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠলো। বন্দর থেকে ভেসে এলো বোটের হর্ন।

অজানা একটা আশংকা নিয়ে উইণ্ডমিলের ভেতর ঢুকলো রানা। মন থেকে অস্বস্তিবোধটা ঝেড়ে ফেললো ও, বগলের তলায় হাত দিয়ে ·৩৮-টার স্পর্শ নিলো একবার।

'প্যাসিমভ লোকটা কিন্তু, স্যার, হাবাগোবা নয়,' বললো মনির হোসেন। 'ডাচ জর্জ বেরিয়ে যেতেই আমার সাথে কথা বলার জন্যে মিলিকে পাঠালো সে। ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। মেয়েটা এসেই আমার সাথে রঙ-ঢঙ শুরু করলো। পুরুষমানুষ, স্যার, দেশে ফেলে এসেছি নতুন বউটাকে। ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই। জিজ্ঞেস করলো, আমি সিগারেট খাবো কিনা। তারপর দুটো সিগারেট ধরিয়ে আমার ঠোঁটে গুঁজে দিলো একটা। তারপর জানতে চাইলো, আমরা ওপর

তলায় যাবো কিনা? শুধু আমরা দু'জন, আর কেউ নয়।'

গা দুলিয়ে হাসলো মনির হোসেন। 'আপনি হলে লোভ সামলাতে পারতেন, স্যার? কিন্তু তারপর, সবেমাত্র তিন ফুট লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে জিভটা, আমাকে সতর্ক করে দিয়ে চিৎকার দিলো মেয়েটা। আমার ধারণা, শেষ মুহূর্তে ব্যাপারটা তার সহ্য হয়নি, পরিকল্পনাটা বাতিল করার সিদ্ধান্ত একাই নিয়ে ফেলে। প্রথম থেকেই জানতাম আমি, ওরা দু'জন একসাথে আছে। যাই হোক, ঘাড় ফেরালাম আমি, দেখলাম মদের একটা বোতল তুলে আমার মাথায় ভাঙতে যাচ্ছে প্যাসিমভ। বাধ্য হয়ে তার পেটে ঘুসি মারতে হলো। দেখুন না, বোতলটা ভেঙে গেছে।' পাথুরে মেঝেতে লাল রক্তের দাগ আর ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো দেখালো সে।

'কেন তোমার মনে হলো, প্যাসিমভকে সাহায্য করছে মিলি?' জানতে চাইলো রানা।

'মেয়েটা আমাকে সহ্য করতে পারছিল না। তার হাবভাব দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারি আমি। কিন্তু প্যাসিমভের প্রতি তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিলো, লোকটাকে কচি খোকা বলে মনে করে সে। সারাক্ষণ ফিসফাস ফিসফাস।' চেহারায় উদ্বেগ আর তিক্ততা নিয়ে প্রকাণ্ড মাথাটা দোলালো সে। 'পাঁচশো ডলার অবশ্যই আমার পাওনা হয়েছে।' রানার দিকে মুখ তুললো সে। 'কিন্তু টাকাটা আমি পাইনি, স্যার।'

'তুমি আশা করছো টাকাটা আমি তোমাকে দেবো?'

'যা শুনেছি, স্যার, বুঝতে অসুবিধে হয়নি প্যাসিমভ লোকটা খুব দামী কেউ হবে। আপনি তার খোঁজেই আবার ফিরে এসেছেন

রোডসে, তাই না, স্যার? হোটেলের সামনে এই ব্যাপারটা নিয়েই তো গণ্ডগোল বাধলো, ঠিক কিনা? রাশিয়ানরাও পাসিমভকে ধরতে চাইছে। তাকে ধরার জন্যে দরকার হলে আপনাকে খুন করতেও পিছপা হবে না ওরা।'

মনির হোসেনের ছোটো ছোটো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'বলে যাও।'

'আমার হিসেবে, স্যার, আমি যা জানি তার দাম পাঁচশো ডলারের অনেক বেশি।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে মনির হোসেন।

'আবার এক কানাকড়িও হয়তো নয়।'

'ধরুন, পাঁচশোর দ্বিগুণ?'

'কি করে বলি, কি জানো তাইতো এখনো শুনিনি।'

'ঠিক আছে, নয়শো ডলার। স্যার?'

'হতে পারে, তোমার তথ্যটা যদি নিরেট হয়।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিশাল ছাতিটা ছোটো করে আনলো মনির হোসেন। 'শালার বিদেশীদের সাথে হাত মেলাবার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না, স্যার।'

'কিন্তু তুমি তাদের শর্তে রাজি হয়েছিলে,' বললো রানা।

'গলাটা শুকিয়ে গেছে, স্যার। চলুন, ওপরতলায় গিয়ে কথা বলি। ওখানে একটা বোতল আছে।'

মনিরের হাতে লণ্ঠন, তাকে অনুসরণ করলো রানা। ও লক্ষ করলো, আলোর বেশিরভাগটাই আড়াল করে রেখেছে সে। শরীরটা বিশাল। বুদ্ধিশুদ্ধি বোধহয় সে-অনুপাতে যথেষ্ট নয়। তবে উদ্দেশ্যটা পরিষ্কারই বলা যায়। আটকে পড়া একজন নাবিক, তার

টাকা দরকার…।

ঠাণ্ডা, ফাঁপা একটা অনুভূতি রানার বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়লো দ্রুত।

তার টাকা দরকার…

এখনো যে লোকটা ডাচ জর্জের হয়ে কাজ করছে না, তার প্রমাণ কি? কি প্রমাণ আছে, প্যাসিমভ কিডন্যাপিঙে তারও একটা ভূমিকা নেই? রাশিয়ানদের হাত থেকে রানাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে সে, লোভ দেখিয়ে এখানে আনার জন্যে নয় তো? আসার পথে একটু একটু করে টোপ ফেলেছে সে, ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'একটা তথ্য দিয়েছে, রানা যাতে ফাঁদটা টের না পায়।

ফাঁদ!

উইণ্ডমিলে ঢোকার মুহূর্ত থেকে অস্বস্তিবোধটার কারণ উপলব্ধি করতে পারলো রানা। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে প্রথম থেকেই সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা করছে।

চোখ তুলে ওপর দিকে তাকালো রানা, সিঁড়ির ধাপগুলো ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ধাপগুলো টপকালো রানা। একটা বাঁক ঘুরলো ওরা। সামনের ধাপগুলোর মেঝেতে স্তুপ করা রয়েছে কাঠ আর লোহার যন্ত্রপাতি, কিছু পাথর। মেঝেতে এক ইঞ্চি খালি জায়গা নেই। শেষ কয়েকটা সরু ধাপ পেরিয়ে উঠে গেল মনির। তার পিছু নিলো রানা, ডান হাতটা শিথিল করে রেখেছে, অস্ত্র ধরার জন্যে তৈরি।

ওপরতলার ঘরে উঠে এলো ওরা, এখানকার সেইল-পাওয়ারড ড্রাইভ শাফট প্রকাণ্ড পেগ-গিয়ার-এর সাথে সংযুক্ত, ওগুলোই নিচের পাথরগুলোকে ঘোরায়।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো রানা। কেউ নেই এখানে।

তাহলে অস্বস্তিবোধটা দূর হচ্ছে না কেন?

লণ্ঠনের হলদেটে আলোয় আটফুটি একটা ফাঁক দেখলো রানা, ঘরটাকে দু'ভাগে আলাদা করেছে। মনির হোসেনের পেটমোটা ব্যাগটা পড়ে রয়েছে অপরদিকে। সস্তাদরের মদের বোতল আর ব্রাউন কাগজে জড়ানো খানিকটা রুটি আর পনিরও দেখতে পেলো রানা।

ফাঁকটার মাঝখানে একটা আট ইঞ্চি চওড়া তক্তা ফেললো মনির হোসেন, দুই হাত পরস্পরের সাথে চাপড়ে ময়লা ঝাড়লো। 'ওপারে পৌঁছে তক্তাটা সরিয়ে নিতাম, স্যার। ঘুমাচ্ছি, এই সময় কেউ যাতে উঠে এসে মাথায় লাঠি মারতে না পারে। যে-কোনো বন্দর শহরে নিজের ওপর আপনার নজর রাখতে হবে।'

কথাটা সত্যি। মনির হোসেনের সব কথার মধ্যেই সত্যির একটা ভাব আছে। রানা অনুভব করলো, পেশীগুলোর টান টান ভাব খানিকটা যেন কমলো।

সদ্য তৈরি সেতুর ওপর উঠলো মনির হোসেন, হাতে লণ্ঠন। তাকে অনুসরণ করলো রানা।

কাঁধের ওপর দিকে কথা বললো মনির হোসেন। 'আয়োজনটা ভালোই, কি বলেন, স্যার?'

উত্তর দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে গেল রানা, কিন্তু সুযোগ পেলো না।

পায়ের তলা থেকে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ উঠলো। মট করে ভেঙে গেল তক্তাটা।

'স্যার!' চিৎকার করলো মনির হোসেন।

রানা অনুভব করলো, খসে পড়ছে ও, তলপেট উঠে এসেছে মুখের কাছে, ওর চোখের নিচে লণ্ঠনের ঝাপসা আলোটা ঘুরছে। দেয়ালগুলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিলো রানা।

সশব্দে পড়ে চুরমার হয়ে গেল লণ্ঠনটা।

তারপর সব অন্ধকার।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরলো রানার। ধারণা করলো, নির্ঘাত নিজের বিছানায় শুয়ে আছে ও, স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে।

মনে হলো জ্বর আসবে, তা না হলে সারা শরীর ব্যথা করছে কেন? চারদিক থেকে কালো আয়না ঘিরে রেখেছে ওকে। কানে শব্দ ঢুকছে, সবই যেন প্রতিধ্বনি। ওর সচেতনতা যেন ভঙ্গুর–এই আছে, এই নেই।

স্থির কোনো একটা জায়গায় শুয়ে আছে ও।

চৌকাঠের সামনে হারবার, ভৌতিক বলে মনে হলো।

কিসের যেন একটা শব্দ হলো, পাথরের ওপর জুতোর ঠোঁট ঘষা খেলো। স্থির, অনড় থাকলো রানা। এতোক্ষণে বুঝতে পারছে, মনির হোসেনের ওপর পড়েছে ও, আর সেটাই ওর বেঁচে থাকার কারণ। ওপরতলার ঘরটার কথা মনে পড়লো, মনে পড়লো তক্তা আর পতনের কথা। কতোক্ষণ আগের ঘটনা? সময় সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই ওর। অজ্ঞান ছিলো এক মিনিট, না এক ঘন্টা?

সতর্কতার সাথে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জুতোর শব্দ।

চোখ বুজলো রানা। মনির হোসেন যে মারা গেছে, এ-ব্যাপারে ওর কোনো সন্দেহ নেই । ওর নিচে শরীরটা নিঃশ্বাস ফেলছে না,

হার্টবিটের কোনো লক্ষণ নেই।

বন্ধ চোখের পাতা ভেদ করে হলদেটে আলোর আভা লাগলো মণিতে, উৎসটা সম্ভবত টর্চ। জুতোর শব্দ একেবারে কাছে এসে থামলো। একটা হাত ওর কব্জি ছুঁলো, তুললো, তারপর ছেড়ে দিলো। আবার ধরলো।

খুনী।

রানার ওপর দিয়ে যা ঘটে গেছে, নিজেরই বিশ্বাস হয় না এক চুল নড়তে পারবে। তবে বাধা না দিয়ে খুন হতে রাজি নয় ও। কিছু একটা করতে হবে ওকে। মৃত্যু এড়াবার জন্যে কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে রানা। মনের কোণে সাহস আর ইচ্ছাশক্তি জড়ো করতে শুরু করলো ও।

ওর কব্জির নিচে শিরাটা খুঁজে নিলো খুনী। পালস পাবার চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে রানা।

ওর শক্ত মুঠো অবাক করে দিলো খুনীকে। তার হাতটা ধরেই মোচড় দিলো রানা, ব্যথায় ককিয়ে উঠলো লোকটা, টলে উঠলো। ভারসাম্য ফিরে পেলো সে, রানাও দাঁড়াতে গিয়ে অনুভব করলো ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। অন্ধকারের ভেতর রানার ডান হাত ছুটে গেল, আঘাত করলো একটা চোয়ালে, খপ করে ধরে ফেললো একটা কলার, মোচড় দিলো। ডান হাত দিয়ে লোকটার পেট আন্দাজ করে ঘুসি চালালো ও। ফুঁপিয়ে উঠলো আততায়ী, ঝুঁকে পড়লো নিচের দিকে। লোকটা পড়লো না, কারণ এখনো তার মোচড়ানো কলারটা এক হাতে ধরে আছে রানা। আবার ঘুসি মারার জন্যে ডান হাতটা...

'না!' আবেদন জানালো লোকটা।

উইণ্ডমিলের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়া ধূসর রঙা আলোয় এতোক্ষণে তার মুখটা দেখতে পেলো রানা।

ডাচ জর্জ।

চার

ঝুঁকে থাকা মূর্তিটার ওপর বাগিয়ে ধরা ঘুসি নিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা । বিস্ময়ের ঘোরটা দ্রুত কাটিয়ে উঠলো ও, রাগ আর ব্যথাগুলো থাকলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিলো ওকে।

লোকটাকে যতো জোরে পারা যায় আঘাত করলো রানা, সরাসরি মুখে । সংঘর্ষের আওয়াজটা সন্তুষ্টির পরশ বুলিয়ে দিলো মনে। পিছন দিকে ছিটকে গেল ডাচ জর্জ, মেঝের ওপর বসে পড়লো, দোমড়ানো টর্চের পাশে।

অবাধ্য পশুর মতো এক পলকে তার পাশে চলে এলো রানা, দু'হাত দিয়ে সমানে চালালো চড়-কিল-ঘুসি। চোখের সামনে ভাঁজ করা হাত দুটো তুলে নিজেকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ডাচ জর্জ। তার হাত দুটো এক ঝটকায় একপাশে সরিয়ে দিলো রানা।

'ফর গডস সেক...!' ফুঁপিয়ে উঠলো জর্জ।

পর পর আরো দুটো ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারালো সে।

সিধে হলো রানা, লাথি মেরে লোকটাকে খুন করার প্রচণ্ড ঝোঁকটাকে অনেক কষ্টে দমন করলো। এক পা পিছিয়ে এলো ও,

ক্রোধের লাগাম টেনে ধরেছে। সশব্দে হাঁপাচ্ছে ও। ঢোক গিললো, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছলো। ডাচ জর্জকে খুন করাটা বোকামি হয়ে যাবে, নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝালো ও । রুশ বিজ্ঞানীর খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত ওর কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

টলতে টলতে মনির হোসেনের দিকে এগোলো রানা। প্রথমবারই ঠিক ধরেছিল ও, লোকটার পালস নেই। নামমাত্র আলোয় দেখার তেমন কিছু নেই, যদিও যা দেখলো তাতেই বমি পেয়ে গেল রানার। দ্রুতগতি একটা গাড়ির উইণ্ড শীল্ড কারো মুখের ওপর বিস্ফোরিত হলে এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখা যায়।

অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ ঢুকলো কানে। ঘুরলো রানা। পেন্সিল টর্চের আলো ফেললো ডাচ জর্জের ওপর, উঠে বসার নির্দেশ দিলো।

বার দুয়েক কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হতে গিয়ে পারলো না জর্জ। এখনো সেই জাম্পসুট পরে আছে সে, নেমিসিসে ওঠার সময় যেটা গায়ে ছিলো। ভাঁজ বলে কিছু নেই, এখানে-সেখানে ময়লা লেগে রয়েছে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় উঠে বসলো সে। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। এক হাতের তালুতে ভর দিয়ে থাকলো সে, অপর হাত দিয়ে ঘাড়টা ডলছে। 'আমাকে মারা হলো কেন, নিশ্চয়ই তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে?' হাঁপাতে হাঁপাতে, অভিযোগের সুরে জানতে চাইলো সে ।

'নিকোলাই প্যাসিমভকে কিডন্যাপ করেছো তুমি। খুন করেছো মনির হোসেনকে,' ঠাণ্ডা, কঠিন সুরে বললো রানা, 'বেঈমানী করেছো আমার সাথে।'

‘রাবিশ!’ সজোরে নাক টানলো ডাচ জর্জ। টলমল করতে করতে নিজের পায়ে দাঁড়ালো সে। ‘অল রাবিশ!’

পিস্তলটা বের করলো রানা, পিস্তল ধরা হাতটা ঢিলেঢালাভাবে ঝুলিয়ে রাখলো ঊরুর পাশে। ‘আমাকেও তুমি প্রায় মেরে ফেলে-ছিলে…।’

‘ফর গডস সেক, থামবে তুমি?’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো জর্জ। ‘রাশিয়ানদের কীর্তি ওটা, বুঝলে! আমরা তিনজন এখানে ছিলাম–আমি, মিলি আর নিকোলাই প্যাসিমভ। মনির হোসেন আমাদেরকে সাহায্য করেছে। যেভাবেই হোক, রাশিয়ানরা ব্যাপারটা জেনে ফেলে। হয়তো হোসেনই…ঠিক জানি না।’ আঙুলের ডগা দিয়ে চোখ দুটো ডললো সে।

‘হয়তো মনিরই…কি?’

‘সেই হয়তো ওদের সাথে একটা চুক্তিতে আসে…কে.জি.বি-র সাথে।’

‘দু’মুখো সাপের ভূমিকা নিয়েছিল?’

‘তোমার সাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল সে, দেয়নি? অসুবিধে কি? গল্পটা রাশিয়ানদের শোনায় সে, রাশিয়ানরা দুর্ঘটনার আয়োজন করে, হোসেন যাতে আর কাউকে কিছু জানাবার সুযোগ না পায়। ভাঙা তক্তাটা আমি দেখেছি, রানা। নিচের দিকে করাত দিয়ে বেশ খানিকটা কেটে রাখা হয়েছিল।’

জর্জের কথায় যুক্তি আছে, ভাবলো রানা। যদিও ঠিক তাই ঘটেছে কিনা সন্দেহ। ‘মনির কি জানতো, প্যাসিমভ এখন কোথায় আছেন?’

‘আমার…আমার তা মনে হয় না। না, জানতো না। তবে

আরো অনেক কথা জানতো সে। জানতো, তিনি আমার কাছে আছেন। জানতো মিলিও ব্যাপারটার সাথে জড়িত।'

'প্যাসিমভকে কোথায় রেখেছো তোমরা?'

'তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি আমি,' বললো জর্জ।

'সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ।'

জর্জের ভাড়া করা ফিয়াটে চড়ে রওনা হলো ওরা। মাঝরাতই বলা যায়, শহর খালি হয়ে গেছে, লোকজন দেখা গেল শুধু ডিস্কো-বার আর নাইটক্লাবগুলোর সামনে।

পিস্তলটা কোলের ওপর রেখেছে রানা। 'উইণ্ডমিলে এলে কি মনে করে?' জানতে চাইলো ও।

'রোজই একবার করে তোমার হোটেলে খবর নিচ্ছিলাম, তুমি ফিরলে কিনা...,' শুরু করলো জর্জ।

'মনির হোসেনকে এড়িয়ে যাবার কারণ কি তোমার?' বাধা দিলো রানা। 'সে-ও তো হোটেলটার ওপর নজর রাখছিল। তার কাছে ঋণী তুমি, সেজন্যেই কি তাকে খুন করলে?'

'আ-আমি খুন করেছি...? তোমাকে না বললাম...,' বিস্ফোরিত হলো জর্জ।

'তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি,' বললো রানা। 'তবে কি বলতে চাও শোনা যেতে পারে।'

'সত্যি কথা বলছি, হোসেনকে দেয়ার মতো টাকা আমার কাছে ছিলো না...।'

'বলে যাও।'

'পরে অবশ্যই তার পাওনা মিটিয়ে দিতাম আমি...।'

‘কি বললাম শুনতে পাওনি ? আগে তোমার গল্পটা শেষ করো।’

গাড়ি ঘুরিয়ে হাইওয়ে ওয়ান-এ উঠে দ্বীপের পুব দিকে যাচ্ছে জর্জ। চাঁদের আলোয় ওদের ডান দিকে শিরদাঁড়ার আকৃতি নিয়ে পাহাড়শ্রেণী দেখা গেল। ‘হোসেনের সাথে আমার দেখা হয়নি, কারণ হোটেলে খবর নিয়েছি ফোনে। ম্যানেজার লোকটাকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি। হোসেন যে তোমার খোঁজ করছে, সে-ই আমাকে তা জানায়। আজও ফোন করি আমি, সন্ধ্যার দিকে। ওরা বললো, তুমি ফিরেছো, তবে স্যুইটে নেই। আরো বললো, হোসেনকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাজেই ভাবলাম, উইণ্ডমিলে একবার ঢুঁ মারলে হয়, সে হয়তো ওখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে।’

‘দেখা যাচ্ছে সব প্রশ্নেরই উত্তর তৈরি করা আছে তোমার।’

‘যা সত্যি তাই বলছি।’ বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটলো জর্জের ঠোঁটে। ‘পরিস্থিতিটা অদ্ভুত লাগছে আমার । অস্ত্রটা যদি সরিয়ে রাখতে, স্বস্তি বোধ করতাম।’

জবাব দিলো না রানা, অস্ত্রটাও সরালো না।

বাঁকা চোখে রানার দিকে তাকালো জর্জ, তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রানার কঠিন দৃষ্টি থেকে বাঁচলো। ‘বুঝি, আমাকে বিশ্বাস না করায় তোমাকে তেমন দোষ দেয়া যায় না। বিশেষ করে আমি যখন তোমাকে সুয়েজ ক্যানেলে ফেলে এসেছি। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছো, তোমার জন্যে অপেক্ষা করলে কি ঘটতে পারতো? সবাই আমরা কে.জি.বি-র হাতে ধরা পড়তাম, তাই না? সেটা কি ভালো হতো? তাছাড়া, আমার কোনো সন্দেহ

ছিলো না যে নিজেকে তুমি রক্ষা করতে পারবে। এসপিওনাজ জগতের অভিজ্ঞ হিরো, তোমাকে ঘায়েল করা কি এতো সহজ?'

রুডিনি পার্কের অন্ধকার প্রবেশ পথটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো গাড়ি। ওখানে প্রতি বছর ওয়াইন ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়, পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে। চাঁদের আলোয় পাশাপাশি অনেকগুলো ফোয়ারা, ফুলবাগান দেখা গেল ভেতরে।

'প্যাসিমভকে তুমি বারকেইনহেইমারের হাতে তুলে দাওনি কেন?' জানতে চাইলো রানা।

চোখা নাকের ভেতর থেকে বিদঘুটে একটা শব্দ বের করলো জর্জ। 'বারকেইনহেইমার? ওটাকে তো একটা গাধা বললেই হয়। প্যাসিমভের পেছনে রাশিয়ানরা লেগে আছে বুঝতে পেরে হিসেব করে দেখলাম, বারকেইনহেইমারকে দায়িত্ব দিলে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে সে, দ্বীপ থেকে ভদ্রলোককে নিরাপদে কোথাও সরানো তার কর্ম নয়। ভেবো না তোমাকে ফোলাচ্ছি, তোমার সাথে থেকে ইতিমধ্যে আমি শিখেছি এসপিওনাজ জগৎটা কি রকম ভয়ংকর। অনভিজ্ঞ, আনাড়ি লোক একদণ্ড টিকতে পারবে না এখানে।'

কোনো মন্তব্য করলো না রানা, পিস্তলটা আধ ইঞ্চি সরালো, নিঃশব্দে পেরিয়ে যেতে দিলো কয়েকটা মুহূর্ত। ড্যাশবোর্ডের আবছা আলোয় দেখলো, জর্জের ঠোঁট দু'একবার কাঁপলো। মিথ্যে কথা বলছে সে।

রানার দৃষ্টি অনুভব করে ব্যস্ততার সাথে বললো জর্জ, 'আমার মনে হলো, তুমি না ফেরা পযর্ন্ত প্যাসিমভকে লুকিয়ে রাখা দরকার, তাই রেখেছি আমি। এর মধ্যে দোষের কি হলো? তাকে আমি খুশিমনে তোমার হাতে তুলে দেবো।'

‘তা তো দেবেই,’ রানার গলা এতোই শান্ত যে ভীতিকর শোনালো।

‘ভদ্রলোককে দ্বীপ থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাওয়া যদি সম্ভব হয়, একমাত্র তোমার পক্ষেই তা সম্ভব, রানা,’ বলে পিছনের পকেট থেকে রুমাল বের করে সরু গোঁফে লেগে থাকা রক্ত মুছলো সে, লাল হয়ে ওঠা রুমালটা দেখলো।

মিলির কথা ভাবলো রানা, মনে পড়লো মনির হোসেন বলেছে, প্যাসিমভকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে মেয়েটা। তার ভূমিকা রহস্যময় হলেও, ব্যাখ্যার অতীত নয়। নিকোলাই প্যাসিমভের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে সে, কথাটা মনে পড়ায় বিস্মিত হলো না রানা। প্রথমে মেয়েটা সম্ভবত ডাচ জর্জের সাথে হাত মিলিয়েছিল। কিংবা হয়তো আসল ব্যাপারটা কখনোই আঁচ করতে পারেনি সে। একগাদা মিথ্যে কথা বলে নিজের অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করেছে জর্জ, সন্দেহ নেই। মিলিকে সম্ভবত বুঝতেই দেয়নি, ভদ্রলোককে কিডন্যাপ করেছে সে। মিলির কাছে গোটা ব্যাপারটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে আরো একটা কারণে, উদ্ধার পাবার পর প্যাসিমভ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, রাশিয়ায় ফিরে যেতে চান তিনি। মিলির ভূমিকা সম্পর্কে জর্জকে কিছু জিজ্ঞেস করার মানে হয় না, নিজের অপরাধ ঢাকার বা হালকা করার জন্যে সবার ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবে সে।

তবে, মিলি জোট বেঁধেছে নিকোলাই প্যাসিমভের সাথে। তার মানেই দাঁড়ালো, কে.জি.বি-কে সাহায্য করতে রাজি হবে সে।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানা, ‘তুমি যদি প্যাসিমভকে কিডন্যাপ না করে থাকো, টাকা দাবি করে বারকেইনহেইমারের কাছে চিঠি

লিখলো কে?'

'টাকা? চিঠি?' চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠলো জর্জের। 'আশ্চর্য! এ-সব কি বলছো তুমি? টাকা বা চিঠির কথা আমি তো কিছুই জানি না।' ঢোক গিললো সে। 'সব ফালতু কথা।'

'জানতাম, এই কথাই বলবে তুমি।' রানা শান্ত।

'যীশুর কিরে, আমার কথা বিশ্বাস করো,' আবেদনের সুরে বললো জর্জ। 'আমার ধারণা, কাউকে নিশ্চয়ই কিছু বলেছিল হোসেন।'

'তো কি হলো?'

'তারা হয়তো এতোটাই জানার সুযোগ পায় যাতে ভান করতে অসুবিধে হয়নি প্যাসিমভ তাদের হাতে আছে...।'

'এতে কাজ হবে না, আরেকভাবে চেষ্টা করো।'

চুপ করে থাকলো জর্জ। হাইওয়ে থেকে সরু একটা লেনে নেমে এলো ফিয়াট। দু'পাশে গাছের নিখুঁত সারি, লক্ষ করলো রানা। ওরা সম্ভবত একটা জলপাই বাগানের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। উঁচু-নিচু রাস্তার ওপর ঝাঁকি খেতে শুরু করলো গাড়ি। ডানা ঝাপটে জানালার পাশ দিয়ে উড়ে গেল একটা বাদুড়। জর্জের জাম্পসুটের ওপরের দিকটা ঘামে ভিজে গেছে।

আচমকা, ফিসফিস করে, অস্বাভাবিক শান্ত গলায় জানতে চাইলো সে, 'রানা, তুমি কি আমাকে খুন করবে?'

'আমি যদি তোমার কোনো ব্যবস্থা না করি, কে করবে?' লোকটার মন থেকে চাপ কমাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলো না রানা। আলোচনার সুরে আবার বললো ও, 'তোমাকে গ্রীক কোর্টে পাঠানোর উপায় নেই। পুরো কাহিনীটা তাহলে বেরিয়ে

আসবে–নাম, তারিখ, স্থান ইত্যাদি। আমাদের পেশায় এ-ধরনের ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'ঠাণ্ডা মাথায় তুমি আমাকে খুন করতে পারো না!'

'কাজটা করতে আমার ভালো লাগবে না, তবে পারবো।' প্রায় চমকে উঠে আবিষ্কার করলো রানা, হেডলাইটের শেষ মাথায় ওটা কোস্টাস অ্যারোনাফিসের ভিলা।

'সাক্ষী থাকবে, রানা মিলি আর নিকোলাই প্যাসিমভ,' বললো জর্জ।

'মিলি...সে এখানে?'

মাথা ঝাঁকালো জর্জ। 'প্যাসিমভের দেখাশোনার কাজে আমাকে সাহায্য করছে। আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, মিলিও সমান দায়ী।'

'চুপ করো তো।'

'আমাকে যদি খুন করো, তাহলে তোমাকে...।'

'বললাম না, চুপ!'

'প্যাসিমভ যদি আমার হয়ে সাক্ষী দেন...?' আকস্মিক উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলো জর্জ, গাড়ি থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করলো সে।

'বেরোও। আগে তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে,' বললো রানা। গাড়ি থেকে নেমে ফেলে আসা পথটার দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে চারদিকের আলো-আঁধারির ওপর চোখ বুলালো। ফিসফাস করছে গাছপালার পাতা। আকাশে মেঘ, মেঘের আড়ালে চাঁদ। দূরের আকাশে মিটমিট করছে তারা।

'ধরো এটা।' জর্জের হাতে পেন্সিল টর্চটা ধরিয়ে দিলো রানা, তারপর তার পিছু নিলো, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

গাছের ডাল থেকে পাকা একটা ফল পড়লো পিছনে কোথাও। কিচকিচ করে উঠলো একটা ইঁদুর । ভিলার নিচে, টেরেস আকৃতির বাগান আর সুইমিং পুলের সামনে ঈজিয়ান সাগর আছাড় খাচ্ছে পাথুরে সৈকতে । পুলের পানি যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ আর আকাশের প্রতিচ্ছবি।

ভিলার ভেতর কাঠ আর চামড়া পোড়া গন্ধ। মিশরীয় সারকফ্যাগাস-এর মাথা, গৌতম বুদ্ধের অমূল্য স্বর্ণমূর্তি, দেয়াল জুড়ে সাজানো প্রাচীন রোডিয়ান প্লেট—সব অদৃশ্য হয়েছে। স্ট্যাণ্ড আর শো-কেসগুলো খালি। অ্যারোনাফিসের বাড়ি থেকে মূল্যবান প্রতিটি জিনিস সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আয়না লাগানো দেয়াল ঘেঁষে এগোলো জর্জ, তাকে অনুসরণ করছে রানা। ফায়ারপ্লেসটাকে ছাড়িয়ে প্যানেল দিয়ে ঘেরা একটা চোরা-কুঠরিতে ঢুকলো ওরা। রানা ভাবলো, ভদ্রলোককে রাখা হয়েছে কোথায়? তবে কোনো প্রশ্ন করলো না। সাধারণ একটা আলোর সুইচে পেন্সিল টর্চের আলো ফেললো জর্জ, আঙুলের চাপে সেটাকে একপাশে সরিয়ে দেয়ার পর জানা গেল ভেতরে আরো একটা সুইচ রয়েছে, কালো।

'প্যাসিমভ আমার হয়েই কথা বলবেন, তুমি দেখো,' বললো জর্জ।

অপেক্ষা করছে রানা, ডান হাতে ধরা পিস্তলটাকে তৈলাক্ত বোঝার মতো লাগলো। গুঞ্জনটা অস্পষ্ট, প্রায় শোনা যায় না, প্যানেলের পিছন থেকে ভেসে এলো। তারপর হিস হিস শব্দে দু'ভাগ হয়ে গেল দেয়াল। ভেতরে একটা বড় আকারের এলিভেটর দেখলো রানা, বড় একটা খাট ফেলা যাবে ওতে।

'তাহলে এই পথেই পালিয়েছিল অ্যারোনাফিস, বাড়িটায় যখন আগুন দিলো ওরা,' বললো রানা। .৩৮ দিয়ে ইঙ্গিত করলো ও। 'তুমি আগে ঢোকো।'

'চমৎকার আয়োজন, কি বলো? কোম্পানীর ইলেকট্রিসিটির ওপর নির্ভর করে না। কল বাটন মনিটর করে ব্যাটারি চালিত একটা সার্কিট, সেটাই গ্যাসোলিন জেনারেটর চালু করে, জেনারেটর পাওয়ার সাপ্লাই দেয় এলিভেটরে।'

'তুমি জানলে কিভাবে?' এলিভেটরে পা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ডাউন' বাটনে চাপ দিলো জর্জ। 'অ্যারোনাফিস কিছুই আমার কাছে গোপন করেনি। নিজের ঢাক পেটাতে ভালোবাসে লোকটা।'

'তাই নাকি?'

হাসিখুশি হয়ে উঠলো জর্জ, যেন আচরণে স্বাভাবিক ভাব এনে মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করছে। বারবার পিস্তলটার ওপর নেমে এলো তার দৃষ্টি। 'আমি আর অ্যারোনাফিস ঠিক একই বৃত্তে বিচরণ করি না বটে, তবে আমাদের বৃত্ত দুটো পরস্পরকে ছুঁয়ে গেছে। বেশ কয়েক বছরের পুরনো সম্পর্ক। বিলাসবহুল ইয়টে মেজবান হিসেবে তার তুলনা মেলা ভার। মনে পড়ে, এক বছর হলো কি...।'

'কোথায় নামছি আমরা? কি আছে সেখানে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইলো রানা, থামতেই স্থির হয়ে গেল এলিভেটর।

খুলে গেল দরজা। চওড়া একটা করিডর দেখলো রানা। আলোগুলো সিলিঙের কাছাকাছি, আড়াল করা। শেষ মাথায় করোগেটেড মেটাল দিয়ে তৈরি দরজা, সাধারণত ওয়্যারহাউসে

দেখা যায়।

'এই পথে একটা জেটিতে যাওয়া যায়,' বললো জর্জ। 'অ্যারোনাফিসের ইয়ট ওখানেই রাখা হয়, যখন বাড়িতে থাকে সে। বাড়িটা বানিয়েছে পুরনো একটা দুর্গের জায়গায়। এক সময় এস্কেপ টানেল ছিলো, অ্যারোনাফিস এটাকে সোজা আর চওড়া করেছে। পাহাড়ের ভেতরটা ছিলো অসংখ্য টানেলের সমষ্টি, সবগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

হলুদ রঙ করা একজোড়া ফর্কলিফটকে পাশ কাটালো ওরা। সমতল মেঝে সহ কয়েকটা ফ্রেইট কার দেখা গেল, ছোটো ছোটো চাকায় রাবারের আবরণ। এ-সবই ভারি কার্গো বহনের কাজে লাগে।

বড় একটা ইস্পাতের দরজার দিকে এগোলো ওরা। 'প্যাসিমভকে এখানে নিয়ে আসার আগে মেইন করিডর বাদে আর কোনো দিকে ঢুঁ মারার সুযোগ আমার হয়নি। কি পেয়েছি শুনলে তোমার পেশার একজন লোক প্রশংসা না করে পারবে না।'

'আমার পেশার সাথে কি সম্পর্ক?'

'জিনিসটা আন্তর্জাতিক উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে।'

'কি জিনিস?'

'অস্ত্র, রানা। টন টন অস্ত্র । অ্যারোনাফিস আসলে একজন আর্মস ডিলার। লেন-দেন করে টেবিলের তলা দিয়ে। তার বাজারের নাম ব্ল্যাকমার্কেট।' দরজাটার সামনে থামলো জর্জ। 'কি ব্যাপার, তুমি তো অবাক হলে না?' একটা ভুরু কপালে তুললো জর্জ।

'জানা ছিলো। প্যাসিমভ কি এখানে আছেন?'

'তুমি দেখছি সব সময় এক ধাপ এগিয়ে থাকো!'

'দরজা খোলো,' নির্দেশ দিলো রানা।

'খুলছি, বাবা, খুলছি!' আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলো জর্জ। ছোট্ট একটা বাক্স খুলে ভেতরের লাল বোতামে চাপ দিলো সে, সশব্দে ওপর দিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল দরজা। আলো জ্বাললো সে।

ভেতরে কেউ নেই।

'কোথায় তিনি?' তীক্ষ্ণ, কঠিন সুরে জানতে চাইলো রানা। 'কোথায় রেখেছো তাঁকে?'

শুকনো, সাদা হয়ে গেল জর্জের চেহারা। 'যীশুর কিরে, রানা, তাঁকে আমি এখানে রেখে গেছি! কামরার ভেতর গাদা গাদা রাইফেল, কাঠের বাক্স, গ্রেনেড আর বাজুকা ছিলো...।'

জর্জ বিস্ময়ে স্তম্ভিত, বিস্ময়ের আড়ালে তার আসল চেহারাটা ঢাকা পড়ে গেছে। লোকটা মিথ্যে কথা বলছে কিনা ঠিক ধরতে পারলো না রানা। জর্জের অপরাধ সম্পর্কে ওর বিশ্বাসেও চিড় ধরতে শুরু করেছে। নিকোলাই প্যাসিমভ তাকে সমর্থন করবেন, বারবার কথাটা বলেছে সে। মিলিও প্যাসিমভের সাথে আছে, এ-কথা বলার সময় তার কণ্ঠ ও চেহারায় প্রত্যাশার ভাব ফুটে উঠেছিল। অথচ মুক্তিপণ দাবি করে লেখা চিঠিটা মিথ্যে নয়। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, জর্জই ওটা পাঠিয়েছে।

কামরাটার ওপর দ্রুত চোখ বুলালো রানা। গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে যথেষ্ট বড়। সিলিঙের সাথে অনেকগুলো আংটা ঝুলছে, সম্ভবত এক্সপ্লোসিভ রাখার ব্যবস্থা। 'তোমার সাথে পকেটনাইফ আছে?' হঠাৎ জানতে চাইলো রানা।

হাড়ের তৈরি হাতল সহ একটা ছুরি বের করলো জর্জ।

এক কোণে কয়েকটা বাক্স রয়েছে। বাক্সগুলো মোটা কর্ড দিয়ে বাঁধা, যেন ঢাকনিগুলো খোলার পর আবার ভালোভাবে লাগানো হয়নি। একটা একটা বাক্স বেছে নিয়ে কর্ডের বাঁধন কেটে ফেললো রানা, ভেতরে হ্যাণ্ডগ্রেনেড দেখা গেল। অন্তত এ-ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেনি জর্জ। কামরাটা অস্ত্র ও গোলা বারুদের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করতো অ্যারোনাফিস।

'শেষ কখন এখান থেকে বেরিয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আজ সকালে...মানে, কাল আর কি। সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে এখান থেকে। গোটা বাড়ি খালি করে...।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' থমথমে চেহারা নিয়ে কামরার চারদিকে আবার চোখ বুলালো রানা।

রুদ্ধশ্বাসে শুরু করলো জর্জ, 'অ্যারোনাফিস ফিরে এসেছিল। সমস্ত কিছু নিয়ে গেছে সে...মিলি আর প্যাসিমভকেও!'

পাঁচ

'কি করবে এখন তুমি?' রানার হাত আর পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো ডাচ জর্জ।

'কোথায় যেতে পারে অ্যারোনাফিস?' ঠাণ্ডা চোখ রানার, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জর্জের দিকে।

'যাবার জায়গা একটাই আছে, যদি গ্রীসে থাকে সে।'

'কোথায়?'

'তার হেডকোয়ার্টারে। পিরিয়াস-এর অফিস বিল্ডিং। ওখানে তার একটা স্যুইট আছে।'

হাতঘড়ি দেখলো রানা। 'চলো, প্লেন ধরতে হবে,' বলে দরজার দিকে ঘুরলো ও। জর্জ মিথ্যে কথা বলছে কিনা জানার ওই একটাই উপায় আছে।

'তুমি একা যাও, একজন অন্ধও খুঁজে পাবে ওটা।' জর্জের চেহারায় জেদ, ভুরু দুটো নিচে নামানো।

আবার ঘুরলো রানা, চোখে রাগ। 'অ্যারোনাফিসের বন্ধু তুমি, ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করতে পারবে আমাকে। তাছাড়া, তোমাকে চোখের আড়াল করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

'অ্যারোনাফিসকে তুমি চেনো না। ও আমাকে খুন করবে। দু'জনেই মারা যাবো আমরা। অ্যারোনাফিসের সাথে লাগতে রাজি নই আমি।'

রানার ওপরের ঠোঁট ভেতর দিকে ভাঁজ হয়ে গেল। 'ঘোরো। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসো।'

'কি!'

পিস্তল তাক করলো রানা। 'বসো!'

কাঁপা হাঁটু নিয়ে বসে পড়লো জর্জ। কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে আতংকভরা চোখে তাকিয়ে আছে। 'কি...কেন...আমি বুঝতে পারছি না...।'

'মুখ ঘোরাও, নাকি চাইছো মুখে মারি?' কঠিনসুরে জানতে চাইলো রানা।

তিনজনকে ডাকলো ডাচ জর্জ, 'বাবা, ও-মা, যীশু।' তারপর

আরেকজনকে। 'রানা, প্লিজ! প্লিজ, রানা। না, ভাই, ভাই রে...।'

'একবার বলবো। এইবারই শেষ,' ধমক দিলো রানা। 'এখুনি মরতে চাও তুমি, নাকি পরে অ্যারোনাফিসের সাথে?'

হাতজোড় করে সিধে হলো জর্জ। 'আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবো।'

এলিনিকন এয়ারপোর্টের পশ্চিম টার্মিনালের সামনে প্লেন থেকে নামলো ওরা, একটা ফোক্সওয়াগেন ভাড়া করলো। উত্তরপশ্চিম দিক ধরে এগোলো গাড়ি, সাগরের তীর ঘেঁষে। গোটা এলাকাটাকে অ্যাপোলো কোস্ট বলা হয়–হাউজিং কমপ্লেক্স, নাইটক্লাব, ক্যাসিনো, পাঁচতারা হোটেল, ইয়ট ক্লাব আর পর্যটন কেন্দ্র নিয়ে বিশাল বিস্তৃতি, প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার।

রানার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নেমিসিস। রোডস টাউনে অনেকক্ষণ ছিলো ও, চন্দন সরকারের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পেয়েছে। টিম নিয়ে যথাসময়েই রোডসে পৌঁচেছে চন্দন। টিমের দু'জন সদস্য, সাযযাদ আর নাঈম, এরইমধ্যে কে.জি.বি-র দু'জন এজেন্টকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে–একটা ক্যাসিনোয় ট্যুরিস্টের ছদ্ম পরিচয় নিয়ে ঢুকেছিল তারা, ওদের চোখে ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু চন্দন উদ্বেগজনক খবর দিয়েছে রানাকে। পিরিয়াসে উদয় হয়েছে নেমিসিস, একটা ওয়্যারহাউস থেকে অনেকগুলো ব্যারেলের একটা কার্গো লোড করা হয়েছে জাহাজটায়।

নেমিসিস এখনো কে.জি.বি-র দখলে, ওয়্যারহাউসের বাইরে থেকে তাদের গলা শোনা গেছে।

রানা ধারণা করলো, কার্গোটা নিশ্চয়ই ইউরেনিয়াম। ওর

হয়তো আশা ছিলো, নেমিসিসকে ঘিরে ঝড়-ঝাপটা শুরু হওয়ায় কে.জি.বি. সম্ভবত তাদের ইউরেনিয়াম রাশিয়ায় ফেরত নিয়ে যাবে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু সে-ধরনের কিছু ঘটছে বলে মনে হয় না।

সোহেলের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে চন্দন, একটা আর-টি রেডিও বীকন রোপণ করতে হবে নেমিসিসে, কার্গো লোড করার সময়। বহু কষ্ট স্বীকার করে কাজটায় সাফল্য অর্জন করেছে চন্দনের টিম। বীকনটা উত্তর দিকে যাচ্ছে না, যাচ্ছে না দারদানেলেস বা কৃষ্ণ সাগরের দিকে।

নেমিসিস যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে, আফ্রিকা অভিমুখে, আবার।

সি.আই.এ. আর কে.জি.বি-র মধ্যে একটা ব্যাপারে অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সি.আই.এ. যেমন রাষ্ট্রীয় নীতি লঙ্ঘন করে বন্ধু বা এমনকি শত্রু রাষ্ট্রকেও আর্থিক অথবা পণ্য সাহায্য দেয়, কে.জি.বি-ও তাই করে। নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে নীতিচ্যুত হওয়া ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। এমন হতে পারে, ভাবলো রানা, সোভিয়েত সরকার এই ইউরেনিয়ামের চালান সম্পর্কে কিছুই জানে না।

নেমিসিস যদি ইউরেনিয়াম সহ রাশিয়ায় না ফেরে, যে-ভাবেই হোক জাহাজটাকে থামাতে হবে। দায়িত্বজ্ঞানহীন অথবা অশুভ কোনো শক্তির হাতে চালানটা পড়ার আগে একটা কিছু না করলেই নয়। দরকার হলে ইউরেনিয়াম নষ্ট করে দেবে রানা।

পিরিয়াসে পৌঁছে গেল ফোক্সওয়াগেন। বাঁক নিয়ে জর্জিয়ো এ. এভিনিউয়ে উঠে এলো গাড়ি, সামনে কারাইস্কন স্কয়ার। চৌরাস্তার ফুল-আকৃতির ল্যাম্পপোস্ট আর ফোয়ারা ছাড়িয়ে এলো গাড়ি। শহরের প্রধান সড়কের সামনে একটা জেটি রয়েছে। দ্বীপটার ব্যস্ত

তম এলাকা, যদিও এই মুহূর্তে প্রায় নির্জন আর শান্ত। বেশিরভাগ শিপিং লাইন্সের অফিস রয়েছে এখানে। অ্যারোনাফিসের বিল্ডিঙটা সাদা, আটতলা। একই আকৃতির ভবন পাশাপাশি অনেকগুলো। কোনো সাইনবোর্ড নেই দেখে অবাক হলো রানা। কাঁচের দরজা, ভেতরে ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক, সিকিউরিটি গার্ড বলে মনে হলো।

জর্জকে চাপা গলায় সতর্ক করলো রানা, 'ওদেরকে বোকা বানাবার বুদ্ধি বের করো, তা না হলে আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবে না।'

'সেটা কোনো ব্যাপারই নয়,' আশ্বস্ত করলো জর্জ। 'তবে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, সময় থাকতে একটি বার ভেবে দেখো অ্যারোনাফিস কিভাবে তোমাকে গ্রহণ করবে, বিশেষ করে এখানেই যদি প্যাসিমভকে বন্দী করে রেখে থাকে সে।'

'ভয় পাওয়া উচিত অ্যারোনাফিসের,' বললো রানা। 'কারণ সে জানে না আমি তাকে কিভাবে গ্রহণ করবো।'

'তোমরা যে কোলাকুলি করবে না, এটুকু পরিষ্কার।'

দালানটার ওপর দিকে তাকালো রানা। টপফ্লোরে আলো জ্বলছে। খানিক দূরের রেলস্টেশন থেকে ট্রেনের হুইসেল ভেসে এলো। 'চলো, ভেতরে ঢোকা যাক।'

প্রবেশপথের দিকে এগোলো ওরা, পিস্তলটা জ্যাকেটের পকেটে ভরে রাখলো রানা, হাতটাও পকেটে থাকলো। কাঁচের দরজায় টোকা দিলো জর্জ। উঁকি দিলো একজন গার্ড, জর্জকে দেখে নিঃশব্দে হাসলো, চাবি বের করে খুলে ফেললো তালাটা।'

'গুড ইভিনিং,' গ্রীক ভাষায় বললো গার্ড, 'মি. ডাচ জর্জ।'

একই ভাষায় জবাব দিলো জর্জ, 'ওপরতলায় যেতে চাই হে।'

'অবশ্যই, স্যার,' বলেও পথ ছাড়লো না গার্ড, জর্জকে খুঁটিয়ে দেখলো সে। 'স্যার, আপনি কি কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন?'

'পড়েছিলাম, ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি, কোথাও তেমন লাগেনি। আমার সাথে ইনি মাসুদ রানা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পথ ছাড়লো গার্ড, ভেতরে ঢুকলো ওরা। এলিভেটরের বোতামে চাপ দিলো গার্ড। মধ্য বয়স্ক লোক সে, খুশি করার জন্যে উন্মুখ। অপর লোকটা অল্পবয়েসী, সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। দেয়ালের গায়ে অলসভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সে, চোখে উদ্ধত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

কাঁচ ভেদ করে রাস্তার ওপর গিয়ে পড়লো রানার দৃষ্টি। কোনো লোকজন নেই। বগল থেকে ঘামের একটা ধারা নামছে, অনুভব করলো ও।

এলিভেটর থেকে কার্পেট মোড়া করিডরে নেমে এলো ওরা। পিয়ানো বাজার ভোঁতা, অস্পষ্ট আওয়াজের সাথে কিছু লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর ও হাসির আওয়াজ পেলো রানা।

'কোস্টাস অ্যারোনাফিসের পেন্টহাউসে স্বাগতম,' বললো ডাচ জর্জ। 'শুনতে পাচ্ছো? মনে হচ্ছে একটা উৎসব পার্টিতে এসে পড়েছি আমরা।'

করিডরে মৃদু আলো, শেষ মাথার দিকে পিস্তল তুললো রানা। 'ওদিকে কি আছে?'

'সার্ভিস এন্ট্রান্স।'

'চলবে। আগে বাড়ো।'

বেশ কয়েকটা খোলা দরজা পেরিয়ে একটা করিডরে বেরিয়ে এলো ওরা, তারপর কিচেন হয়ে চলে এলো ডাইনিং রুমে। পাশের

ঘর থেকে পিয়ানোর আওয়াজ আসছে।

নিঃশব্দ ও সতর্কতার সাথে একটা দরজা আধ ইঞ্চি ফাঁক করলো রানা। সুবেশী দশ-বারোজন অতিথি রয়েছে ভেতরে। কেউ কেউ আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়েছে, কয়েকটা মেয়ে হাঁটু তুলে সোফার ওপর বসেছে, মোজা পরা পা শরীরের নিচে। প্রায় প্রত্যেকের হাতে মদের গ্লাস। একদিকে এক লোক মহা উৎসাহের সাথে গল্প শোনাচ্ছে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে শ্রোতারা। বাকি সবাই নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। কাঠের তৈরি লম্বা একটা পাখির পাশে ছোটোখাটো, চওড়া কোস্টাস অ্যারোনাফিসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো রানা। রাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল স্বনামখ্যাত এক রাজনীতিকের সাথে কথা বলছে সে। এখনো গাঢ় রঙের প্রকাণ্ড চশমা রয়েছে তার চোখে, যেন নিজের পেন্টহাউসেও যতোটা সম্ভব লুকিয়ে রাখতে হবে চেহারা। মিলি পুলটিসকেও দেখলো রানা, পিয়ানোর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে আরেক দিকে। এতোক্ষণ সে-ই সম্ভবত গান শুনিয়েছে ওদেরকে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, এখানে তাকে জোর করে নিয়ে আসা হয়নি। তার হাঁটাচলা, হাসিখুশি হাবভাব দেখে বোঝা গেল, অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে সে, এটা যেন তার নিজের ঘরোয়া পরিবেশ। লাল আভার মতো তাকে জড়িয়ে রেখেছে একটা শিফন, নিচের অংশ মেঝেতে লুটোচ্ছে। তার কালো চুল কাঁধের কাছে মস্ত খোঁপার আকৃতি পেয়েছে। কানের পাশে লাল ফুল। হলরুমের প্রবেশপথের কাছে দাঁড়ালো সে, মনে হলো পার্টিতে তার মন নেই, নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন।

জর্জের পাঁজরে গুঁতো দিলো রানা, ডাইনিং রুমের পিছন

দিকের একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এলো তাকে নিয়ে। প্যাসেজ থেকে একটা স্টাডিতে ঢুকলো ওরা। চারদিকে চামড়া মোড়া বই ভর্তি বুকসেলফ। একদিকে এন্ট্রান্স আলকোভ, ক্লজিটের দরজায় আয়না লাগানো, বড় আকারের সবুজ লতাগাছ ফুটে রয়েছে আয়নার গায়ে।

হাত বাড়ালেই মিলিকে ছুঁতে পারবে রানা।

দীর্ঘক্ষণ, গভীর মনোযোগের সাথে, কামরার প্রতিটি লোককে লক্ষ করলো রানা। কে কোন্ দিকে তাকাচ্ছে, মিলির দিকে কারো নজর আছে কিনা দেখে নিলো।

ছায়া থেকে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল রানার হাত, অপর হাতটা মিলির মুখ চেপে ধরলো। হ্যাঁচকা টানে শরীরটা সরিয়ে আনলো ও। টেনে আনলো স্টাডির দিকে। প্রথমে হিংস্র বিড়ালের মতো ধস্তাধস্তি করলো মিলি। তারপর কালো, পটলচেরা চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলো রানাকে, ঢিল পড়লো পেশীতে। স্টাডির ভেতর এসে দরজা বন্ধ করলো রানা।

ছাড়া পেয়েই কর্কশস্বরে ফিসফিস করলো মিলি, 'ডার্লিং! আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছো!'

'ও কি তোমাকে তাই বলেছে?'

'কে?'

ঘাড় ফেরালো রানা।

ডাচ জর্জ পালিয়েছে। এই মুহূর্তে সম্ভবত লেজে আগুন লাগা কুকুরের মতো ছুটছে সে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো রানা, ভাবলো জর্জকে ধাওয়া করবে কিনা, তারপর মিলির দিকে তাকালো—শেষ পর্যন্ত হাতের চিড়িয়াটাকেই বেছে নিলো ও।

'জর্জ,' বললো রানা। 'সে-ই আমাকে এখানে আনলো।'

‘কেন?’ মিলির সুন্দর মুখে বিস্ময়ের মেঘ জমলো।

‘প্যাসিমভ–তার ধারণা, প্যাসিমভ এখানে আছেন।’

আরো যেন হতভম্ব দেখালো মিলিকে, মন্থরগতিতে মাথা দোলালো সে, যেন নিজের হতভম্ব ভাবটাকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এগিয়ে এসে রানার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো সে, ‘তুমি বেঁচে আছো, আমার যে কি খুশি লাগছে। আমাকে…চুমো খাবে?’ সেন্টের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলো রানার।

প্রায় ধমকের সুরে বললো রানা, ‘ওসব ভুলে যাও। আমাকে জানতে হবে প্যাসিমভকে কোথায় রাখা হয়েছে?’ মিলির হাত দুটো গলা থেকে নামিয়ে দিলো ও, মনের কানাচে উত্তপ্ত সীসা হয়ে রয়েছে জর্জ। বিশ্বাস নেই, পার্টির সব লোককে ওর পিছনে লেলিয়ে দিতে পারে সে। আর, সে যদি পালিয়ে যেতে পারে…’

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো রানার।

‘আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি কি আসলে ভালোবাসতে অক্ষম?’ ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলো মিলি।

‘ওদিকটা, মনে হচ্ছে, আমাকে ছাড়াও বেশ ভালোভাবে চালিয়ে নিতে পারো তুমি,’ বললো রানা।

‘ওহ! আর কি করার থাকতে পারে আমার? চাইলে, না চাইলেও, কোস্টাস সব সময় আমার পাশে আছে!’

রানা চাইলো, প্রতিবার মাত্র একটা বিষয়ে মাথা ঘামাবে। ‘শোনো, জর্জ আর প্যাসিমভের সাথে রোডসে ছিলে তুমি, ঠিক?’

‘হ্যাঁ।’

‘অ্যারোনাফিসের ভিলার নিচে, টানেলে?’

আবার হতভম্ব হয়ে উঠলো মিলির চেহারা। অস্বস্তির সাথে জানালো সে, ‘ওখানে তো আমরা যাইনি।’

মিলির কনুইয়ের ওপরটা খামচে ধরলো রানা, ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠলো মিলি। 'তাহলে কোথায় গিয়েছিলে?' নিঃশ্বাসের সাথে হিসহিস করে বেরিয়ে এলো প্রশ্নটা।

'প্রথমে একটা উইণ্ডমিলে। তারপর লিনডোস-এ, লিনডোসের একটা পুরনো বাড়িতে।'

ঠাণ্ডা মুঠোয় নিয়ে কেউ যেন চেপে ধরলো রানার হৃৎপিণ্ড। সর্বনাশ হয়ে গেছে, ভাবলো ও। মিথ্যে কথা বলে এখানে এনেছে ওকে জর্জ, ওদিকে নিকোলাই প্যাসিমভ এখনো রোডসে রয়েছেন—জর্জ নিশ্চয়ই তাঁকে কোথাও বন্দী করে রেখেছে।

এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে জর্জ। অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

খপ্ করে মিলির একটা কব্জি ধরলো রানা। 'এসো!' খেঁকিয়ে উঠলো ও।

বাধা দিলো মিলি। 'কোথায়? তোমার বুঝি ধারণা, ইচ্ছে করলেই আমাকে চরকির মতো ঘোরাতে পারো তুমি?'

'জর্জ বাদে একমাত্র তুমিই জানো কোথায় রাখা হয়েছে প্যাসিমভকে। জর্জ পালিয়েছে, তাকে যদি ধরতে না পারি, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।'

এই সময়, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কামরার আরেক প্রান্ত থেকে ডাচ জর্জের গলা ভেসে এলো, 'দুঃখিত, ভায়া। কোথাও তোমরা যাচ্ছো না।'

ঝট্ করে দরজার দিকে ফেরার সময় পিস্তলটার কথা ভাবলো রানা। জ্যাকেটের ভেতর রয়েছে ওটা, বের করার সময় পাওয়া যাবে না। পরমুহূর্তে দেখলো, পিস্তল বের করার চেষ্টা না করে ভালো করেছে। ভুরু বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে কপালে, দোরগোড়ায়

দাঁড়িয়ে রয়েছে জর্জ, তার পাশে খর্বকায় কোস্টাস অ্যারোনাফিস, অ্যারোনাফিসের হাতে ছোট্ট একটা .৩২, সরাসরি রানার বুকের দিকে তাক করা।

এক গাল হাসি নিয়ে জর্জ বললো, 'তোমাকে এখানে আনার জন্যে আমার ওপর জোর খাটিয়েছিলে বলে ধন্যবাদ, রানা। তোমার এই আচরণের ওপরই ভরসা করেছিলাম আমি। তোমার জ্ঞাতার্থে বলছি, কোস্টাসের সাথে আমার ব্যবসায়িক সম্পর্ক আজ নতুন নয়।'

অপেক্ষা করছে রানা, কি ঘটতে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে সচেতন। ডাচ জর্জের সরু মুখে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো জর্জ, 'মারো ওকে, কোস্টাস। গুলি করো। তা না হলে বুড়ো পাপার পাঠানো সমর উপকরণ থেকে নির্ঘাত বঞ্চিত হবো আমি।'

ছয়

'হাত দুটো তোলো, প্লিজ।' ইংরেজিতে বললো কোস্টাস অ্যারোনাফিস, শান্ত, নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বর।

রানা হাত তুলছে, ধীরে ধীরে এক পাশে সরে গেল মিলি।

'ওর কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে আমাকে দাও,' জর্জকে বললো অ্যারোনাফিস।

রানাকে সার্চ করলো জর্জ, পিস্তলটা হাতে নিয়ে পিছু হটছে,

যেন রানার দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ মুহূর্তের জন্যেও হারাতে চায় না।

রানার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন আহত পাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে। যদিও সাহসের সাথে, মুখে শান্ত হাসি নিয়ে বললো ও, 'আমাকে খুন করে নিজের জন্যে শুধু বিপদ ডেকে আনবে অ্যারোনাফিস।'

'তাই কি? পরিস্থিতি কি এতোই খারাপ?' তাচ্ছিল্যের সাথে জানতে চাইলো অ্যারোনাফিস।

'তোমার আর্মস স্মাগলিং সম্পর্কে একা শুধু আমি জানি না।'

'বেশ, আরো অনেকে জানলো, তো কি হলো? তারা কেউ দুর্নীতির ঊর্ধ্বে নয়। তাদের সমর্থন আর প্রশংসা কেনা আমার পক্ষে সহজ কাজ।' কথা শেষ করে হাসলো সে।

'অন্য কোথাও পাঠানো হচ্ছিলো, দাম একশো মিলিয়ন ডলারেরও বেশি, জিনিসটা ইউরেনিয়াম, তুমি হাইজ্যাক করেছো–এটাও একা শুধু আমি জানি না।'

'আচ্ছা! এটা সত্যি বিপজ্জনক তথ্য, রানা!' চোয়াল কঠিন হয়ে উঠলো অ্যারোনাফিসের।

'কোথায় যাচ্ছিলো জিনিসটা?'

'এতো কিছু জানো, আর এটা জানো না? লিমবেরি, লিমবেরি। আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশ। সেজন্যেই তো সাউদার্ন আফ্রিকার কোর্স বজায় রাখছিল নেমিসিস। আ ডিলেইং ট্যাকটিক। আশা করা যায়, লিমবেরি সরকারের বিশ্বাস তাদের ইউরেনিয়াম এখনো আসার পথে রয়েছে, এদিকে জিনিসটা আমি আরেক পার্টিকে হস্তান্তর করছি।'

মনে মনে আতংকিত হলো রানা। লিমবেরি শ্বেতাঙ্গশাসিত

নগণ্য একটা রাষ্ট্র হলে কি হবে, শাসকরা আদিবাসী কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে। তিন দিক থেকে কৃষ্ণাঙ্গশাসিত তিনটে দেশ ঘিরে রেখেছে লিমবেরিকে, দেশগুলোর পাঁচ-সাতটা চরমপন্থী রাজনৈতিক দল লিমবেরির কালোদের পক্ষ নিয়ে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের ভাড়াটে সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে হাজার হাজার গেরিলাকে সীমান্তে পাঠিয়েছে। জাতিসংঘর নিন্দা প্রস্তাব কানে তোলেনি লিমবেরি সরকার, অত্যাচারের মাত্রা দিনে দিনে বাড়িয়ে চলেছে তারা। কিছু দিন হলো, জাতিসংঘের তরফ থেকে লিমবেরিকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কালোরা সংখ্যায় বেশি, প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায়তা পেয়ে গেরিলা যুদ্ধে ভালো করছে তারা। লিমবেরি একবার হুমকি দিয়েছিল, সীমান্তগুলো থেকে গেরিলাদের হটিয়ে দেয়ার জন্যে দরকার হলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে তারা, অস্ত্রটা যদি হাতে পায়। পরে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিল, পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে প্রাণহানির কোনো ইচ্ছে তাদের নেই, সীমান্তগুলোয় শুধু তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে দিতে চায় তারা, যাতে সেদিকে কেউ পা বাড়াতে সাহস না পায়। বোঝা যাচ্ছে, হুমকিটা শুধু কথার কথা ছিলো না। লিমবেরি সরকার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্বভাবতই, প্রতিবেশী দেশগুলোও ছেড়ে কথা বলবে না। এখন যদি বাধা না দেয়া হয়, শেষ পর্যন্ত এই এলাকায় ব্যাপক যুদ্ধ বেধে যাবে, পরিণতিতে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।

'কিন্তু,' বললো রানা, 'আমরা সবাই জানি গেরিলাদের সাহায্য করছে রাশিয়া। এ-ব্যাপারে রাশিয়ানদের ভূমিকা সত্যি প্রশংসনীয়। কেন তারা উইপন-গ্রেড ইউরেনিয়াম লিমবেরির মতো একটা দেশকে সাপ্লাই দিতে যাবে? এ অসম্ভব!'

‘অসম্ভব, তোমার সাথে আমি একমত,’ ঠোঁটে হাসি নিয়ে বললো অ্যারোনাফিস, তার গাঢ় রঙের চশমা আলো লেগে ঝিক্ করে উঠলো। ‘নেমিসিসের অফিশিয়াল গন্তব্য ছিলো ইটালি। রাশিয়ানদের ধারণা, ইণ্ডাস্ট্রিতে ইউরেনিয়াম ব্যবহারকারীদের পক্ষে মধ্যস্থতা করছি আমি।’

‘তোমার ভিলায় হামলা চালিয়েছিল কে.জি.বি., তাই না? তুমি ওদের নাগালের বাইরে ইউরেনিয়াম সরিয়ে দেয়ার আগেই ওরা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল।’

‘সেটা একটা সম্ভাবনা বটে।’

‘জানো নিশ্চয়ই, নেমিসিস এখন ওদের হাতে? তোমার ওয়্যারহাউস খালি করার পর জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।’

মাঝপথে নিঃশ্বাস আটকে গেল অ্যারোনাফিসের। ‘কি!’

‘গল্প-গুজব অনেক হয়েছে,’ হঠাৎ বাধা দেয়ার সুরে বললো জর্জ। ‘কাজটা এবার…।’

রানা বললো, ‘আমি অবশ্য শুধু নিকোলাই প্যাসিমভ সম্পর্কে আগ্রহী। ডাচ জর্জ তাকে লুকিয়ে রেখেছে। ইউরেনিয়াম উদ্ধারের জন্যে যা খুশি করো তুমি, আমার কিছু বলার নেই। তবে তোমার জায়গায় আমি হলে, এই পরিস্থিতিতে, অন্য কোনো বিষয়ে নিজেকে জড়াতাম না।’

‘ও, হ্যাঁ,’ বলে মাথা ঝাঁকালো অ্যারোনাফিস। ‘রুশ ভিন্নমতাবলম্বী। মিলির কাছ থেকে তাঁর গল্প শুনেছি বটে। মিলি তো তাঁর অন্ধভক্ত।’ জর্জের দিকে ফিরলো সে। ‘ভদ্রলোককে আটকে রেখেছো তুমি?’

‘আটকে রেখেছে মুক্তিপণ পাবার লোভে,’ তাড়াতাড়ি বললো

রানা। 'দশ মিলিয়ন ডলার চাইছে ও। কে.জি.বি. বা এইচআরসি পেমেন্ট করবে।'

'আচ্ছা,' শব্দটা চিন্তিতস্বরে উচ্চারণ করলো অ্যারোনাফিস।

ব্যাকুলতার সাথে শুরু করলো জর্জ, 'টাকাটা আমি তোমার সাথে ভাগ করে নেবো, কোস্টাস। এখন আমার সাহায্য দরকার, তার বিনিময়ে। কিন্তু, আগের কাজ আগে, বন্ধু। এই লোককে না মারলে বিপদে পড়বো আমরা। তুমি গুলি করছো না কেন?'

চট করে একবার মিলির দিকে তাকালো রানা, সাথে সাথে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো মেয়েটা। সত্যি যদি নিকোলাই প্যাসিমভের

অন্ধ ভক্ত হয় সে, তার এখনকার নির্লিপ্ত আচরণ মোটেও স্বাভাবিক বলা যায় না।

মিলির দিকে তাকালেও, অ্যারোনাফিসের হাতের প্রতি খেয়াল রয়েছে রানার, মিলির দিকে ফিরে গ্রীক কোটিপতিকে যেন ধারণা দিতে চাইলো ও, এখুনি গুলি করা হবে বলে আশা করছে না ও।

রানার দিকে স্থিরভাবে অস্ত্রটা তাক করে আছে অ্যারোনাফিস, অপর হাতটা তুলে ডাচ জর্জকে আশ্বস্ত করলো সে। 'দেনায় হাবুডুবু খাওয়া তোমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, মাই ফ্রেণ্ড। এর একটা ফয়সালা করার সুযোগ আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। না, আমি তোমার টাকা চাই না। আর রানার বাধা হয়ে দাঁড়াবার যে কথাটা বলছো...।'

'ইয়েস?' ব্যগ্রতার সাথে জানতে চাইলো জর্জ।

'ধরে নিচ্ছি রাশিয়ানরা রোডসে রয়েছে, মি. প্যাসিমভের খোঁজে, তাই না? যেমন, এইচআরসি-র লোকজনও রোডসে

রয়েছে। কিন্তু আমেরিকানরা কোথায়? কে.জি.বি. থাকলে, সেখানে সি. আই. এ.-ও থাকবে, সেটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় তারা?'

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এলো কামরার ভেতর।

প্রথম কথা বললো রানা, 'সি.আই.এ-র নিঃসঙ্গ প্রতিনিধি আমাদের সাথেই আছে, তুমি বোধহয় তাকে চিনতে পেরেছো, তাই না, অ্যারোনাফিস?'

ডাচ জর্জের দিকে তাকালো অ্যারোনাফিস। 'আমার কেন যেন ধারণা হচ্ছে, এ-ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে।'

'আমার...কি আশ্চর্য! আমি কি বলবো!' নার্ভাস ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হাসলো জর্জ। 'আমার কি বলার থাকতে পারে!'

'তুমি সি.আই.এ. হলেও,' আশ্বাসের সুরে বললো অ্যারোনাফিস, 'আমার কিছু করার বা বলার নেই।'

'তোমাকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কি, কোস্টাস? তুমিই বলো, আমি সি. আই. এ. হলে তোমাকে মুক্তিপণের ভাগ দিতে চাইতাম? ল্যাংলি ব্যাপারটা মানতো?'

'বেঈমানী করা যার স্বভাব, তা যে সে নিজের প্রতিষ্ঠানের সাথেও করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!'

'সবাই যখন রোডসে, আমরাও তাহলে সেখানে যাই না কেন?' রানার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মিলির দিকে ফিরলো অ্যারোনাফিস। 'কাপড় বদলে এমন কিছু পরো, সুইট ডার্লিং, দৌড়ঝাঁপ করতে যাতে অসুবিধে না হয়। তুমিই আমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

'ইয়েস, ডার্লিং,' ত্রস্ত পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মিলি।

জর্জের চেহারায় বিস্ময়। ‘কিন্তু রোডসে কেন যাচ্ছি আমরা, কোস্টাস? ওখানে গিয়ে কি করবো?’

ঠোঁট মুড়ে হাসলো অ্যারোনাফিস। ‘কে.জি.বি-র সাথে যোগাযোগ করবো,’ বললো সে। ‘মাসুদ রানা হত্যাকাণ্ডের দায় তাদের ঘাড়ে চাপাতে পারলে মন্দ কি? কাজটা যে তারা আনন্দ আর উৎসাহের সাথে করবে, এ-ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।’

‘তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি আমি!’ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো ডাচ জর্জ। ‘ভারি চমৎকার হবে সেটা!’ রানার দিকে তাকিয়ে ভেঙচি কাটলো সে, অশ্লীলভঙ্গিতে, তারপর একটা চোখ টিপলো। ‘কি হে, হিরো, ঠিক বলেছি না?’

রোডসের পুব উপকূল লিনডোসে পৌঁছুলো ওরা, ইতিমধ্যে দিগন্ত রেখার কাছাকাছি নেমে এসেছে চাঁদ। সম্ভবত যীশুর জন্মেরও হাজার বছর আগে, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর একটা ছিলো লিনডোস। কালের বিবর্তনে শহরটা জেলেদের নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়েছে। এলাকাবাসীর গর্ব করার মতো প্রাচীন কীর্তি এখনো কিছু কিছু আছে, তার মধ্যে একটা হলো সাগরের দিকে লম্বা হয়ে থাকা ভূখণ্ডের ওপর দুর্গটা। এই দুর্গের চারদিকেই সাদা চুনকাম করা জেলেদের বাড়ি-ঘর।

পেন্টহাউসের ছাদ থেকে রওনা হয়েছে ওরা, হেলিকপ্টার ওদেরকে নামিয়ে দিয়েছে এলিনিকন এয়ারপোর্টে। তারপর মিলি ওদেরকে লিয়ার জেটে তুলে নিয়ে এসেছে রোডসে।

ড্রাইভারের সীটে বসেছে অ্যারোনাফিস, জেলেদের গ্রামে ঢুকে ইন্টারসিটি বাস ডিপোর পাশে একটা রেস্তোরাঁর সামনে থামলো

গাড়ি। গলিগুলো সরু আর ঘন ঘন বাঁক নিয়েছে, গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢোকা বোকামি হবে। বাস স্টপ থেকে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো ওরা, বেশ খানিকটা ওঠার পর পাথরের ওপর সাদা চুনকাম করা একটা বাড়ির দিকে হাত তুলে ডাচ জর্জ ইঙ্গিত দিলো ।

শিশিরভেজা বাতাসে দারুচিনির গন্ধ। গ্রামের মাথায় ঝুলে রয়েছে দুর্গের বিশাল কাঠামো, কালো আকাশের গায়ে আকৃতিটাকে জ্যান্ত আর অশুভ বলে মনে হলো।

দরজার তালা খুললো জর্জ, পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে এলো ওদেরকে। অ্যারোনাফিস, এখনো ডিনারের জ্যাকেট সহ সুট আর গাঢ় রঙের চশমা পরে আছে, সবার পিছনে থাকলো, পিস্তলটা হাতে।

দুর্গের লাগোয়া কিছু কিছু বাড়ি আজও টিকে আছে। ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করে ওগুলো। কোনো কোনোটা মেরামত করা হয়েছে, রঙ করা হয়েছে সিলিং, দেয়ালের অনেক ওপরে তুলে দেয়া হয়েছে সিন্দুকগুলো, জলদস্যুদের ভয়ে। তবে এই বাড়িটা মেরামত করা হয়নি। নগ্ন কড়িকাঠ সিলিঙের অবলম্বন হিসেবে কাজ করছে, প্লাস্টার খসে গিয়ে দেয়ালের পাথর বেরিয়ে পড়েছে। সাদামাঠা একটা টেবিল আর বেঞ্চ দেখা গেল, সাথে খাড়া পিঠ সহ একজোড়া চেয়ার, বসার জায়গাটা বেতের তৈরি। সরু একটা লোহার খাট রয়েছে, কালো কম্বল দিয়ে ঢাকা।

বিছানায় শুয়ে আছেন নিকোলাই প্যাসিমভ, গোড়ালি দুটো এক করে বাঁধা, কব্জি দুটো পিছমোড়া করে। চুলে লেগে থাকা রক্ত শুকিয়ে গেছে।

‘একি দশা হয়েছে আপনার!’ আর্তনাদ করে উঠলো মিলি।

‘উনি বাধা দিচ্ছিলেন,’ বললো জর্জ। ‘কিন্তু ওঁনাকে না বেঁধে এখান থেকে বেরুই কিভাবে? তাই মাথাটা আস্তে করে দেয়ালের সাথে ঠুকে দিতে হয়েছে। তেমন লাগেনি, খুলির চামড়া সামান্য ছড়ে গেছে আর কি।’

‘ও কিছু না, মাই ডিয়ার,’ প্যাসিমভ বললেন। ক্লান্তি আর অবসাদে কর্কশ শোনালো তাঁর গলা। চোখ বড়বড় করে ওদের দিকে তাকালেন তিনি। দৃষ্টিতে রাগ যেমন আছে, তেমনি ভয়ও। নেমিসিস ত্যাগ করার পর খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে তাঁর মুখে। গায়ের টুইডের জ্যাকেটটা অসম্ভব নোংরা।

এক ছুটে তাঁর মাথার কাছে চলে এলো মিলি। কম্বলটা ভাঁজ করে প্যাসিমভের মাথার নিচে রাখলো সে। ‘পানি আনছি, ক্ষতটা এখুনি ধুয়ে দেবো,’ বললো সে। জর্জের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো সে। ‘তুমি একটা শুয়োর! নরকেও তোমার জায়গা হবে না। এতোটা নিষ্ঠুর তুমি হও কি করে?’ গলার রগ ফুলে উঠলো তার।

হঠাৎ কথা বললো অ্যারোনাফিস, ‘ওঁর কাছ থেকে সরে এসো। এদিকে।’

ইতস্তত করলো মিলি, তারপর ভয়ে ভয়ে নির্দেশটা পালন করলো। মিলির চোখে চোখ রেখে অ্যারোনাফিস বললো, ‘উনি আর বেশিক্ষণ ভুগবেন না, মাই ডিয়ার। তোমাকে আমি কথা দিলাম।’

‘ওঁর বাঁধনটা অন্তত খুলে দিতে পারো না, কোস্টাস?’

‘তা সম্ভব নয়।’

‘অন্তত এ-কথা বলতেই হবে যে মনির হোসেনের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছেন উনি,’ বললো রানা।

'মনির হোসেন?' রানার দিকে ফিরলো মিলি।

'জর্জ তাকে খুন করেছে।'

রুদ্ধশ্বাসে জর্জের দিকে ঘাড় ফেরালো মিলি।

'আমি বলবো, ব্যাপারটা ছিলো দুঃখজনক প্রয়োজন,' জর্জের সরু মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটলো, গলার স্বরে ব্যঙ্গ। 'রানার লাগছে, কারণ ওর দেশের লোক ছিলো সে। দ্বীপের সব লোককে বলে বেড়াবে হোসেন মিয়া, সে-ঝুঁকি নেয়া সম্ভব ছিলো না।' হাত তুলে রুশ বিজ্ঞানীকে দেখালো সে। 'ওঁর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই, আজ রাতেই ওঁকে ছেড়ে দেয়া হবে।'

'সম্ভবত আরো আগে,' মন্তব্য করলো অ্যারোনাফিস।

'সম্ভবত, হ্যাঁ,' তাকে সমর্থন করলো জর্জ। 'জেনেভা থেকে খবর আসবে, আমার অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেয়া হয়েছে, ব্যস। কিন্তু তার আগে কিছু করা যাবে না।'

'উঁহুঁ, সেজন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই,' বললো অ্যারোনাফিস, তার গাঢ় চশমা হলদেটে আলোয় ঝিক ঝিক করছে।

'মানে?'

কোনো রকম ইতস্তত না করে অ্যারোনাফিস বললো, 'মি. প্যাসিমভকে বাঁধার পর খানিকটা রশি নিশ্চয়ই বেঁচে গেছে, তাই না? খুঁজে বের করো, তারপর ওটা দিয়ে বাঁধো রানাকে।'

কি ঘটতে যাচ্ছে, রানা যেন উপলব্ধি করতে শুরু করলো। জর্জ রশি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, ভাব দেখে বোঝা গেল তার মনে কোনো আশংকা নেই । বিছানার তলা থেকে একটুকরো রশি কুড়িয়ে নিলো সে।

রানাকে বাঁধার কাজ করিয়ে নেয়ার পর জর্জকে আর দরকার

হবে না অ্যারোনাফিসের।

‘তোমার ভিলায় এডওয়ার্ড গ্রীন কি করছিল বলো তো?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘ও, সে!’ গম্ভীর হলো অ্যারোনাফিস। ‘বেচারার ভাগ্য খারাপ। নেমিসিসে ছুরি খায় সে, প্রায় মরেই গিয়েছিল...।’

‘কবে?’

‘যে-রাতে কার্গো স্থানান্তর করা হয়, রোডসের...।’

‘ছুরি খায়?’ রানা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

‘তদন্ত করা সম্ভব ছিলো না, পরিস্থিতির কারণে। আমরা ধরে নিই, ক্রুদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিণতি ছিলো ওটা। আমরা তাকে আমার ভিলায় তুলে আনি। হাসপাতালে পাঠাবার ঝুঁকি নিইনি। গোপন ট্র্যান্সফারের কথা বলে দিতে পারতো সে।’

‘তারপর দুর্ঘটনার শিকার হয় সে, কে.জি.বি. তোমার ভিলায় আগুন দেয়ায়?’

‘তোমাকে তো বললামই, বেচারার কপাল মন্দ।’

একটা চেয়ার এনে সামনে রাখলো জর্জ, কর্কশস্বরে বললো, ‘বসো।’

রশিতে গিঁট বাঁধছে জর্জ, তার মুখে লাথি মারবে কিনা চিন্তা করলো রানা। ছিটকে অ্যারোনাফিসের ওপর পড়বে সে।

তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে গেল অ্যারোনাফিস, যেন রানার মনের কথা বুঝে ফেলেছে।

জর্জকে বললো রানা, ‘তুমি যে এতোটা বোকা, আমার ধারণা ছিলো না। একেকটা গিঁট দিচ্ছো, নিজের ডেথ ওয়ারেন্টে একটা করে সীল পড়ছে।’

হাসলো জর্জ, কিন্তু মুখের চেহারা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো,

আওয়াজটা বেসুরো। সরু চোয়ালে ঘামের ধারা, ফোঁটাগুলো ঝুলছে চিকন গোঁফের দুই প্রান্তে। 'আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না, রানা,' বললো সে। 'খেলা এখানেই শেষ তোমার। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তেই হয় আমাদের, মেনে নিতে হয় পরাজয়। ভুল করেছো আগেই, এখন আর তা সংশোধনের সুযোগ তোমার নেই।'

'বিপদগ্রস্ত একজন লোকের কাছ থেকে বিপদ থেকে বাঁচার উপদেশ শুনতে রাজি নই আমি,' জবাব দিলো রানা, অনুভব করলো গোড়ালিতে শক্ত কামড় দিলো রশির বাঁধনটা। চেয়ারের সাথে বাঁধা হলো ওকে।

'ডিভাইড অ্যাণ্ড কংকার? এই কি তোমার সর্বশেষ, বেপরোয়া প্ল্যান? কৌশলটা একদম বাসি হয়ে গেছে, রানা। হাস্যকর।' চেয়ারের পিছনে চলে এলো জর্জ, রানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধলো।

'পিস্তল হাতে তোমার বন্ধু কিন্তু হাসছে না,' বললো রানা। মিলির দিকে ছুটে গেল ওর দৃষ্টি, কি যেন খুঁজলো, ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো।

মিলির চোখের কালো মণি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল, যেন রানা আর নিজের মাঝখানে দেয়াল তুলে দিলো একটা। অ্যারোনাফিসের দিকে ফিরলো সে। 'ওকে নিয়ে কি করবে তুমি, কোস্টাস?' জিজ্ঞেস করলো, হাত তুলে দেখালো রানাকে।

'এখানে ফেলে যাবো। রাশিয়ানরা এসে দেখুক ওকে। কোথায় আসতে হবে জানবে তারা, যাতে জানে তার ব্যবস্থা করা হবে।'

'বেশ, ভালো কথা, তোমার যা খুশি করো,' বললো মিলি। 'আমি বরং চলে যাই। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই বাস পেয়ে

যাবো। এখানকার কাজ শেষ করে, আমার অ্যাপার্টমেন্টে পাবে আমাকে।'

'কোথাও যাচ্ছো না তুমি,' বললো অ্যারোনাফিস। 'অপেক্ষা করো, আমার সাথে গাড়িতেই ফিরবে।'

'দেখো, ডার্লিং, আমাকে থাকতে বাধ্য করো না।' রানার দিকে চট করে একবার তাকালো মিলি। তার দৃষ্টির অর্থ রানার বোধগম্য হলো না।

'তুমি থাকছো,' কঠিন সুরে বললো অ্যারোনাফিস।

সিধে হলো জর্জ। 'এমনভাবে বেঁধেছি, ওর বাপেরও সাধ্য নেই খোলে।' দুই হাত এক করে ঘষলো সে। 'এখানের কাজ শেষ।'

'প্রায়,' দ্রুত, ব্যস্ত কণ্ঠে বললো অ্যারোনাফিস। 'ওর গলায় একটা ফাঁস পরাও, ফাঁসের রশি গোড়ালির সাথে বাঁধো। চেয়ারে বসা অবস্থায় যাতে বেশি লাফাতে না পারে।'

ফাঁসটা রানার মাথায় গলালো জর্জ, রশিতে টান দেয়ায় ঘাড়টা পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো। কাজটা শেষ করলো জর্জ, কোনো রকমে দম ফেলতে পারছে রানা।

'গুড,' বললো অ্যারোনাফিস। 'এবার তুমি আর মিলি আমাকে সাহায্য করো, মি. প্যাসিমভকে গাড়িতে তুলতে হবে।'

'কেন?' জর্জের অস্বস্তি চাপা থাকলো না। 'দেখো, কোস্টাস, এখানে বেশি সময় নষ্ট করা মানে...।'

'আরে, শান্ত হও, দোস্ত। রানার কথায় তুমি ঘাবড়াচ্ছো নাকি? তুমি ঘাবড়ালে ওকে খুশি করা হবে, বুঝতে পারছো না?' চারদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজলো অ্যারোনাফিস, মেঝে থেকে এক টুকরো কাপড় তুলে নিয়ে রানার মুখে গুঁজে দিলো সে। 'এসো, মি.

প্যাসিমভকে তুলে নিয়ে যাই।’ রেগে গেছে সে, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে।

ইতস্তত করলো জর্জ, যেন উপলব্ধি করতে পারছে ঘটনাপ্রবাহ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

অ্যারোনাফিস বললো, ‘দু’জনকেই যদি এখানে রেখে যাই, কি ঘটবে তুমি বুঝতে পারছো না? পরস্পরকে সাহায্য করবে ওরা। সেটাই কি তুমি চাও?’ তার কথায় নরম সুর। ‘তাছাড়া, রানার খোঁজে কে.জি.বি. এজেন্ট এসে যদি মি. প্যাসিমভকে দেখতে পায়, পরে কি আর তারা তোমাকে মুক্তিপণের টাকা দেবে?’

‘কিন্তু ওঁকে আমরা কোথায় নিয়ে যাবো?’

চট করে হাতঘড়ি দেখলো অ্যারোনাফিস। ‘ইতিমধ্যে সম্ভবত আমার ইয়ট মানড্রাকি হারবারে নোঙর ফেলেছে। এসো, এসো—একটু পরই ভোর হয়ে যাবে।’

চলে গেল ওরা। নিকোলাই প্যাসিমভের মুখে কাপড় গোঁজা হয়েছে, অ্যারোনাফিস আর জর্জের মাঝখানে একটা বস্তার মতো ঝুলে থাকলেন তিনি। পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে।

কামরার ভেতর রানা একা। ও কি মৃত্যুর প্রহর গুনছে? কে জানে কখন আসবে কে.জি.বি.।

না, হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করা ওর স্বভাব নয়। পারুক আর না পারুক, বাঁচার চেষ্টা করতে হবে ওকে। বাঁধন ঢিলে করার জন্যে হাত আর পা মোচড়াতে শুরু করলো রানা। আকস্মিক টান পড়ায় ফাঁসটা চেপে বসলো গলায়, কয়েক সেকেণ্ড নিঃশ্বাস ফেলতে পারলো না। শব্দটা প্রথমে চেনা না গেলেও, পরে বুঝলো ওর গলা থেকেই বেরুচ্ছে । বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে ও। নড়লেই তীব্র ব্যথায় অবশ হয়ে গেল শরীর। এক সময় স্থির হয়ে

গেল ও। পরিস্থিতি সত্যি খারাপ, আশা করার মতো কিছু নেই।

কয়েক মিনিট পর অ্যারোনাফিস আর জর্জকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হলো রানা, ওদের সাথে মিলিও রয়েছে। কামরায় ঢোকার সময় কথা বলছে মিলি। 'গাড়িতে অপেক্ষা করতে পারতাম আমি,' বললো সে।

'মি. প্যাসিমভের সাথে একা তোমাকে রেখে আসবো ভেবেছো?' জবাব দিলো অ্যারোনাফিস। 'বিশেষ করে যখন জানি ভদ্রলোকের সাথে তোমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে?'

'তারমানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না!' চেঁচিয়ে উঠলো মিলি।

'না, করি না,' শান্তভাবে, মুখের ওপর বলে দিলো অ্যারোনাফিস।

জর্জ বললো, 'কিন্তু এ-সবের মানে কি? এখানে আর কি করার আছে আমাদের?'

'মানে?' অ্যারোনাফিস হাসলো না। 'মানে হলো, বন্ধু, তোমাকে বিদায় নিতে হবে।'

'কিন্তু···নাহ্, তুমি সিরিয়াস নও, কোস্টাস।' জর্জের ঠোঁট কাঁপছে। ভয় আর অবিশ্বাসে ঝুলে পড়েছে তার চোয়াল।

'তুমি একটা রামছাগল, তোমার স্বভাবই হলো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া। নাগাল পাবে না, এমন জিনিস ধরতে চেয়েছো তুমি। আমার কোনো সন্দেহ নেই, তোমার বিরুদ্ধে রানারও এই একই অভিযোগ রয়েছে।' জর্জের বুক লক্ষ্য করে পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করলো অ্যারোনাফিস।

পিস্তলের মাজলের ওপর চোখ রেখে পিছিয়ে যাচ্ছে জর্জ। 'তোমাকে বললাম না, অর্ধেক ভাগ দেবো? পাঁচ মিলিয়ন ডলার,

কোস্টাস। মনে রেখো, আমাকে ছাড়া টাকাটা পাবার কোনো উপায় নেই।'

'আমার কোনো আগ্রহ নেই। সত্যি বলছি।'

'দাঁড়াও!' রুদ্ধশ্বাসে হরহর করে কথা বলছে জর্জ, যেন কথা দিয়ে সে তার মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। 'ঠিক আছে, পুরো টাকাটাই তোমার। আমাকে শুধু এক হাজার ডলার দিয়ো। তাও শুধু দেনা আছে বলে চাইছি···।'

'তুমি আসলে এখনো বুঝতে পারছো না,' বললো অ্যারোনাফিস। 'আমি পেতে চাইছি একশো মিলিয়ন ডলার, একশো মিলিয়ন ডলার মূল্যের ইউরেনিয়াম অক্সাইড। মি. প্যাসিমভকে যতোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে তা যদি সত্যি হয়, আমার ধারণা রাশিয়ানরা খুশি হয়ে আমার সাথে একটা ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসবে–আফটার অল, ইউরেনিয়ামের জন্যে টাকা দেয়া হয়েছে তাদেরকে। মুক্তিপণ ছাড়া মি. প্যাসিমভকে ফিরে পেলে ইউরেনিয়ামের কথা ভুলে যেতে ওরা আপত্তি করবে না।'

মিলির দিকে ফিরলো জর্জ। 'ফর গডস সেক, কিছু একটা বলো তুমি!'

মিলি শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকলো, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'প্যাসিমভকে কিডন্যাপ করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না,' চিৎকার করলো জর্জ, মিলির ঘোর ভাঙাবার চেষ্টা করছে। 'আমার হাতে এসে পড়েন উনি। তারপর···তারপরই চিন্তাটা আমার মাথায় আসে।'

'সি.আই.এ. তোমার সাথে যোগাযোগ করেনি?' সবজান্তার শান্ত সুরে প্রশ্ন করলো অ্যারোনাফিস। রানার মুখ বন্ধ, তা না হলে

ঠিক এই প্রশ্নটাই করতো ও।

'ক. · ·করেছিল, কিন্তু তাদেরকে আমি কোনো কথা দিইনি...'

'আমার আর কিছু জানার বা বলার নেই।' শক্ত হলো অ্যারোনাফিসের চোয়াল, হাত লম্বা করে জর্জের হার্ট বরাবর লক্ষ্যস্থির করলো সে।

হাত দুটো ঝট করে সামনে বাড়িয়ে ঘন ঘন নাড়লো জর্জ। 'কোস্টাস! না, কোস্টাস...।'

তীক্ষ্ণ, ছোট্ট একটা শব্দ হলো।

'আহ্' করে উঠলো জর্জ।

মিলির চিবুকের ওপর রক্ত দেখলো রানা। গুলির শব্দ হতেই নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে। একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

সাত

আর কতো দেরি? কতোক্ষণ পর আসবে কে.জি.বি.?

আন্দাজ করতে পারলো না রানা, কারণ ওর জানা নেই অ্যারোনাফিস কখন যোগাযোগ করবে রাশিয়ানদের সাথে। রোডস টাউন মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। কে জানে ক'টা বাজে এখন, ঘড়ি দেখার উপায় নেই, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ভোর হবে কখন?

চেষ্টা করলে কে.জি.বি.-র সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবে অ্যারোনাফিস। ক্ষমতা, অর্থ, প্রভাব কোনো কিছুরই অভাব নেই লোকটার, তা না হলে এতো দীর্ঘকাল ধরে স্মাগলিঙ ব্যবসায় টিকে থাকতে পারতো না সে।

কে.জি.বি-র এমন একটা দলের প্রতিনিধিত্ব করছে কর্নেল রুস্তমভ, মাসুদ রানা যাদের চক্ষুশূল। অসহায় বন্দী অবস্থায় ওকে খুন করার সুযোগ পাওয়া যাবে, শোনামাত্র বিপুল উৎসাহের সাথে ছুটে আসবে তারা। আজকের দিনটা উৎসবে পরিণত হবে তাদের।

শক্ত ফাঁসটা চেপে বসেছে গলায়, রশির ঘষা লেগে ছড়ে গেছে চামড়া। গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে পিপাসায়। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে ওর, রক্ত চলাচল ক্ষীণ হয়ে আসায় গোড়ালি আর কব্জি দপদপ করছে। কেরোসিন কুপির শিখাটা কাঁপতে শুরু করলো। খানিক পর আবার স্থির হলো সেটা। হাজার বছরের পুরনো ভ্যাপসা গন্ধের সাথে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পোড়া কেরোসিনের গন্ধ।

কুপিটা সাদামাঠা টেবিলের ওপর, টেবিলের পাশের মেঝেতে পড়ে রয়েছে ডাচ জর্জ। তার মুখটা ডানে বা বাঁয়ে কাত হয়ে পড়েনি, আধ বোজা চোখ দুটো যেন আলোর সন্ধানে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের এক কোণ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে ফাঁক হয়ে আছে সামান্য, যেন মরে গিয়েও অভ্যেসটা ছাড়তে পারেনি সে, সাদা দাঁতের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে ভেতরে।

পকেট নাইফটার কথা মনে পড়লো রানার। বাক্স খোলার জন্যে ধার দিয়েছিল ওকে জর্জ। তার জাম্পসুটে কি ছুরিটা এখনো আছে? কিন্তু একটু নড়লেই যেখানে অসহ্য ব্যথা, জাম্পসুট থেকে

ওটা বের করবে কিভাবে?

জানে, চেষ্টা করার কোনো মানে হয় না।

তবু চেষ্টা করলো।

শরীর ঝাঁকিয়ে চেয়ারটাকে নাড়লো রানা। ফাঁসটা মাংসের ভেতরে ডেবে গেল, কামড়ে ধরলো শ্বাসনালী। গলার ভেতর দম আটকে যাওয়ায়, আকস্মিক আতংকের সাথে রানার মনে হলো, মারা যাচ্ছে সে। মনটাকে শান্ত রাখার জন্যে বার বার অটোসাজেশন দিলো নিজেকে। স্থির হয়ে আছে ও, ভয়ে নড়াচড়া করছে না। কিন্তু বাঁচার আকুতি আর জেদটা অসম্ভব বেড়ে গেছে। ব্যথা লাগবেই, সেটা সহ্য করে চেয়ারটাকে সরানো সম্ভব নয় কিছুতেই। কাজেই ব্যথা কম লাগার উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো রানা। একমাত্র সমাধান দিতে পারে আত্মসম্মোহন।

দুই কি তিন মিনিট গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলো রানা। শরীরটাকে ব্যথা-বেদনার ঊর্ধ্বে তুলতে পারলে ছুরিটা হয়তো হাতে পাওয়া সম্ভব। অবশ্য সেটা যদি জর্জের জাম্পসুটে এখনো থাকে।

চোখ মেললো, বড় করে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিলো। পুলকের সাথে অনুভব করলো, শ্বাস টানার সময় কোথাও কোনো ব্যথা অনুভব করেনি। প্রথমবার আস্তে করে শরীরটা ঝাঁকিয়ে সামান্য একটু সরালো চেয়ার। পরের বার আরো একটু জোরে। জাম্পসুট আর চেয়ারের মাঝখানে দূরত্বটা কমে এলো।

কিসের শব্দ হলো? স্থির হয়ে গেল রানা। কান পাতলো। বুট জুতোর শব্দ? নাকি কানের ভুল? দিনের আলো যদি ফুটেও থাকে, এই কামরা থেকে তা বোঝার কোনো উপায় আছে কি? কই,

কিছুই তো শুনতে পাচ্ছে না। আবার চেয়ারটা সরাতে গিয়ে ব্যথা পেলো রানা, বেরুবার পথ না পেয়ে গলায় আটকে গেল নিঃশ্বাস। বমি পেলো ওর।

মুখে ন্যাকড়া থাকায়, বমি হলে নির্ঘাত মারা যাবে রানা।

নিঃশ্বাস ফেলতে না পারায় শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় জমা হয়েছে, দপ দপ করছে খুলির ভেতরটা। যে-কোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে ও। কিন্তু আশাটা ত্যাগ করেনি এখনো। একবার যদি ছুরিটা হাতে আসতো!

আততায়ীরা আসবে, সচেতনভাবে শুধু এই একটা কথা চিন্তা করতে পারছে রানা। মনে মনে জানে, তারা এসে পৌঁছুবার আগে ওর পালাবার চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা নেই। তাই বলে হাল ছাড়তে রাজি নয়। আবার কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার চেষ্টা করলো ও। গলার পেশীতে ঢিল পড়ায় আটকে থাকা বাতাস ধীরে ধীরে বেরুতে শুরু করলো। সাবধানে শ্বাস নিলো রানা, থেমে থেমে। সারা শরীরে আরামদায়ক একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। খানিকক্ষণের মধ্যেই প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এলো শ্বাস-প্রশ্বাস।

বিশ্রামের সময় ইউরেনিয়ামের কথা মনে পড়লো ওর। অ্যারোনাফিস বললো, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কাজে ব্যবহারের জন্যে ইটালিতে পাঠানোর প্ল্যান ছিলো। কিন্তু রাশিয়ানদের কি বোকা বানাতে পেরেছে অ্যারোনাফিস? রাশিয়ানরা কি সত্যি বিশ্বাস করেছে, তাদের ইউরেনিয়াম ইটালিতে যাবে? বার বার চেক করে না দেখার কোনো কারণ নেই, বিশেষ করে জিনিসটা যখন ইউরেনিয়াম। একাধিকবার পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারে রাশিয়ানদের সুখ্যাতি আছে। এর আগে তারা কখনো পশ্চিমা জগতে ইউরেনিয়াম বিক্রি করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায়নি।

এবার তারা এতোই ব্যগ্র হয়ে উঠলো যে অ্যারোনাফিসের বানানো গল্পটা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজনীয়তাটুকুও অনুভব করলো না? খোঁজ-খবর করা তেমন কঠিন কিছু নয়। চেষ্টা করলে অবশ্যই আসল তথ্য বেরিয়ে পড়তো।

নাকি ব্যাপারটা আসলে চোরের ওপর বাটপারি? ষড়যন্ত্রের ভেতর আরেকটা ষড়যন্ত্র নয়তো? শুধু সন্দেহ ও অনুমান, প্রমাণ করার জন্যে নিরেট কিছু নেই রানার।

পরিষ্কার ধারণা শুধু একটা ব্যাপারে আছে, রাশিয়া কোনো অবস্থাতেই চাইতে পারে না লিমবেরি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হোক।

অথচ, ইউরেনিয়াম ফিরে পাবার পর, দক্ষিণ দিকে রওনা হলো তারা, মনে হলো যেন লিমবেরির দিকেই ইউরেনিয়াম নিয়ে যাচ্ছে।

ধাঁধাটা এখানেই।

সমস্যাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো রানা।

নিজেকে প্রায় কোনো নোটিশ না দিয়েই, ঝোঁকের মাথায়, এক করা পা দুটোর সাহায্যে চেয়ার নিয়ে লাফ দিলো ও। ভয় ছিলো, চেয়ারটা পড়ে গেলে ফাঁসটা চারদিক থেকে চেপে বসে খুন করবে ওকে, রশিতে হ্যাঁচকা টান লাগলে ঘাড়টা ভেঙে যাবে।

চেয়ারের পায়াগুলো মেঝে থেকে শূন্যে উঠে পড়লো। চোখে সর্ষে ফুল দেখলো রানা। দুলতে শুরু করলো হলদেটে কামরা। চেয়ারটা থেমেছে, কিন্তু রানার প্রায় কোনো হুঁশ নেই। ইচ্ছে শক্তির জোরে ধীরে ধীরে পুরোপুরি সচেতনতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো ও।

বাতাস পাচ্ছে যেন সরু আর ভঙ্গুর একটা খড়ের ভেতর দিয়ে। শ্বাসনালীটা যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, মুখের ভেতর রক্তের লোনা স্বাদ।

অন্তত এখনো বেঁচে আছে ও।

হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লাশটার দিকে তাকালো রানা। অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলো, ওর পায়ের আঙুল লাশটাকে ছুঁয়ে আছে। গন্তব্যে পৌঁচেছে ও, কিন্তু এরপর কি? চেয়ারের পিছন দিকে ঢিল করে দিলো শরীরটা, রশির টান টান ভাব যতোটা সম্ভব গলা থেকে শিথিল করার চেষ্টা করলো। তারপরও স্বস্তিকর লাগলো না। দাঁতের সারি দুটো পরস্পরের সাথে চেপে থাকায় টন টন করছে চোয়াল। হাত দুটোয় ব্যথার কোনো অনুভূতি নেই, অবশ হয়ে আছে।

জর্জের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘর-ঘর নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনছে রানা। মাথাটা ঘুরছে এখনো। বোকামি করায় কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে জর্জকে। এসপিওনাজ জগতে ভুলের মাশুল একটাই–জীবন, আগে বা পরে। সে কি জানতো না, তাকে ধরার জন্যে যে-কোনো দূরত্ব অতিক্রম করবে রানা। তবু, মনির হোসেন মারা গেছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানার জন্যে উইণ্ডমিলে যদি সে ফিরে না আসতো...

কিন্তু বোকার মতো ফিরলো সে।

তার আরেকটা বোকামি হলো অ্যারোনাফিসকে বিশ্বাস করা।

দূরে কোথাও একটা মোরগ ডাকলো, সেই সাথে বর্তমানে ফিরে এলো রানা। কামরার চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে দেখলো পুবদিকের একটা জানালার ফুটোয় ক্ষীণ আলোর আভাস। ভোর

হয়ে গেছে।

বোধ আর অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে রানার। নড়তে ইচ্ছে করছে না। গলার কাছে বমির ভাব আটকে আছে। দপ দপ করছে মাথা। আরো যেন অসুস্থ হয়ে পড়লে ভালো হয়, তাহলে জ্ঞান হারাবে।

মিলির কথা মনে পড়লো ওর, অ্যারোনাফিসের স্টাডিতে ছোট্ট কিন্তু মোহনীয় অভিনয় করেছে ওর সাথে। তারপর নিজের চারদিকে নির্লিপ্ততার একটা পাঁচিল তুলে দেয় মেয়েটা, অন্তত ওর বিরুদ্ধে।

যৌনাবেদনময়ীর ভূমিকা–নিশ্চয়ই তার একটা কারণ আছে। কেউ ভয় দেখালেই যথেষ্ট। কিংবা স্রেফ নির্দয়তা, অর্থাৎ বেঈমানী। অন্তত এটুকু পরিষ্কার যে অ্যারোনাফিসের সাথে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে মিলি। অন্য কিছু মনে হবার কারণ নেই।

গলায় বাতাস আটকে যাওয়ায় ব্যথা পেলো রানা, পানি বেরিয়ে এলো চোখের কোণে। কাশির একটা ঝোঁক দমন করলো, মুখভর্তি নোংরা ন্যাকড়া মুখের সমস্ত লালা শুষে নিয়েছে। ঘামের ফোঁটা জ্বালা ধরিয়ে দিলো চোখে। মনে হলো গোটা শরীর আগুনের মতো গরম হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ তো হলো। আর বেশি দেরি নেই। যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসবে খুনীরা।

চেয়ারটা দু'ফুট সরাতে কতোক্ষণ সময় নিয়েছে বলতে পারবে না রানা। প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছে ওকে, অসম্ভব ধকল গেছে শরীরটার ওপর, তারপরও পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। জর্জের মৃতদেহ পায়ের আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারছে বটে, কিন্তু হাত দিয়ে জাম্পসুটের নাগাল পাবে না। আবার, হাত দুটো মুক্ত করাও সম্ভব

নয়। জাম্পসুটের পকেট থেকে ছুরিটা বের করাই প্রধান সমস্যা। ছুরিটা আগে যেখানে রাখা ছিলো সেখানেই আছে কিনা তা-ও জানা নেই। তা যদি রাখা হয়ে থাকে, ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। নিচের দিকে তাকিয়ে পকেটটা দেখতে পাচ্ছে রানা। লাশের নিতম্বে সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে পকেটের মুখ।

বাইরে থেকে গরু বা ছাগলের গলায় বাঁধা ঘন্টার টুং টাং শব্দ ভেসে এলো। জানালার আরো কয়েকটা ফুটোয় ভোরের ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জেগে উঠবে লিনডোস। অ্যারোনাফিস চাইবে তার আগেই রাশিয়ানরা যেন এখানে পৌঁছুতে পারে।

কুপির শিখাটা আবার কাঁপতে শুরু করলো। কালো ধোঁয়ায় ভরে উঠলো কামরার বাতাস। সলতের পোড়া খানিকটা অংশ বাতাসে ভাসতে ভাসতে রানার পায়ের পাতায় পড়লো। নিভে গেল কুপিটা। সম্ভবত কেরোসিন শেষ হয়ে গেছে।

জানালার ফুটো দিয়ে চুইয়ে ঢোকা ভোরের অল্প আলোয় কামরাটা ঝাপসা লাগলো চোখে। চারদিকে গাঢ় ছায়া।

ছুরির নাগাল পেলেই বা কি হবে, অবশ হাত দুটো ওর নির্দেশ শুনবে কিনা কে জানে। বাঁধন কাটতে হলে ছুরিটা খুলতে হবে তো।

সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে, শুধু একটা কথা মাথায় ধরে রাখলো রানা। চেষ্টা করতে হবে। ঘাড় থেকে যে রশিটা গোড়ালিতে নেমে গেছে, সেই একই রশি দিয়ে ওর কব্জি বাঁধা হয়নি। গলায় ফাঁসের চাপ না বাড়িয়ে হাত দুটো নাড়াচাড়া করা সম্ভব। হাত দুটো মোচড়ালো রানা, বাঁধনগুলো ঢিল করা যায় কিনা দেখছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে ব্যথা, গোঙাচ্ছে, ফোঁপাচ্ছে। ইচ্ছে হলেও

ঢোক গিলতে পারছে না ও। ঘামে ভিজে গেছে গোটা শরীর। তারপরও যেমন বন্দী ছিলো তেমনি থাকলো ও, নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না।

ক্ষীণ একটা মাত্র আশা আছে।

চেয়ারটা যদি ঘুরিয়ে নেয় রানা, ওর পিঠ থাকবে জর্জের দিকে। পিছন দিকে ঝুঁকবে ও, এমনভাবে পিছন দিকে পড়বে যাতে হাত দুটো পকেটটার নাগাল পায়।

রশিতে টান পড়ায় ঘাড়টা মটকে যেতে পারে। ঘাড় যদি না-ও ভাঙে, ফাঁসটা এঁটে বসতে পারে গলায়, থেঁতলে দিতে পারে কণ্ঠনালী, বন্ধ হয়ে যেতে পারে বাতাস আসা-যাওয়ার সরু পথটা। কিংবা মেঝেতে সজোরে ঠুকে যেতে পারে মাথা, রাশিয়ানরা এসে দেখবে তাদের শিকার মরে বা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে।

তবে, কিছু যদি না-ও করে, মৃত্যু অবধারিত।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো রানা। কিছুই আসলে হারাবার নেই ওর।

প্রথমে চেয়ার ঘোরাবার নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, যাতে ওর পিঠ জর্জের দিকে আর হাত দুটো যতোটা সম্ভব পকেটটার সাথে একই লাইনে থাকে। কাজটার মাঝপথে রয়েছে রানা, সর্ষে ফুল দেখছে চোখে, বমি করছে নাক দিয়ে, ঠিক এইরকম সময় ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো ও।

আতংকের সাথে অনুভব করলো রানা, পিছন দিকে পড়ে যাচ্ছে চেয়ারটা। টেবিলটার সাথে সজোরে বাড়ি খেলো একটা কাঁধ, শরীরটা মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো, কাঁচের কুপিটা মেঝেতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো সশব্দে। জর্জের লাশের ওপর হালকাভাবে পড়লো রানা, মাথাটা ঠুকে গেল মেঝেতে।

আলোর একটা বিস্ফোরণ দেখতে পেলো রানা, ফাঁসটার পীড়ন অস্পষ্টভাবে টের পেলো গলায়। দুর্বল আঙুলগুলো জাম্পসুটের পকেট হাতড়াচ্ছে। কিছুই ঠেকলো না আঙুলের ডগায়।

ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি।

মুখের ভেতর কাপড়টা গলা বেয়ে নেমে যেতে চাইছে। বুকের খাঁচায় ছটফট করছে হৃৎপিণ্ড। অসহায় ভঙ্গিতে হাতের আঙুলগুলো বারবার গুটিয়ে আসছে।

থরথর করে কেঁপে উঠলো সারা শরীর। হাতের আঙুল খুলে গেল, টান টান হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

নেতিয়ে পড়লো রানা।

দূর থেকে ভেসে এলো দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ।

ঠাণ্ডা বাতাসের পরশটা অনুভব করলো রানা, কিন্তু শরীরটা নিজের কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না।

পায়ের আওয়াজটা ফাঁপা লাগলো কানে।

বেঁচে থাকার অনুভূতিটা শুধু মনের নিভৃত এক কোণে টিমটিম করে জ্বলছে। ওটার কোনো হিসেব জ্ঞান নেই, কিছুই মেলাতে পারে না, যৌক্তিকতা বোঝে না। শরীরটাই শুধু সচেতন, তা-ও পুরোপুরি নয়, মাঝে মধ্যে ছেদ পড়ছে। মৃত্যুর দিকে এতোটা কখনো তলিয়ে যায়নি ও।

আদিম একটা ভয় গ্রাস করলো ওকে, খাড়া হয়ে উঠলো লোমকূপ। কাকে ভয়, কিসের ভয়, জানে না। কোনো কারণ বা যুক্তি পরিষ্কার নয়, তবু ওর সচেতনতা প্রখর হয়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, চোখ না খুলেই দেখার চেষ্টা করলো সামনে কি আছে।

নড়াচড়া করায় টান পড়লো গলার ফাঁসে, এই প্রথম ব্যথাটা চিনতে পারলো রানা। মনে হলো কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, আসলে পেরিয়েছে কয়েকটা সেকেণ্ড, এই সময় চোখের পাতার উল্টাদিকটা ঝাপসাভাবে দেখতে পেলো ও। পাতার পাতলা চামড়া ভেদ করে ক্ষীণ আলো পড়েছে মণিতে।

বাতাসের অভাবে ফুসফুসে যেন আগুন জ্বলছে।

পায়ের শব্দ কাছে চলে এলো।

কে. জি. বি। অক্ষর তিনটে মনে পড়ে গেল রানার।

শিউরে উঠলো আতংকে।

'রানা? মাসুদ রানা?'

কে ডাকে? চোখের পাতা কেঁপে উঠলো রানার।

ধোঁয়াটে, ঝাপসা লাগলো সামনেটা। মানুষের একটা কাঠামো চিনতে পারলো ও। তারপর প্রায় পরিষ্কার দেখতে পেলো মিলিকে।

দ্রুত হাঁটু গেড়ে বসলো সে, মুখ থেকে টেনে বের করলো ন্যাকড়াটা। 'রানা?'

কথা বলার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু পারলো না। খানিকটা পিছিয়ে গেল মিলি, জটিল বাঁধনগুলো পরীক্ষা করলো। দু'সারি দাঁত ঘষলো রানা, চেহারায় দ্রুত বাঁধন খুলে দেয়ার মৌন আবেদন।

মিলির ব্যস্ত আঙুল কাজ শুরু করলো, প্রবল তাগাদায় হাত দুটো কাঁপছে। কিন্তু গিঁটগুলো শক্ত আর আঁট হয়ে গেছে, শুধু হাত দিয়ে খোলা সম্ভব নয়। রানা অনুভব করলো, আবার বেহুঁশ হয়ে পড়ছে। সচেতনতা ধরে রাখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো ও, চোখ ঘুরিয়ে কুপির ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকালো।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে কাঁচের টুকরোগুলো দেখতে পেলো মিলি, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চোখ, ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো একটা। ঘাড় আর গোড়ালির মাঝখানে রশিটা কাটতে শুরু করলো সে। তার মাথা থেকে পর্দার মতো নেমে এসে মুখের একটা পাশ ঢেকে দিলো কালো চুল। আকস্মিক একটা টানের সাথে ঢিল পড়লো রশিতে, কৃতজ্ঞচিত্তে বেদনাকাতর ফুসফুসে সশব্দে বাতাস ভরলো রানা। নিঃসাড় শুয়ে থাকলো ও, শুধুই শ্বাস টানছে আর ফেলছে। বসে নেই মিলি, রানার হাত আর পায়ের বাঁধন কাটছে ব্যস্ততার সাথে।

গায়ের জোর খাটাতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ বেরিয়ে এলো মিলির গলা থেকে, রানার জ্যাকেটের কাঁধ ধরে টান দিলো সে, ওকে বসাবার চেষ্টা করলো।

'একটু পর,' হাসলো রানা, আচ্ছন্নবোধ করলো । ক্ষতবিক্ষত গলা থেকে আওয়াজটা বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ অচেনা, কর্কশ। 'দরজার দিকে লক্ষ্য রাখো।' পরিষ্কার হয়ে আসছে মাথাটা। লাফ দিয়ে দাঁড়ালো মিলি, হরিণীর ত্রস্ত পায়ে দরজার দিকে ছুটলো। পাশ ফিরে হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করলো রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা দূর করতে চাইলো।

'কেউ নেই,' ফিরে এসে বললো মিলি।

'তোমার একটা হাত দাও,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললো রানা, কাশির বেগটা দমন করতে পারলো না। কাশি থামার পর নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলো। ফুলে উঠেছে ওগুলো, কোথাও কালচে আবার কোথাও লালচে হয়ে উঠেছে।

জর্জের ওপর ঝুঁকে আড়ষ্ট হয়ে গেল মিলি।

'ওকে তুমি বাঁচাতে পারতে না,' বললো রানা। 'সে-চেষ্টা

করলে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনতে।'

'তোমার জন্যে ফিরে এসেছি আমি। চেষ্টা করেছি, কিন্তু আরো আগে আসার সুযোগ পাইনি।' রানার দিকে একটা হাত বাড়ালো মিলি।

হাতটা ধরে ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, পা দুটোকে মনে হলো লোহার পাত, গোড়ালির সাথে কব্জা দিয়ে আটকানো। শরীরের ভার পায়ের তলায় হাজারটা ছুরির কোপ মারলো যেন, যেন ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটছে ও। টলে উঠলো শরীরটা, পড়ে যাচ্ছে শেষ মুহূর্তে আবার সিধে হলো।

'তুমি সুস্থ নও, রানা!' উদ্বিগ্ন মিলি সতর্ক করে দিলো ওকে।

'কয়েক মিনিট সময় দাও।'

'এসো,' রানাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো মিলি। 'শোও।'

'না!' পরমুহূর্তে নিজেকে শান্ত করলো রানা। 'না।' নিজেকে ছাড়ালো ও। 'সময় নেই, মিলি। আমাকে এক ঢোক পানি খাওয়াতে পারো?'

'পানি ? হ্যাঁ, পানি!' একটা দোরগোড়া টপকে ছুটলো মিলি, ভারি সবুজ পর্দাটা দুলছে। মুহূর্তের জন্যে। লালচে একটা কার্পেট, বিখ্যাত এক সিগারেট কোম্পানীর মোটাসোটা একটা পঞ্জিকা দেখতে পেলো রানা। একটা মগ হাতে ছুটে এলো মিলি, কিনারা থেকে পানি ছলকাচ্ছে। ঠাণ্ডা পানিতে গলার ভেতরটা আরাম লাগলো, লোভীর মতো ঢক ঢক করে মগটা খালি করে ফেললো রানা।

মিলি বললো,'আমি জানতাম, তোমাকে সাহায্য করতে হলে ভান করতে হবে আমাকে, যেন তোমার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। কোস্টাস যখন বললো রাশিয়ানদের জন্যে এখানে

রেখে যাবে তোমাকে, একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলাম।’

মগটা টেবিলে রেখে বড় করে শ্বাস টানলো রানা। ‘কিভাবে এলে?’ জানতে চাইলো ও।

‘গাড়িতে অসুস্থ হবার ভান করলাম,’ বললো মিলি। ‘ওর ধারণা, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আছি আমি, বিশ্রাম নিচ্ছি। গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়ার সময় বললো, মেয়েরা সত্যি দুর্বল।’

টেবিলের পাশে এক পা এক পা করে হাঁটলো রানা। তারপর দরজার দিকে ঘুরলো। গলার ভেতরে ও বাইরে এখনো ব্যথা করছে। ‘চলো, বেরিয়ে যাই এখান থেকে,’ নিচু গলায় বললো ও।

‘দাঁড়াও—তুমি বুঝতে পারছো না!’ রানার বুকে একটা হাত রাখলো মিলি। ‘মি. প্যাসিমভকেও আমাদের বাঁচাতে হবে।’

‘অবশ্যই। কিন্তু তার আগে নিজেদের বেঁচে থাকতে হবে।’ দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলো রানা। ঝট্ করে মাথাটা টেনে নিয়ে পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকালো, হতাশায় কালো হয়ে গেল চেহারা।

রানার চোখ আর চেহারা দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল মিলি। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলো সে, তারপর ফিসফিস করে জানতে চাইলো, ‘কে.জি.বি?’

ক্লান্তভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো রানা।

আট

সরু গলি ধরে তিনজন আসছে ওরা, সবার আগে রয়েছে পরিশ্রমী চাষীর মতো দেখতে লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি। হাঁটার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কারো অবাঞ্ছিত দৃষ্টি আকৃষ্ট না করার নিয়মটা পালন করছে। প্রত্যেকের মাথায় স্ট্র হ্যাট, দ্বীপেই তৈরি হয়, দ্বীপবাসীদের অত্যন্ত প্রিয়। তিনজনের কাঁধে একটা করে ক্যামেরাও ঝুলছে।

ওদের বিশ্বাস করার কারণ আছে, পৌঁছুতে একটু দেরি হলেও পাওয়া যাবে রানাকে।

ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়েছে দু'চারজন বৃদ্ধ বা মহিলা, সমর্থ পুরুষরা সাগর থেকে ফিরে ঘুমাতে গেছে। জেলেদের মধ্যে যারা মাছ ধরে না, তাদের আয়-রোজগার নির্ভর করে ট্যুরিস্টদের ওপর। ট্যুরিস্টরা আসবে আরো অনেক বেলায়। রানার হাতঘড়িতে এখন মাত্র পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিট।

ভোরের এই সময়টায় যা খুশি তাই করে নির্বিঘ্নে কেটে পড়ার সুযোগ আছে কে.জি.বি. এজেন্টদের। রাস্তায় কাউকে গুলি করাটাও তার মধ্যে পড়ে।

পায়ের তলায় এখনো পুরোপুরি সাড়া নেই রানার, অনেকটা

লাফানোর ভঙ্গিতে দ্রুত হাঁটলো ও, জর্জের লাশটা টপকালো, ঢুকলো কিচেনে, সেখান থেকে খিড়কি দরজা দিয়ে বাগানে।

ছোট্ট বাগান, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। করবী গাছের সরু আর নরম ডালের সাথে রক্তকরবী ঝুলছে। পাথুরে মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে তুঁতফল। মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। খেতের দিক থেকে ফসলের একটা গন্ধ ভেসে আসছে।

রানাকে ধরে ফেললো মিলি। 'না, রানা!' হাঁপাচ্ছে সে। 'পালিয়ো না!'

'কি হলো তোমার ?' রানা হতভম্ব।

'মি. প্যাসিমভ...ওকে আমাদের সাহায্য করতে হবে!'

মেয়েটার শরীর ও মন, দুটোর ওপর দিয়েই প্রচণ্ড ধকল গেছে। কোন্ কাজের কি গুরুত্ব বুঝতে পারছে না বেচারি। রানা চিৎকার করতে চাইলেও, আহত গলা বাধা দিলো ওকে, 'কিন্তু তিনি তো এখানে নেই!'

'না, তবে...'

'তাহলে আমাদের কথা আগে আসে।'

রঙচটা কাঠের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এলো রানা, ফুলে ওঠা হাত দুটোর নার্ভ ঝাঁকি লাগলে প্রতিবার প্রতিবাদ করছে।

পিছন থেকে রানার শার্টের আস্তিন খামচে ধরলো মিলি, রাগের সাথে টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিলো রানা। মেয়েটার আচরণ দেখে মনে হলো বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

বাড়িটা গ্রামের কিনারায়, রানার সামনে বেঢপ আকৃতির পাথরের স্তূপ, কাঁটাঝোপের আড়ালে পাথুরে পাঁচিল, নিঃসঙ্গ জলপাই গাছ সহ পাহাড়ের খাড়া কাঁধ ছাড়া আর কিছু নেই। পাহাড়ের মাথায় দুর্গ, প্রাচীন কীর্তির স্বাক্ষর।

শিশির ভেজা ঢাল। বাতাসে ফুলের সুগন্ধ। কখনো ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে রানা। ব্যথাটা অনুভব করে খুশি হয়ে উঠলো ওর মন, অনুভূতি ফিরে আসছে পায়ে, জোর পাচ্ছে ভর দেয়ার সময়। উঠে আসছে মিলি, নধর নিতম্ব প্রতিটি ঝাঁকির সাথে নারীসুলভ দোল খাচ্ছে। এদিকে মানুষজনের কোনো চিহ্ন নেই। নিচে সেন্ট পল'স বে, সাগর ওখানে নীল প্রজাপতির ডানার মতো ঝলমলে। মাথার ওপর, একদম কাছে, ঝুলে রয়েছে দুর্গটা।

উপসাগর আর পাহাড়চূড়ার মাঝখানে সরলরেখার মতো ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামটা। আবার ওপর দিকে দৃষ্টি তুলে উঠতে শুরু করলো রানা।

এই সময় অনেক নিচ থেকে ভেসে আসা একটা চিৎকার ঢুকলো ওর কানে। বুঝলো, ওদেরকে দেখে ফেলেছে।

ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকালো রানা, ঠাণ্ডা বাতাসেও দর দর করে ঘামছে ও। ইতিমধ্যে যথেষ্ট ওপরে উঠে এসেছে ওরা, নিচের লাল টালি দিয়ে ছাওয়া বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে বাড়িগুলোর সামনের রাস্তাটা। তিনটে মূর্তি ছিটকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে যাবে ওরা, শুরু হবে ধাওয়া।

কয়েক গজ পিছন থেকে ফুঁপিয়ে উঠে কি যেন বললো মিলি, তার লম্বা কালো চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

'এক মিনিটের মধ্যে পিছনে চলে আসবে ওরা,' সতর্ক করলো রানা, গলার স্বরে উত্তেজনা।

'রানা…তোমার কাছে পিস্তল নেই?'

'জানোই তো নেই।'

খাড়া ঢাল, কোমর ভাঁজ করে নিচের দিকে ঝুঁকে উঠে যাচ্ছে রানা। শরীরটা আগের চেয়ে অনেক সুস্থ লাগছে। দ্রুত ফিরে আসছে শক্তি। শুধু গলাটা ব্যথা করছে এখনো। দুর্গের গোড়ায় গাছপালা একটা পাঁচিল তৈরি করেছে। ওটার পিছনে যদি যেতে পারতো ওরা…।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে নিচের দিকে তাকালো রানা। সাদা চুনকাম করা বাড়িগুলো রোদ লেগে চক চক করছে, ব্যথা করে উঠলো চোখ।

বাগানের গেট বিস্ফোরিত হলো, বেরিয়ে এলো লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি।

পিস্তলের গুলি হলো, শব্দগুলো ভোঁতা লাগলো কানে। সরে গিয়ে একটা জলপাই গাছের আড়ালে দাঁড়ালো ও, মিলির জন্যে অপেক্ষা করলো, নাগালের মধ্যে পেয়ে হ্যাঁচকা টানে আড়ালে নিয়ে এলো তাকে।

'আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মিলি। 'তুমি যদি ফিরে যাও…।'

দু'হাতে তাকে ধরে ঝাঁকালো রানা। 'তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে মুক্ত করেছো একদল হাঙরের মুখে তুলে দেয়ার জন্যে?'

'তোমাকে আমি কখন থেকে বলার চেষ্টা করছি, মি. প্যাসিমভ একটা চুক্তি করতে চান…।'

'তুমি থামবে, ফর গডস সেক?'

পাহাড় বেয়ে ছুটে আসছে জাগোরস্কি, ঘন ঘন হোঁচট খাচ্ছে সে, গাল পাড়ছে, লাল মুখটা হিংস্র পশুর মতো। বাকি দু'জনকে বাগানের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখলো রানা।

ওপর দিকে তাকিয়ে দুর্গের গোড়া আর গাছগুলোর দূরত্ব অনুমান করার চেষ্টা করলো ও। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ গজ হবে। দীর্ঘ, বিপজ্জনক পঞ্চাশ গজ। বিপদের মাত্রা কয়েকশো গুণ বেড়ে যেতে পারে মিলি যদি বোঝা হয়ে দাঁড়ায় বা অসহযোগিতা করে।

রানাকে দ্রুত ওপর দিকে তাকাতে দেখে মিলিও শক্ত করলো মনটা। ক্লান্ত সে, কিন্তু এখনো নেতিয়ে পড়েনি। নিঃশ্বাস ফেলছে কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। সাদা স্ল্যাকস হাঁটুর কাছে ছিঁড়ে গেছে, রোদে পোড়া তামাটে নরম চামড়া ছড়ে গেছে।

'এক ছুটে উঠতে হবে, মিলি,' বললো রানা। 'পারবে?'

'কিন্তু ওদের কাছে পিস্তল রয়েছে!'

'এঁকেবেঁকে দৌড়াবে।'

'কি লাভ, রানা? পালানো সম্ভব নয়, যদি না...।'

তাকে থামিয়ে দিলো রানা, 'ওপরে নিশ্চয়ই লুকোবার কোনো জায়গা পাবো।'

রানার ওপর স্থির হয়ে থাকলো মিলির দৃষ্টি, চোখ জোড়া বিস্ফোরিত। 'তুমি ছুটলে ওরা তোমাকে গুলি করে মারবে।'

'ধরতে পারলেও মারবে,' ধৈর্য হারিয়ে হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে ঝাঁকালো রানা। তারপর, মিলিকে অগ্রাহ্য করে, লাফ দিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটলো। আলগা পাথরে বারবার পিছলে গেল পা, কাঁটাঝোপে ঘষা খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হলো গোড়ালি। রানার পিছু নিতে দেরি করেনি মিলি।

আকাশ যেন স্বচ্ছ নীল লেন্স, রোদের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে প্রখর করে তুলেছে, গোটা পাহাড়ী এলাকা যেন আগুনের শিখায় পরিণত হবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। তবু ধূসর ঘাসে এখনো কিছুটা শিশির লেগে রয়েছে। ডানা ঝাপটে একটা বাজপাখি উড়ে এলো,

মাথার ওপর স্থির হলো এক মুহূর্তের জন্যে, দিক বদলে চলে গেল বাঁ দিকে।

রানার চোখের কোণে আরো কি যেন একটা ধরা পড়লো।

নিচে, কে.জি.বি. এজেন্টদের বাম দিকে, গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হলো আরো দু'জন লোক, পাহাড় ঘুরে আরেক দিকে ছুটছে তারা, রানাকে যেন সামনের দিক থেকে বাধা দেয়ার ইচ্ছে।

রানা ছুটছে। আপাতত পিস্তলের কোনো শব্দ নেই। সাইডআর্ম-এর জন্যে দূরত্ব একটু বেশি হয়ে যায়, জাগোরস্কি তার অ্যামুনিশন অপব্যয় করছে না। শিখা আকৃতির সাইপ্রেস গাছগুলোকে ছাড়িয়ে এলো রানা, ঘন ছায়ার ওপর ধপাস করে বসে পড়লো। কয়েক সেকেণ্ড পর হোঁচট খেতে খেতে পৌঁছুলো মিলি, প্রায় আছাড় খেয়ে পড়লো রানার পাশে, সশব্দে বাতাস টানছে।

দুর্গ প্রাচীরের গোড়ায় বিপুল আবর্জনা দেখা গেল। বোল্ডার তো আছেই, তার সাথে রয়েছে বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ, গাছের শুকনো ডালপালা, খসে পড়া পাঁচিল–যতোদূর দৃষ্টি চলে। সেদিকে তাকিয়ে রানা বললো, 'ওদিকে যাবো আমরা, টানেল বা গুহা কিছু একটা পেয়ে যেতে পারি।'

'যতো যাই করো, ওদের হাতে ধরা দিতে হবে আমাদের,' হতাশ সুরে বললো মিলি।

'রানা…,' হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করে রানার জ্যাকেটের সামনেটা খামচে ধরলো মিলি। '…তুমি যদি মি. প্যাসিমভের কথা নিয়ে ওদের কাছে যাও, গিয়ে বলো যে তুমি জানো কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে…তোমাকে রেহাই দেয়ার বিনিময়ে তাঁর কাছে ওদেরকে নিয়ে যেতে রাজি আছো… ।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' রেগে গিয়ে বললো রানা। 'ভেবেছো ওরা কথা রাখবে?'

'এখনো তিনি কোস্টাসের ইয়টে আছেন,' বললো মিলি, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি।

'ঠিক জানো তুমি?' জানা দরকার রানার।

'আমার কথা শুনবে তুমি?' ফিরে যাবে? ওদের সাথে কথা বলে দেখবে?' ব্যাকুল চোখে রানার দিকে তাকালো মিলি।

'তুমি ভাবতে পারলে, ওদেরকে আমি তাঁর কাছে নিয়ে যাবো?' ঠোঁটের কোণে ঘামের স্বাদ পেলো রানা। বাতাসে দারুচিনি আর সাগরের লোনা গন্ধ। ট্যুরিস্টরা আসতে শুরু করলে, চিন্তা করলো রানা, কে.জি.বি. এজেন্টরা সাবধান হয়ে যাবে। তখন একটা সুযোগ পাবে ও। ততোক্ষণ লুকিয়ে থাকার মতো একটা জায়গা পেলে হতো।

'রানা, আমার কথা শোনো…।'

'তুমি যাও, যা খুশি বলো ওদেরকে।'

'আমার কথায় ওরা গুরুত্ব দেবে না। অন্তত তোমাকে খুন করার আগে নয়।'

'প্যাসিমভের ব্যাপারটা কি বলো তো? তিনি কি জানেন না, তাঁকে নিয়ে অ্যারোনাফিস রাশিয়ানদের সাথে ব্যবসা করতে চাইছে?'

'এমনও তো হতে পারে, রাশিয়ানরা রাজি হলো না। সেক্ষেত্রে আমেরিকানদের সাথে ব্যবসা করার চেষ্টা করবে কোস্টাস। কিন্তু আমি জানি, রানা, মি. প্যাসিমভ নিজের দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। কোস্টাসকেও তিনি বিশ্বাস করেন না, বলেছেন আমাকে। সেজন্যেই তো ভয় পাচ্ছি, কখন না কি

ঘটে যায়।' রানার আরো কাছে সরে এলো মিলি, ওর দু'চোখে উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা। 'তিনি মহৎ ব্যক্তি, রানা। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। একটা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি, পারমাণবিক দুঃস্বপ্ন থেকে চিরকালের জন্যে দুনিয়ার মানুষকে মুক্তি দিতে চান। কিন্তু, সবার ওপরে স্বদেশ, এ-কথা বারবার আমাকে বলেছেন। দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসেন তিনি। আমি কথা দিয়েছি, সম্ভাব্য সব রকমভাবে সাহায্য করবো তাঁকে।'

তিক্ত হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটে। 'তুমি জানো না কিসের সাথে জড়াতে চাইছো নিজেকে। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, বেশিরভাগই তা সত্যি নয়। এসপিওনাজ মানে হলো প্যাঁচের ভেতর প্যাঁচ, ষড়যন্ত্রের ভেতর ষড়যন্ত্র। প্রফেশনালরাই তল পায় না।'

'পরিষ্কার করে কথা বলতে পারো না?' মিলির গলায় ঝাঁঝ।

'আমেরিকা আর রাশিয়ার সম্পর্কটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মিলি। ওদের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হলে বিপদ নেমে আসবে গোটা দুনিয়ার ওপর।'

'কিছুই বুঝলাম না।'

'ভুল করার কোনো অবকাশ নেই,' বললো রানা। 'কোথাও একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, সেটা ব্যর্থ করতে হবে আমাকে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, দুনিয়াটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পড়েছে একা তোমার কাঁধে?' মিলির কণ্ঠে শ্লেষ।

'নতুন করে নয়, সেটাই আমার পেশা, বৃহত্তর অর্থে।'

গান গেয়ে এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে যাচ্ছে পাখির ঝাঁক।

আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না, উপলব্ধি করলো রানা।

পিছনের সঙ্গী দু'জন জাগোরস্কির সাথে মিলিত হয়েছে, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো ও। নিচের জলপাই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে তারা, মুখ তুলে সাইপ্রেস গাছগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে। পিস্তলগুলো হাতে, রোদ লেগে চক চক করছে ব্যারেল।

ডানে-বাঁয়ে তাকালো রানা। দ্বিতীয় দলটাকে দেখলো না কোথাও। পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা। তলপেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো উদ্বেগে।

হাত দুটো ফুলে আছে এখনো, তবে অনুভূতি ফিরে আসায় পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছে। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে ছুটে আসায় আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে পায়ে, এখন আর আগের মতো ভারি লাগছে না। তাজা বাতাস পেয়ে ফুসফুসও স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে।

রাশিয়ানরা সরাসরি ওকে লক্ষ্য করে উঠে আসছে।

মিলির হাত ধরে সিধে হলো রানা, পাথরের স্তূপ লক্ষ্য করে ছুটলো। পাহাড়টা পাথুরে হলেও, দুর্গটা এই পাহাড়ের পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়নি। ভাঙা পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে ছুটছে ওরা, আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলে এলো পাহাড়ের আরেক দিকের কিনারায়। অনেক নিচে একটা অ্যাম্ফি থিয়েটার দেখা গেল। গভীর একটা ডোবায় টাইগার লিলি ফুটে রয়েছে। মরা, শুকনো ঝোপের একটা স্তূপ পেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো রানা।

'কি?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো মিলি।

'কি যেন একটা আছে ওখানে।'

পড়ে থাকা শাখা-প্রশাখা ডিঙিয়ে ফিরে এলো রানা, শ্যাওলাভরা পানির ক্ষীণ একটা ধারা দেখতে পেলো। পাইন গাছের মাটি ছোঁয়া শাখাগুলোকে ব্যস্ত হাতে সরালো ও, পাথরের

গায়ে অন্ধকার একটা ফাটল দেখতে পেলো। পাঁচিলটার দু'দিকে তাকালো ও, কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে আঙুল বাঁকা করে মিলিকে কাছে আসার ইঙ্গিত দিলো। ডালপালা টপকে দ্রুত চলে এলো মিলি, তাকে ধরে মৃদু ধাক্কা দিলো রানা, ঢুকিয়ে দিলো সরু ফাটলের ভেতর। নিজেও ঢুকলো।

ছোট্ট পরিসর, পাশাপাশি দু'জন দাঁড়াবার পর ভেতরে আর জায়গা নেই। মাথার ওপর ডানা ঝাপটাচ্ছে একদল বাদুড়, কর্কশ আওয়াজ করছে। উৎকট একটা গন্ধ ঢুকলো নাকে। পাঁচিল চুইয়ে গাঢ় রঙের পানি বেরুচ্ছে, অস্পষ্ট আলোয় পানির রেখাগুলোকে সাপের মতো কিলবিল করতে দেখলো ওরা। ফাটলটার মেঝে স্যাঁতসেঁতে, ক্রমশ উঁচু হয়ে ওপরদিকে উঠে গেছে। রানা আশা করেছিল, পথটা ওপরের দুর্গ পর্যন্ত চলে গেছে, কিন্তু তা যায়নি। দশ কি বারো ফুট এগিয়ে থেমে গেছে, পাথর-ধসের ফলে বন্ধ হয়ে গেছে সরু টানেলটা।

মুখ থেকে মাকড়সার জাল সরালো রানা, সতর্ক চোখে তাকিয়ে থাকলো ডাল আর পাতায় ঢাকা ফাটলটার মুখের দিকে।

'এখানে বিশ্রাম নিতে পারো,' মিলিকে বললো রানা। 'লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছি আমরা।'

'ওদের চোখে ধরা পড়ে গেলে, বেরুবার কোনো পথ নেই।'

কথা না বলে ফাটলের মুখে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'এখনো কিন্তু ওদের সাথে কথা বলা যায়,' বললো মিলি।

এবারও রানা কিছু বললো না।

'মি. প্যাসিমভ আমাকে বলেছেন, তিনি জানেন, তুমি যদি তাঁকে রাশিয়ানদের কাছে পৌঁছে দাও, ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে।'

রানা যেন মিলির কথা শুনছে না।

'তোমার হয়ে সুপারিশ করবেন তিনি।'

'তাঁর নিজের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।'

'রানা, আমি চাই না তুমি মারা যাও!' আবেগ আর মানসিক যন্ত্রণা উথলে উঠলো মিলির কথায়।

'তুমি মারা যাও, আমিও তা চাই না,' বললো রানা। 'কর্নেল রুস্তমভ আমাকে খুন করার পর তোমাকে ছেড়ে দেবে না।'

'সে-ঝুঁকি নিয়েই তো তোমার কাছে এসেছি আমি। তবে মি. প্যাসিমভকে সাহায্য করতে হবে, তাঁকে তুলে দিতে হবে রাশিয়ানদের হাতে।'

'সময় হলে। তার আগে নয়। তোমার মতো আমিও মি. প্যাসিমভের ভালো চাই। তোমাকে কথা দিচ্ছি, তাঁকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার বা রাশিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশে পাঠিয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

রানার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো মিলি। 'সবই আমি বিশ্বাস করি, ডার্লিং। তবু, এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, একমাত্র আমি যেভাবে বলছি সেভাবেই বাঁচতে পারো তুমি। বাঁচতে হলে, নিকোলাইকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে তোমার। কোনো অবস্থাতেই আমেরিকায় তাকে পাঠানো যাবে না।'

'তোমার বুঝি ধারণা, আমি আমেরিকানদের চর?'

মিলি চুপ করে থাকলো।

তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকালো রানা। 'কি ব্যাপার বলো তো? একবার মি. প্যাসিমভ, একবার শুধু নিকোলাই? আসলে কি ঘটেছে, জানতে পারি?'

হতচকিত দেখালো মিলিকে। 'জানি না। তাঁ...তাঁর ব্যাপারে

একেকবার একেক রকম অনুভূতি হয় আমার।'

'আরো অনেক কিছুই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছো তুমি।' মিলির হাত দুটো গলা থেকে নামালো রানা। 'প্যাসিমভ তোমাকে একটা ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। তোমার মতো দু'একটা মেয়েকে আগেও আমি এরকম বিহ্বল হতে দেখেছি। ভালো কথা, তাঁকে তুমি জর্জের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে কি মনে করে?'

'জর্জ আমাকে বললো, মি. প্যাসিমভ যা চাইবেন তাই করবে এইচআরসি। তবে, সেই সাথে জানালো, এইচআরসি-র সাথে যোগাযোগ করার জন্যে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তাকে। আমেরিকা ও রাশিয়া, দু'পক্ষই তাকে চায়, কাজেই রক্তারক্তি কাণ্ড বাধতে পারে–সেজন্যেই আমরা গা ঢাকা দিলাম। কিন্তু জর্জ আমাকে সরিয়ে দিলো। এতো ভয় পাই আমি যে কোস্টাসকে কিছু জানাবার সাহস হয়নি।' মিলির চোখে আবেদন। 'আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো না?'

'করি, কিংবা হয়তো করি না। মি. প্যাসিমভের সাথে এতো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ো তুমি যে তাঁর ভেতর যদি খারাপ কিছু থাকেও, তোমার দেখতে পাবার কথা নয়। মি. প্যাসিমভ বা তুমি পছন্দ করো বা না করো, আমার কাজ আমাকে করতে হবে, মিলি। কে.জি.বি-র হাতে মি. প্যাসিমভকে আমি তুলে দিচ্ছি না। অন্তত এখুনি নয়।'

রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মিলি, ওর বুকে দমাদম ঘুসি মারলো। তাকে সরিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলো রানা, দু'জোড়া হাত প্যাঁচ খেয়ে গেল, রানাকে ল্যাং মারলো মিলি। তাকে নিয়েই সরু টানেলের মেঝেতে পড়লো রানা। অনুভব করলো, ওর চোখ লক্ষ্য করে থাবা মারলো মিলি। মাথা সরিয়ে নিয়ে একটা হাঁটু

বাড়িয়ে দিলো মিলির পেট লক্ষ্য করে, ফুঁপিয়ে উঠলো মিলি। পরমুহূর্তে সমস্ত ভার নিয়ে তার কোমল শরীরে চেপে বসলো রানা। ওর নিচে মোচড় খাচ্ছে মিলি, ছটফট করছে, ফোঁপাচ্ছে। আওয়াজটা আতংকিত করে তুললো রানাকে, জানে বাইরে কাছে পিঠে কোথাও পৌঁছে গেছে কে.জি.বি. এজেন্টরা।

তারপর, অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হলো রানার। সবিস্ময়ে অনুভব করলো, দীর্ঘ ও ক্ষুধার্ত চুম্বন। রানার ঘাড়টা দু'হাতে আলিঙ্গন করলো মিলি, ওর মুখে উত্তপ্ত ও সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। ঝোঁকের মাথায় নয়, কিংবা ভাবাবেগেও নয়, নয় শারীরিক চাহিদার কাছে পরাজিত হয়ে, মিলির আকস্মিক পরিবর্তনের প্রতি স্রেফ সমর্থন জানিয়ে পাল্টা চুমো খেলো ও।

রানার পাল্টা চুমো যেন পাগল করে তুললো মিলিকে। শরীরটা গুটিয়ে রানার ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইলো সে, আনন্দের আতিশয্যে অনবরত গোঙালো। মধু আর বুনোফুলের সুগন্ধ পেলো সে। তার লম্বা কালো চুলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল দুটো মুখ। রানার গলায় চেপে বসলো জোড়া হাতের বাঁধন, ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সাথে ফুলে ফুলে উঠছে ব্লাউজ ঢাকা বুক। 'ডার্লিং,' গুঙিয়ে উঠলো সে। 'ডার্লিং, এখানে নয়।'

'কানাগলির বিড়াল হতে চাও না?'

'কথা দিলে বিশ্বাস করবে পরে?'

মনে মনে হাসলো রানা।

রানার নিচে শুয়ে থাকলো মিলি, এক চুল নড়ছে না, ভয়ংকর লোভনীয়।

তারপর রানার মুখে একটা আঙুল বুলালো সে। 'আমি চাই ব্যাপারটা সুন্দর ভাবে ঘটুক, শান্ত নিরিবিলি আরামদায়ক

পরিবেশে।'

'প্রশ্ন হলো, তোমার গ্রীক দেবতারা আমাদের ভাগ্যে অন্য কোনো সময় বরাদ্দ করবেন কিনা,' থমথমে গলায় বললো রানা।

'করবে, তুমি দেখো। শুধু তুমি যদি যুক্তি মানো।'

উঠে বসলো রানা। 'ফের সেই এক কথা?'

'আমি তোমার প্রাণ বঁচিয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠলো মিলি, চোখ দুটো জ্বলছে।

'যাতে মি. প্যাসিমভ আর তুমি আমাকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারো?' সাথে সাথে জবাব দিলো রানা। 'সেটা না হয় বোঝা যায়, কিন্তু ভাবিনি তুমি আমাকে এভাবে ঘুষ দিয়ে বশ করার চেষ্টা করবে। এ-ধরনের মেয়েকে কি বলা হয়, জানো? শেষ পর্যন্ত তুমি শরীরটাকে টোপ বানালে?'

লাফ দিয়ে সিধে হলো মিলি, টানেলের মুখ লক্ষ্য করে ছুটলো।

'মিলি, ফিরে এসো!' চেঁচিয়ে ডাকলো রানা।

কিন্তু এরইমধ্যে টানেল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে মিলি। ফাটলের মুখ লক্ষ্য করে ছুটলো রানা, ফাঁকটার কাছে আসতেই ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। রাশিয়ানদের একজনকে বিশগজ দূরে রেখে তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে মিলি। সচকিত লোকটা চরকির মতো আধপাক ঘুরলো, পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করলো, এক সেকেণ্ড সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করলো ছুটন্ত মূর্তিটার দিকে।

গুলির শব্দ শুনে শিউরে উঠলো রানা।

নয়

কে.জি.বি. এজেন্টের মাথাটা ঝাঁকি খেয়ে একদিকে কাত হয়ে পড়লো, খুলির অর্ধেক উড়ে গেছে। মাথার ওপর ঝুলে থাকা রক্তিম ঊষারাগের নিচে আছাড় খেয়ে পড়লো সে। অবিশ্বাস ভরা দীর্ঘ একটি মুহূর্ত, একচুল না নড়ে তাকিয়ে থাকলো রানা।

ত্রস্তা হরিণীর মতো পাহাড় বেয়ে গ্রামের দিকে নেমে যাচ্ছে মিলি।

গুলির আরো শব্দ হলো, খোলা জায়গায় ফাঁপা লাগলো কানে।

কে.জি.বি. এজেন্টের লাশ আর মিলিকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। টানেল থেকে বেরিয়ে এলো ও, সতর্কতার সাথে গাছের ডালপালা সরিয়ে নিঃশব্দে এগোলো। বৃক্ষ সারির গোড়ার কাছে পড়ে আছে লাশটা–লোকটা আরো একটু ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেলে কি ঘটতো ভাবতে চাইলো না রানা। লাশের পাশেই পড়ে রয়েছে নাইন এম এম ম্যাকারভ। সেটা তুলে নিয়ে পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে সামনে তাকালো ও। বাতাস আর পাখিদের কলরব ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, সাগরের চারশো ফুট ওপরে উত্তপ্ত ঢালটাকে গ্রাস করে রেখেছে অনিশ্চিত আশংকা

আর নিস্তব্ধতা।

ডান দিকে গুলির শব্দ হলো। মাথা নামিয়ে স্যাঁৎ করে এক পাশে সরে গেল রানা, কিন্তু তার আগেই ওর মাথার অনেক ওপরে পাথরে লাগলো বুলেট। ঝট্ করে সেদিকে মুখ তুলেই দেখতে পেলো, দুর্গের পাঁচিল থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে এলো পিস্তল বাগিয়ে ধরা একটা হাত।

দুর্গে কে বা কারা রয়েছে জানে না রানা, কে.জি.বি. এজেন্টদের গুলি করছে দেখে এই মুহূর্তে মাথা ঘামাবারও বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলো না। মাথা নিচু করে লাশটা টপকালো ও, শরীরের প্রতিটি লোমকূপ সতর্ক, ছুটলো সরু একটা নালা লক্ষ্য করে। শুকনো নালা, পাড় দুটো সামান্য উঁচু, বৃক্ষ সারি ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা নিচে নেমে এলো ও।

একটা বোল্ডারের আড়ালে কুঁজো হয়ে রয়েছে লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি। বুলেট আকৃষ্ট করার জন্যে আড়াল থেকে খানিকটা বেরিয়ে এলো সে। ওদিকে তৃতীয় লোকটা আরেক ঢাল বেয়ে দুর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে ওপরের অচেনা সশস্ত্র প্রতিপক্ষকে কাবু করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

নিজের পিস্তল সিধে করলো রানা, দাঁড়ালো, চিৎকার করলো, 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও, লেফটেন্যান্ট!'

ঘুরেই গুলি করলো জাগোরস্কি, তার লম্বাটে মুখ ঘৃণায় টান টান হয়ে আছে। রানার কানে ছ্যাঁকা দিয়ে, বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। কিছু বিবেচনা করার সময় নয় এটা, রানাকে গুলি করতে হবে সরাসরি খুন করার জন্যে। অন্য কেউ হলে ঠিক তাই করতো। ওর হাতে গর্জে উঠলো পিস্তলটা, ঝাঁকি খেয়ে পাথুরে ঢালে নিতম্ব দিয়ে পড়লো লেফটেন্যান্ট। চোখ-মুখ খিঁচিয়ে

গাল দিলো সে, রানার বুলেট তার ঊরুর খানিকটা মাংস উড়িয়ে নিয়ে গেছে। গাল পাড়তে পাড়তে আবার রানার দিকে অস্ত্র ঘোরাতে চেষ্টা করলো সে। এবারও রানা খুন করার জন্যে নয়, শান্তভাবে লক্ষ্য স্থির করলো আহত করার জন্যে। রানার দিকে ঘুরছে জাগোরস্কির পিস্তল ধরা হাত, পিস্তল সহ কব্জিটা ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল। পরমুহূর্তে হাতটা মুখের সামনে তুলে কেঁদে উঠলো লেফটেন্যান্ট। পিস্তলটা তো হাতে নেই-ই, ডান হাতে আঙুল বলতেও কিছু অবশিষ্ট নেই তার।

ওপরের ঢাল থেকে দৃশ্যটা পুরোপুরিই চাক্ষুষ করলো জাগোরস্কির সর্বশেষ সঙ্গী, কালবিলম্ব না করে ঘুরলো সে, ঢাল বেয়ে ছুটলো গ্রামের দিকে।

ম্যাকারভটা বেল্টে গুঁজে মাথা তুলে দুর্গের দিকে তাকালো রানা।

'মাসুদ ভাই, আপনি?'

দুর্গপ্রাচীরের কিনারায় চন্দনের উদ্ভাসিত মুখ।

'কে পাঠালো তোমাদের?' জানতে চাইলো রানা।

'আমরা ওদেরকে অনুসরণ করছিলাম। কাল রাত থেকে।' নিজের বাঁ দিকে তাকালো চন্দন, আবার রানার দিকে ফিরলো। 'আমার সাথে সাযযাদ রয়েছে।' পরমুহূর্তে তার পাশে উদয় হলো সিরিয়াস একটা চেহারা, যেন অধ্যবসায়ী ছাত্র।

পাঁচিলের মাথায় উঠলো ওরা, আছাড়ি-পাছাড়ি করে দুর্গের বাইরে নেমে এলো। কাছে এসে সাযযাদ বললো, 'মাসুদ ভাই, আমরা সম্ভবত অ্যাসাইনমেন্টটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি, তাই না?'

'কিন্তু মেয়েটাকে ওদের হাতে পড়তেই বা দিই কিভাবে?' অজুহাত দেখানোর সুরে বললো চন্দন, রানার দিকে ফিরলো। 'মাসুদ ভাই, আপনি…?'

'আমি ভালো, শুধু দু'এক জায়গার চামড়া কেটে গেছে।' রানার চেহারা অস্বাভাবিক গম্ভীর। কঠিন সুরে জানতে চাইলো ও, 'তোমরা খুন করার জন্যে সরাসরি গুলি করলে কেন? কে তোমাদের অনুমতি দিয়েছে?'

দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলো ওরা, কথা বললো চন্দন, 'মাসুদ ভাই, বন থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি আমরা…।'

'কি মেসেজ?' হঠাৎ খেয়াল হতে সাযযাদের দিকে ফিরলো রানা। 'ওদিকে, বোল্ডারের আড়ালে সরে গেছে আহত লোকটা, লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি। তার অবস্থা কি দেখো, যদি সম্ভব হয় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে, হাত দুটো তো বাঁধবেই। তারপর গ্রামে নেমে লক্ষ্য করো অপর লোকটা কোন্ দিকে যায়।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই,' তারকা-র হুকুম পেয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে ছুটলো ফ্যান।

'ঢাকা থেকে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল,' সাযযাদ চলে যেতে শুরু করলো চন্দন সরকার। 'সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গত বছর বিক্রি বা দান না করার নীতি নির্ধারণের পর থেকে আজ পর্যন্ত এক ছটাক ইউরেনিয়ামও বিদেশে কোথাও পাঠানো হয়নি…।'

'ইন্টারেস্টিং।'

'ঢাকাকে আরো জানানো হয়েছে, প্রখ্যাত কোনো রুশ বিজ্ঞানীর দেশত্যাগ সম্পর্কেও মস্কোর কিছু জানা নেই। কর্মকর্তা

ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, কে.জি.বি-র কথিত ভূমিকা সম্পর্কে তদন্ত করে দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

'এ-সব কথা মেসেজে বলার পর সোহেল ভাই ধারণা দিয়েছেন, সম্ভবত কে.জি.বি-র একটা গ্রুপ কর্তৃপক্ষ বা সরকারকে কিছুই না জানিয়ে সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। তা যদি হয়, নিজেদের অপরাধের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে এলোপাতাড়ি খুন করতেও দ্বিধা করবে না ওরা। কাজেই তিনি আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যে-কোনো মূল্যে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে...'

ব্যাখ্যাটায় সন্তুষ্ট হলো না রানা, যদিও বুঝলো, এ-সব নিয়ে আলোচনা করার সময় এখন নয়। 'শোনো, নিকোলাই প্যাসিমভ কোস্টাস অ্যারোনাফিসের কাছে আছেন, বা ছিলেন। কিছু সুবিধে আদায়ের বিনিময়ে প্যাসিমভকে কে.জি.বি-র হাতে তুলে দেবে সে, বা দিতে পারে। কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে চাই না প্যাসিমভ কে.জি.বি-র হাতে পড়ুন।'

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো সাযযাদ। 'মাসুদ ভাই, লেফটেন্যান্ট পালিয়েছে। রক্তের দাগ দেখে বুঝলাম, গ্রামের দিকে নেমে গেছে সে।'

'নাঈমকে নিয়ে যতোটুকু পারো করো তুমি,' তাকে নির্দেশ দিলো রানা। 'আশপাশেই তো আছে সে, তাই না?' ফিরলো চন্দনের দিকে। 'তুমি আমার সাথে এসো। অ্যারোনাফিসের ইয়টে হানা দিতে হবে।' পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ও।

ঢালের নিচে সবার আগে নামলো সাযযাদ, গাড়িতে উঠে স্টার্ট

দিলো সে, কে.জি.বি. এজেন্টদের খোঁজে রওনা হয়ে গেল ঝড়ের বেগে। চারদিকে তাকিয়ে কোনো ট্যাক্সি দেখতে না পেয়ে একটা ফিয়াটের দিকে এগোলো রানা। পিছন থেকে প্রশ্নবোধক স্বরে চন্দন বললো, 'মাসুদ ভাই?'

'চুরি বিদ্যা বড় বিদা, যদি না পড়ো ধরা,' বলে ফিয়াটের হাতল ধরে টান দিলো রানা, খুলে গেল দরজা।

ট্যুরিস্টদের প্রথম দলটা পৌঁছে গেছে, যদিও এইমাত্র সকাল হলো। লিনডোসের বাইরে রাস্তাটা এখনো প্রায় ফাঁকাই বলা যায়।

কোস্টাল রোড ধরে উত্তর দিকে ছুটলো ফিয়াট, কাল রাতের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করলো রানা।

'দুর্যোগবহুল রাত,' স্বীকার করলো চন্দন। 'কিন্তু, মাসুদ ভাই, মেয়েটার কি ব্যাপার বলুন তো?'

'তাকে নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবার সময় নেই আমাদের। নিজের ভালো নিজেই বুঝুক।'

'খারাপ আরো কিছু খবর আছে, মাসুদ ভাই,' বললো চন্দন। 'নেমিসিসে যে বীকনটা রেখে এসেছিলাম, সেটা সাড়া দিচ্ছে না।'

রানার চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'তারমানে কে.জি.বি. এজেন্টরা ওটা খুঁজে পেয়েছে।'

'আরো একটা দুঃসংবাদ, মাসুদ ভাই,' বললো চন্দন। 'রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন শাখা অবিশ্বাস্য একটা রুশ মেসেজ হাত করেছে। সোভিয়েত দূতাবাস থেকে মস্কোয় যাচ্ছিলো মেসেজটা। তাতে বলা হয়েছে, ইউরেনিয়াম নিয়ে নিরাপদে রওনা হয়ে গেছে নেমিসিস লিমবেরির পথে।'

'গোটা ব্যাপারটা উদ্ভট!' হুইলের ওপর চাপড় মারলো রানা।

'সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকাশ্য নীতির সাথে ব্যাপারটা একদম মেলে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কেন তারা উইপন-গ্রেড ইউরেনিয়াম দিতে যাবে? লিমবেরির সরকারী বাহিনী গেরিলাদের সাথে যুদ্ধ করছে, আর গেরিলাদের সাহায্য করছে রাশিয়া। লিমবেরি সরকারের হাতে পারমাণবিক বোমা থাকলে আফ্রিকাকে তারা নো ম্যানস ল্যাণ্ড করে ছাড়বে।'

'এমনও তো হতে পারে, মাসুদ ভাই,' বললো চন্দন, 'ইউরেনিয়াম আসলে গেরিলারা পাবে?'

'বোকার মতো কথা বলছো!' ধমক দিলো রানা। 'সরকারী বাহিনীর সাথে ওখানে যারা যুদ্ধ করছে তাদের না আছে ভালো কোনো ঘাঁটি, না আছে প্রযুক্তি। অস্ত্র বলতে তাদের হাতে অটোমেটিক রাইফেল আর গ্রেনেডই সম্বল। ইউরেনিয়াম ওরা ধুয়ে খাবে?'

'তাহলে তো…।'

'যেভাবে হোক থামাতে হবে নেমিসিসকে,' প্রতিজ্ঞার সুরে বললো রানা।

'কিন্তু কিভাবে?' ব্যাকুল প্রশ্ন চন্দনের।

নুড়ি ছড়ানো সৈকতে স্ট্র হ্যাট পরা একজন বোটবিল্ডারকে পাশ কাটালো ওরা, ছোটো ডিঙি নৌকায় তক্তা লাগাচ্ছে।

'জাহাজটা কোথায় তা-ও আমরা জানি না,' আবার বললো চন্দন। 'যদি এয়ার সার্চের ব্যবস্থা করতে পারতাম, খড়ের গাদায় পিন খোঁজার মতো হতো ব্যাপারটা।' সাগরের দিকে একটা হাত বাড়ালো সে। 'মার্চেন্ট ট্রাফিকে গিজ গিজ করছে ঈজিয়ান, কোন্ জাহাজটা নেমিসিস?'

সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, হুইল ধরা আঙুলের গিঁটগুলো সাদা, চোখ ভরা জরুরি তাগাদার ভাব। প্রবল বাতাস বইতে শুরু করেছে, আকাশ নীল—জ্বলজ্বল করছে, মাটি আগুন হয়ে আছে রোদে। 'কে.জি.বি. শুরু থেকেই জানতো কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে ইউরেনিয়াম,' বললো ও। 'গন্তব্য ইটালি, এ-কথা বলে অ্যারোনাফিস বোকার মতো ভেবেছিল তাদেরকে ধোঁকা দিতে পেরেছে সে।'

চন্দনের গলায় অবিশ্বাস, 'ইউরেনিয়ামটা হাইজ্যাক করে অ্যারোনাফিস সব এলোমেলো করে না দিলে, নিকোলাই প্যাসিমভ এতোক্ষণে লিমবেরিতে থাকতেন!'

'দারুণ একটা কথা বলেছো।' ভুরু দুটো কুঁচকে উঠলো রানার। 'কিন্তু কে.জি.বি. যদি জানতোই যে নেমিসিস ইটালিতে ভিড়বে না, যদি জানতো যে জাহাজটা দক্ষিণ অর্থাৎ লিমবেরির দিকে যাবে, তাহলে তো তাদের কাছে গোটা ব্যাপারটা স্বাভাবিক লাগারই কথা—ক্যানেলে তারা নেমিসিসে উঠলো কেন?'

'নিকোলাই প্যাসিমভকে আটক করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাই,' বললো চন্দন, যেন কিছু চিন্তা না করেই।

'কিন্তু তা যদি না হয়?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই?'

'যদি এমন হয়,' বললো রানা, 'জাহাজে চড়ে যা করেছে তারা, ঠিক সেটা করারই উদ্দেশ্য ছিলো তাদের? জাহাজ ঘুরিয়ে নেয়া, ইউরেনিয়াম ফেরত পাওয়া, তারপর আবার লিমবেরির দিকে রওনা হওয়া?'

'কিন্তু নিকোলাই প্যাসিমভকে তাদের দরকার ছিলো।'

'ছিলো না, তা আমি বলিনি। কিন্তু জাহাজ থেকে তাঁকে তারা

নামায়নি, তাদের জায়গায় আমি হলে ওটাই আমার প্রথম কাজ হতো।'

'তাঁর পিছু নিয়ে এখানে এসেছে তারা,' বললো চন্দন।

'হ্যাঁ, তিনি কিডন্যাপ হবার পর। তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে নেমিসিস থেকে। আই রিপিট, নিকোলাই প্যাসিমভকে তাদের দরকার ছিলো না, এ-কথা আমি বলছি না। কিন্তু কোথায় তাঁকে দরকার ছিলো? রাশিয়ার মাটিতে, নাকি নেমিসিসের ডেকে?'

'মাসুদ ভাই, ভদ্রলোককে গোপনে নেমিসিসে তুলে দেয়া হয়েছিল।'

'ওরকম যাতে দেখায়, সে-আয়োজন করা ওদের পক্ষে সম্ভব।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে চন্দন বললো, 'ঠিক আছে, জাহাজটা দখল করার উদ্দেশ্য যদি ফিরে গিয়ে ইউরেনিয়াম উদ্ধার করা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ...।' চুপ করে গেল সে, ঝট করে রানার দিকে ফিরলো।

'ঠিক ধরেছো তুমি, চন্দন,' বললো রানা। 'কেউ তাদেরকে নিশ্চয়ই জানায় যে জাহাজ থেকে ইউরেনিয়াম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেই কেউ-টা নির্ঘাত জাহাজেই ছিলো, ধরে নেয়া চলে। তার সাথে রেডিও ট্র্যান্সমিটার না থেকেও পারে না।' এক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে আবার বললো ও, 'যদি বলি খোদ নিকোলাই প্যাসিমভই সেই লোক?'

সাগর ছুঁয়ে ছুটে আসা বাতাসে লোনা গন্ধ। ঢেউগুলোর মাথায় সাদা ফেনার মাত্রা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। রাস্তার অপর দিকে, মাঠের ওপর বুনো ফুলের ঝোপগুলো নুয়ে পড়ছে বাতাসের চাপে।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর কথা বললো চন্দন, গলায় সন্দেহ নিয়ে, 'কিন্তু, মাসুদ ভাই, কে.জি.বি.-র কোনো অন্যায় পরিকল্পনায় নিকোলাই প্যাসিমভের মতো ব্যক্তিত্ব কি অংশগ্রহণ করবেন? জানি, তিনি বলেছেন দেশে ফিরে যেতে চান। কিন্তু তিনি কি...?'

'এডওয়ার্ড গ্রীন, প্যাসিমভের ওপর যে নজর রাখছিল, তাকে হাতে পেলে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতো। কিন্তু মারা গেছে সে। কি জানি,' বললো রানা, 'তদন্ত করে দেখতে হবে।'

মানড্রাকি হারবারে এক মিনিট দেরি করে পৌঁছুলো ওরা।

গ্যাঙওয়ে ধরে অ্যারোনাফিসের ইয়টে উঠে যাচ্ছে মিলি, দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো রানা। ইতিমধ্যে নোঙর তুলে ফেলা হয়েছে, রওনা হবার জন্যে সর্বশেষ লাইনটাও টেনে নেয়া হলো। সজোরে ব্রেক কষে থামলো ফিয়াট, দরজা খোলার সময় দেখলো ও, গর্বিত ভঙ্গিতে হারবার ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ইয়টটা, ঢেউগুলো কালো খোলের দু'দিকে আছড়ে পড়ছে।

'মেয়েটা এখানে কি করছে, মাসুদ ভাই?' সবিস্ময়ে জানতে চাইলো চন্দন।

'প্যাসিমভের পাশে দাঁড়িয়েছে? নিজের বিশ্বাসের প্রতি অনড়? কে জানে!'

গাড়ির পাশে, প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, অসহায় চোখে দেখলো সেন্ট নিকোলাস দুর্গটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে অ্যারোনাফিসের ইয়ট। কারো কিছু করার নেই।

লালচে গোঁফের প্রান্ত ধরে মোচড় দিলো চন্দন, তারপর হাত

দুটো ট্রাউজারের দুই পকেটে ভরে টান টান হলো। 'এখন কি হবে, মাসুদ ভাই? কি করবো আমরা?' পকেটের ভেতর হাত দুটো ঘন ঘন মুঠো পাকালো সে। 'কোস্টাস অ্যারোনাফিস পালিয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে তা-ও আমরা জানি না...।'

'একটা কাজই করার আছে আমাদের,' বললো রানা, তাকিয়ে আছে খানিকটা দূরে নোঙর করা সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারের ঝলমলে বোটটার দিকে। 'এসো।'

নামমাত্র বিকিনি পরা একটা মেয়ে ডেক চেয়ারে লম্বা হয়ে ঘুমাচ্ছে। ইয়টের কোনো ক্রুকে আশপাশে দেখা গেল না। মেয়েটার নগ্ন কাঁধ ছুঁলো রানা। চোখ মেলে তাকালো সে, ধীরে ধীরে হাসি ফুটলো মুখে। 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি?' রানার আপাদমস্তকে চোখ বুলালো।

'স্বপ্নটা ভেঙে দেয়ার জন্যে দুঃখিত,' সবিনয়ে বললো রানা। 'তোমাকে ইয়ট থেকে নেমে যেতে হবে।'

বেদিং ট্রাংক পরা প্রকাণ্ডদেহী, পেশীবহুল এক যুবককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে দু'কোমরে হাত রেখে রানার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো সে, ফরাসী ভাষায় জানতে চাইলো, 'কি ঘটছে এখানে?'

'তোমাদের দু'জনকেই বোট থেকে নেমে যেতে হবে, মঁশিয়ে,' একই ভাষায় জবাব দিলো রানা।

'আমরা মি. বারকেইনহেইমারের অতিথি...।'

'আমি জানি। প্লিজ, তাড়াতাড়ি নেমে যান। সময় খুব কম।'

রানার দিকে কঠিন চোখে তাকালো যুবক, তারপর মেয়েটার দিকে ফিরলো। 'ওর কথায় কান দিয়ো না। মি.

বারকেইনহেইমারের সাথে কথা বলছি আমি।' ঘুরলো সে, কয়েক পা এগিয়ে থামলো, ফিরে এলো রানার সামনে। 'আমার বান্ধবীকে যদি বিরক্ত করো, ফিরে এসে তোমার চোখ দুটো তুলে নেবো–মনে থাকে যেন।'

রানার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝট করে কাত হলো ও, দড়াম করে ঘুসি মারলো যুবকের পেটে। প্রথমে সামনে ঝুঁকলো যুবক, তারপর চিবুকে রানার হাঁটুর প্রচণ্ড এক গুঁতো খেয়ে রেলিং টপকে ইয়টের বাইরে চলে গেল, ডেক থেকে পা দুটো শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেয়ে ঝপাৎ করে শব্দ হলো একটা। এক মুহূর্ত দেরি না করে ডেক চেয়ার ছাড়লো মেয়েটা, গ্যাংওয়ে ধরে এক ছুটে নেমে গেল।

রানার দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসলো চন্দন।

'চলো, ইয়টের মালিকের সাথে কথা বলি।'

সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারকে পাওয়া গেল সেলুনে, ফল আর পেস্ট্রি নিয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছেন। সোনালি, নীল আর সাদা কার্পেটে লাল জ্যাকেট পরে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাটেনড্যান্ট। 'মি. রানা!' কাঁটাচামচ মুখের কাছে স্থির হয়ে গেল, তাতে একটা কড়ে আঙুল সাইজের আঙুর। 'আপনি কি…মানে, তিনি কি…?'

'এখনো না, মি. বারকেইনহেইমার।'

টেবিলের আরেক দিকে সরে গেল চন্দন, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'অত্যন্ত দুঃখজনক,' নাক টেনে বললেন বারকেইনহেইমার। চামচটা নামিয়ে রাখলেন প্লেটে। সিল্কের শার্ট পরে আছেন

ভদ্রলোক, সাদার ওপর সাদা ডোরাকাটা। স্ল্যাকস জোড়া নীল কর্ডের, পায়ে মোজাহীন লিনেন ডেক শু। 'আমার বিশ্বাস, আপনি এখনো সেই উদ্ভট ধারণা পোষণ করেন যে কিডন্যাপিঙের সাথে জর্জ জড়িত; সেজন্যেই আপনার দ্বারা কিছু হচ্ছে না,' অভিযোগের সুরে বললেন তিনি। আঙুরটা মুখে পুরলেন এবার।

'কে বললো আমার দ্বারা কিছু হচ্ছে না, মি. বারকেইনহেইমার? ডাচ জর্জ মারা গেছে, আপনি শোনেননি?'

বিষম খেলেন এইচআরসি কর্মকর্তা, তাঁর নীল চোখ একজোড়া মার্বেলের মতো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। লাফ দিয়ে সিধে হলেন তিনি, দাঁড়িয়ে থাকলেন রানার চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে, বয়সের ভাঁজ পড়া মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

ঠাণ্ডা গলা রানার, 'আপনার ইয়টটা আমার দরকার। ক্রুদের তীরে নামতে বলুন, প্লিজ।'

'আপনি, স্যার, বদ্ধ উন্মাদ! ডাচ জর্জ? মারা গেছে? সর্বনাশের তাহলে আর কিছু বাকি রাখেননি। কিভাবে...?'

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই।'

'সময় করুন তাহলে, শুনতে পাচ্ছেন? আমার বোট কি জন্যে দরকার আপনার?'

'কোস্টাস অ্যারোনাফিসকে ধরতে হবে।'

'কোস্টাস অ্যারোনাফিস! তাকে ধরবেন? আপনি? পাগল না হলে এ-কথা বলতেন না! জানেন, কোস্টাস অ্যারোনাফিস কাদের সাথে ওঠাবসা করে, তার ওজন কতো?'

'জানি। আপনাদের সমাজের লোকেরা পুলিশ চীফকে ডিনারে ডেকে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু আমরা যার সম্পর্কে আলাপ করছি তার অপরাধ ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করা নয়।

আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে, এইমাত্র এই হারবার ছেড়ে নিকোলাই প্যাসিমভকে নিয়ে পালিয়েছে কোস্টাস অ্যারোনাফিস।'

'এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না,' ঈষৎ রাগতঃকণ্ঠে বললেন বারকেইনহেইমার।

'আপনার বিশ্বাস করার দরকার নেই। আপনি তো আরো অনেককিছু অবিশ্বাস করছেন। ইয়ট ছেড়ে তাড়াতাড়ি নেমে যান, ক্রুদেরও সাথে নিন।'

'এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে, মি. রানা! বেয়াদপির জন্যে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে আপনাকে। আপনি আমাকে এখনও চেনেন না...।'

'ওর পা দুটো ধরো, চন্দন,' এইচআরসি কর্মকর্তার পিছনে চলে গেল রানা, তাঁর বগলের নিচে হাত ঢোকালো। ধরাধরি করে সেলুন থেকে বের করে আনা হলো তাঁকে, গ্যাংওয়ে বেয়ে নামিয়ে আনা হলো ইয়ট থেকে। বারকেইনহেইমার ধস্তাধস্তি করলেন না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা।

খর্বকায় চীনা ওয়েটারকে কিছুই বলতে হলো না, লক্ষ্মী ছেলের মতো সে তার মালিককে অনুসরণ করে নেমে গেল ইয়ট থেকে। ইয়টে ফিরে এসে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক তুলে নিলো রানা, মুখের ওপর রোদ যেন জ্বলন্ত হাতুড়ির বাড়ি মারছে। চন্দনকে নোঙর তোলার নির্দেশ দিলো ও। এক ছুটে চলে এলো ব্রিজ সুপারস্ট্রাকচারে।

ক্যাপটেনকে তার কেবিনে পাওয়া গেল, হুইলহাউসের ঠিক পিছনে। বয়স বেশি নয়, খোশমেজাজী একটা ভাব আছে চেহারায়, সম্ভবত ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করে না। ইন্টারকমের সাহায্যে কুক আর ক্রুদের ডাকতে বললো রানা, অনুরোধের সুরে। রানার বেল্টের পিছনে গুঁজে রাখা ম্যাকারভটার দিকে বার দুয়েক

তাকিয়ে ইন্টারকমের সুইচে চাপ দিলো সে।

ওরা অপেক্ষা করছে, একশো ফুটি জলযানের ভোলভো ডিজেলগুলোকে চালু করার নির্দেশ দিলো রানা। ইয়টের পেটের ভেতর থেকে এঞ্জিনের ভোঁতা গুঞ্জন ভেসে আসছে, এক এক করে কুক আর ক্রুরা জড়ো হলো। ইতিমধ্যে জেটি থেকে রওনা হয়ে গেছে ইয়ট, ব্রোঞ্জের তৈরি জোড়া হরিণের দিকে এগোচ্ছে ওরা। সবাইকে নিয়ে নিচের ডেকে নেমে এলো চন্দন, লাইফবোটে সবার শেষে উঠলো ক্যাপটেন। তীরের দিকে ফিরে যাচ্ছে লাইফবোট।

ফ্লাইং ব্রিজে উঠে এলো চন্দন, দ্বীপের সৈকতকে পাশ কাটাচ্ছে ইয়ট। হুইলে হাত রেখে একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। তবে কালো ইয়টটা প্রথমে চন্দনই দেখতে পেলো। প্রখর রোদে কালো একটা খুদে কাঠামো, দক্ষিণ-পুব দিকে চকচক করছে।

সাগর আর বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠলো তার গলা, 'খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে ব্যাটা, মাসুদ ভাই।'

কোর্স সামান্য একটু অ্যাডজাস্ট করলো রানা। 'দ্বীপের আরেক দিকে যাবার জন্যে তার হয়তো শুধু খোলা সাগর দরকার খানিকটা। উত্তর-পশ্চিম অর্থাৎ এথেন্সের দিকে বাঁক নেয়ার উপায় নেই, যতোক্ষণ না কেপ প্রাসোনিসি ঘুরতে পারে।'

'কিন্তু যদি তার সাথে নিকোলাই প্যাসিমভ না থাকেন?'

'মিলির ধারণা, আছেন। আর যদি না-ই থাকেন সাযযাদ আর নাঈমের ওপর ভরসা করতে হবে আমাদের। কে.জি.বি-র যারা তীরে রয়েছে তাদের ওপর নজর রাখছে ওরা।' এক সেকেণ্ড চুপ থাকার পর আবার বললো ও, 'তবে আমার বিশ্বাস, প্যাসিমভ অ্যারোনাফিসের সাথেই আছেন।'

কালো ইয়টটা চওড়া আর ভারি, বারকেইনহেইমারের ইয়টের মতো দ্রুতগতি নয়। প্রথম দিকে মাঝখানের দূরত্ব কমতে শুরু করলো। তারপর অ্যারোনাফিস বুঝতে পারলো, তার পিছু নেয়া হয়েছে। কালো ইয়টের গতি বেড়ে গেল, দূরত্ব কমার মাত্রা সেই সাথে পরিবর্তিত হলো, তবে কমছে।

'ওটাকে আমরা ওভারটেক করবো,' বললো চন্দন, মুখ থেকে লবণ মুছলো সে।

'এখনো অ্যারোনাফিস খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে,' বিস্ময়ের সাথে বললো রানা।

'লোকটাকে হাতে পাবার পর কি করা হবে, সেটাই হলো প্রশ্ন,' বললো চন্দন।

উত্তাল ঢেউ সাগরে, ইয়টের খোলে ভেঙে পড়ছে একের পর এক পানির পাহাড়, ব্রিজের ডেকে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা। ঢেউয়ের মাথা সাপের ফণার মতো ছোবল মারছে রেলিং আর ডেকের ওপর, নাচানাচি করছে ব্রিজের চারদিকে। চোখ রগড়ে সামনের দিকে তাকালো রানা। অ্যারোনাফিসের ইয়ট আর মাত্র একশো গজ দূরে। ফ্লাইং ব্রিজে কেউ নেই, খালি।

ডান দিকে তাকালো রানা, কুঁজো-পিঠ দ্বীপের পাহাড়গুলোকে দেখতে পেলো, লবণাক্ত বাতাসে খানিকটা অস্পষ্ট। পাহাড়গুলো গাঢ় লাগছে, দু'পাশে সবুজ উপত্যকা। মাথার ওপর ঘোলাটে আকাশ, পাহাড়ের চূড়ায় জমতে শুরু করেছে কালো মেঘ।

ওর সামনের উইণ্ডশীল্ড মাকড়সার জাল হয়ে গেল, গুলির কোনো শব্দ শোনেনি ও।

হোলস্টার থেকে একটা ম্যাগনাম ·৩৫৭ রিভলভার বের

করলো চন্দন। সেটা দেখে কে.জি.বি. এজেন্টের উড়ে যাওয়া খুলির কথা মনে পড়ে গেল রানার, বিস্মিত হওয়ার কিছু দেখলো না।

'হোল্ড ইট,' বললো ও।

রানার দিকে ফিরলো চন্দন। আলিঙ্গন করে আছে কন্ট্রোল প্যানেলকে, সামনের দিকে ঝুঁকে, রিভলভারটা ধরে আছে দু'হাতে।

'টার্গেট না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো,' বললো রানা।

'হুইল হাউসটা ড্রিল করতে পারি।'

'কিন্তু আমরা যতোদূর জানি, ওখানে প্যাসিমভ আছেন,' মনে করিয়ে দিলো রানা।

'অবশ্য মেয়েটাও আছে...।'

রানার এক পলকের দৃষ্টিতে তিরস্কার। 'তার কথা ভেবে আমরা দ্বিধা করবো না।'

আরেকটা বুলেট রাডার মাস্টের ছাল তুলে নিয়ে গেল, রানার পিছনে। 'ওই, ওদিকে রয়েছে!' একটা হাত তুলে লোকটাকে দেখালো ও, আফডারডেকের ওপর পাটাতনের ফাঁকের চারধারে নিচু একটা বেড রয়েছে, বেডের কিনারা থেকে উঁকি দিলো লোকটা, চুল উড়ছে বাতাসে।

·৩৭৫ ম্যগনামের বিস্ফোরণের শব্দ ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাতাস। চোখে ধরা পড়ে এমন কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। লোকটা এখনো রয়েছে ওখানে।

ইতিমধ্যে দুটো ইয়টের দূরত্ব আরো কমে গেছে। পঞ্চাশ গজের মতো ব্যবধান রেখে ফুলস্পীডে ছুটছে ওরা। প্রতি মুহূর্তে

খোলের গায়ে আছাড় খাচ্ছে ঢেউ, পানির ছিটে স্থায়ী পর্দার মতো ঝুলে রয়েছে সেলুনের জানালা আর রেলিঙের সামনে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলার মতো আরেকটা গুলির শব্দ হলো।

সাগরের পানিতে সারা শরীর ভিজে গেল রানার। ইয়ট যেভাবে দোল খাচ্ছে, ভয় পাবার তেমন কোনো কারণ নেই, পিস্তলের গুলি লাগার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আগুনের ঝলকটা অকস্মাৎ দেখতে পেলো রানা। তার সাথে ধোঁয়া। আতংকের সাথে উপলব্ধি করলো ও, একটা বাজুকা ছোঁড়া হয়েছে। স্টারবোর্ড থেকে বিশ ফুট দূরে অগ্নিশিখা আর পানির বিশাল স্তম্ভ দেখা গেল। পায়ের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো ডেক । তারপর ভেসে এলো বিস্ফোরণের আওয়াজ।

হুইল ধরে ঝুলে পড়লো রানা। আরেকটা বুলেট উইণ্ডশীল্ডে এসে লাগলো। তবে অ্যামুনিশন অপব্যয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না একে। গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন, দূরত্ব আরো কমে গেছে।

আফটারডেকে দুজন লোককে দেখা গেল, মাথা আর পিঠ বাঁকা করে বাজুকা রি-লোড করছে। যতোটা সম্ভব লক্ষ্যস্থির করলো চন্দন। একটা বাল্কহেড থেকে রঙ চটালো তার বুলেট, লোক দু'জন ঝট করে মুখ তুলে তাকালো। পরমুহূর্তে আবার বাজুকার দিকে নিচু হলো তারা।

ব্যবধান মাত্র পঁচিশ গজ।

লঞ্চিং টিউবটা কাঁধে নিলো একজন। ফুলস্পীডে থ্রটল রাখলো রানা, সামনের ইয়টের সমান করা পানিপথ ধরে ছুটছে এইচআরসি-র ইয়ট। আবার গুলি করলো চন্দন, এবারও ব্যর্থ

হলো। ঠোঁট কামড়ে, ভুরু কুঁচকে রিভলভারের দিকে তাকালো সে।

হুশ-শ্ আওয়াজের সাথে ছুটে এলো রকেট, এতো কাছে যে গতিপথটা এবার চোখ দিয়ে অনুসরণ করা গেল না। বিস্ফোরণের শব্দটা হতে প্রায় কোনো সময় নিলো না। লাফিয়ে উঠলো ডেক, রানার পায়ের তলা অবশ হয়ে গেল।

'টার্গেট মিস করেনি ওরা!' চিৎকার করলো চন্দন।

'আমাদের সুযোগ আসছে,' বললো রানা। ওর মনে হলো, মেইন সেলুনে ঢুকে গেছে রকেটটা, বিস্ফোরিত হয়েছে ভেতরে। তা যদি হয়, খোলের কোনো ক্ষতি হবার আশংকা নেই। দূরত্ব এতো কমে গেছে যে কালো ইয়টটার আফটারডেক ওয়েলটা দেখতে পাচ্ছে রানা। চন্দন আবার গুলি করলো। এবার দু'জন লোকের একজন চরকির মতো পাক খেয়ে ইয়টের কিনারা থেকে ছিটকে পড়লো, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে। অপর লোকটা দৌড় দিলো। অকস্মাৎ অ্যারোনাফিসের ইয়ট পাগলামি শুরু করলো।

কালো ইয়টের হেলমসম্যান হঠাৎ দিক বদলে পিছনের ইয়টকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলো। প্রথমে ডান দিকে কাত হয়ে পড়লো তারা, তারপর বাম দিকে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে হেলমসম্যান।

'চন্দন, সাবধান...ব্রেস ইওরসেলফ!'

পরমুহূর্তে সংঘর্ষ। কাঠ আর ইস্পাতের ঘর্ষণে কান-ফাটানো শব্দ হলো। ধোপা যেভাবে কাঠের তক্তার ওপর ভিজে কাপড় আছাড় মারে, হুইলের ওপর ঠিক সেভাবে আছাড় খেলো রানা।

হুইল থেকে ড্রপ খেয়ে কন্ট্রোল প্যানেলে পড়লো ও, চামড়া উঠে গেল হাঁটু থেকে, নেতিয়ে পড়লো ডেকের ওপর। মাত্র এক মুহূর্ত, তারপর ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে লাফ দিতে চেষ্টা করলো ও, দেখলো নাকে রক্ত নিয়ে টলতে টলতে সিধে হবার চেষ্টা করছে চন্দন। কালো ইয়টের পিছনটা প্রবল ঝাঁকি খেতে খেতে নিচের দিকে ডেবে যাচ্ছে, প্রকাণ্ড একটা চকচকে ছোরার মতো বারকেইনহেইমারের ইয়ট চড়াও হয়েছে সেটার ওপর।

বাতাসের সাথে ভেসে এলো আর্তনাদ আর নির্দেশের শব্দ।

ব্রিজের চারদিকে ছুটোছুটি করছে বুলেট। সেলুনের মাথা থেকে অ্যারোনাফিসের দু'জন লোক গুলি করছে, দেখতে পেলো রানা। কালো ইয়টের একটা প্রপেলার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এইচআরসি বো-প্লেটের ধাক্কায়, নিরেট ইস্পাতের আর্তনাদে রী রী করে উঠলো গা।

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো রানা, পিছু হটতে শুরু করলো বোট। দুটো জাহাজ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলো, এই ফাঁকে ·৩৫৭ দিয়ে গুলি করলো চন্দন। কালো ইয়ট কাত হয়ে রয়েছে একদিকে, পিছনে মস্ত ক্ষত হয়ে গেছে। পাক খেতে শুরু করলো সেটা। ইতিমধ্যে মাথার ওপর চলে এসেছে কালো মেঘ, দ্বীপের ওপর তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। দ্বীপের সৈকত থেকে এদিকে চলে আসছে ফোঁটাগুলো।

ফুল অ্যাহেড-এ থ্রটল দিয়ে হুইলটা বন বন করে ঘোরালো রানা। ক্ষতিগ্রস্ত বো-র ভোঁতা নাক কালো ইয়টের তৈরি করা বৃত্তটাকে ভেদ করে যাবে।

'আবার ধাক্কা দেবেন?' বিস্ফারিত চোখ নিয়ে চিৎকার করলো

চন্দন, তার রিভলভার ধরা হাতটা ইনস্ট্রুমেন্ট কনসোল-এর ওপর একটা কাউন্টারের গায়ে ঠেকে রয়েছে।

‘ওটাকে থামাবার আর কোনো উপায় আছে?’ প্রবল বাতাস আর বৃষ্টির মধ্যে প্রশ্ন করলো রানা। ‘রিলোড, রিলোড, সুযোগ হারিয়ো না।’

রিভলভারের সিলিণ্ডার থেকে খালি কার্ট্রিজগুলো সরিয়ে নতুন রাউণ্ড ভরলো চন্দন, ব্যস্ত আঙুলগুলো কাঁপছে। বোটের বো ইয়টের যেখানে আঘাত করবে ঠিক সেখানেই তাকিয়ে আছে রানা। কালো ইয়ট ঘুরে গেলে কিছু করার নেই, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে রানা। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সংঘর্ষের ফলে ওটার রাডার নিশ্চয়ই জ্যাম হয়ে গেছে। অ্যারোনাফিসকে থামাবার জন্যে শল্য চিকিৎসকসুলভ সূক্ষ্মতার পরিচয় দেয়ার সুযোগ থাকলে খুশি হতো রানা। সরাসরি ধাক্কা মারলে ইয়টটা প্রায় অকেজো হয়ে যাবে। কিন্তু এ-ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। ও শুধু আশা আর প্রার্থনা করতে পারে, কয়েক টন ইস্পাত সবেগে ভেতরে ঢোকার সময় পথে যেন মিলি বা প্যাসিমভ না পড়েন।

আকাশ থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে সূর্য। সাগরে যেন সন্ধ্যা নামছে। বাতাসের গতিবেগ বেড়েছে আরো। বৃষ্টি হচ্ছে ঝম ঝম করে।

আরো কার্তুজ থাকলে ভালো হতো, ভাবলো রানা। ম্যাগাজিনে যে ক’টা আছে, ওগুলোই শেষ সম্বল। সংঘর্ষের কথা ভেবে একটা ঢোক গিললো ও। অনুভব করলো, জিভটা শুকিয়ে গেছে।

‘সাবধান, চন্দন!’ গর্জে উঠলো রানা, যদিও তার কোনো

দরকার ছিলো না। এরইমধ্যে পায়ের পাতার ওপর বসে পড়েছে চন্দন, পিঠ সেঁটে আছে ফ্রন্ট প্যানেলের গায়ে। হুইলে আর কিছু করার নেই রানার, কাজেই চন্দনের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করলো ও, থ্রটলটা সম্পূর্ণ খোলা রেখে গেল।

প্রতিটি সেকেণ্ড যেন এক ঘন্টা সময় নিচ্ছে পেরুতে। হাতে অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা।

সাগর ফুঁসছে, ঢেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ডেকের ওপর। ডেকের সচল পানি স্বচ্ছ কাঁচের মতো নেমে যাচ্ছে কিনারা দিয়ে।

সংঘর্ষের পর সময় যেন থমকে দাঁড়ালো। চোখের পলকে উল্টে পড়ার উপক্রম করলো কালো ইয়ট। টিমবার গুঙিয়ে উঠলো, কামানের গোলার মতো শব্দ করে ভেঙে গেল বীম। এইচআরসি-র বোট প্রতিপক্ষের বো-টাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সাইড ডেকের ভেতর দিয়ে হুইলহাউসের দিকে। ধাতব, কর্কশ আওয়াজ সহ্য করার মতো নয়। কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের বিরতিহীন সংঘর্ষ চললো।

নিস্তব্ধতা নামলো হঠাৎ।

বাতাসের ছোবল খেয়ে আলোড়িত হচ্ছে সাগর, লাফ দিচ্ছে, ফোঁস ফোঁস করছে ঢেউগুলো।

কথা বলার দরকার করে না, উঁচু হয়ে ওঠা ফোরডেক ধরে ছুটলো রানা, পিছনে চন্দন। লাফ দিয়ে কালো ইয়টে চলে এলো ওরা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা দানবের মতো কাত হয়ে আছে ওটা, মারাত্মক আহত, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।

রানা ডান দিকে ছুটলো, চন্দন বাঁ দিকে।

রানার অনুভূতিতে প্রথমেই তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার আঘাত

করলো। সেই সাথে নাকে ঢুকলো ডিজেল ফুয়েলের ভারি গন্ধ, বিদীর্ণ ফুয়েল ট্যাংক থেকে বেরিয়ে আসছে।

অ্যারোনাফিসের এক লোক ছুটে বেরিয়ে এলো দৃষ্টিপথে, হাতের পিস্তল উরুর পাশে, দেখামাত্র গুলি করলো রানা। চোখ নামিয়ে বগলের নিচে তাকালো লোকটা, পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙে বেরিয়ে গেছে বুলেট। শার্টটা লাল হয়ে উঠছে দেখে হাতের পিস্তল ফেলে দিয়ে বসে পড়লো সে, তারপর নেতিয়ে পড়লো। ভয়েই জ্ঞান হারিয়েছে।

একটা বিধ্বস্ত দরজা টপকে হুইলহাউসে ঢুকলো রানা। ভেতরের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে এটাকে আর হুইলহাউস বলা যায় না। আর্তচিৎকারটা এখান থেকেই হয়েছিল, সম্ভবত মিলির। কিন্তু না, তা নয়। চিৎকারটা অ্যারোনাফিস করেছে—হুইলের সাথে ঝুলছে সে, রঙিন চশমাটা লটকে আছে একটা কানের সাথে, মাথার চুল ডেক ছুঁই ছুঁই করছে।

'হেলপ মি!' এখনো বেসুরো গলায় চিৎকার করছে সে।

ক্ষীণ একটা বাঁকা রেখা ফুটলো শুধু রানার ঠোঁটে। অ্যারোনাফিসের একটা পা, হাঁটুর নিচেটা, একগাদা দোমড়ানো-মোচড়ানো ইস্পাতের মধ্যে আটকে গেছে। ট্রাউজারের পায়া বলতে কিছু নেই, হাঁটু আর উরু ভিজে আছে তাজা রক্তে। বাঁকাচোরা ইস্পাতের সাথে মাংস আর চর্বি দেখতে পেলো রানা।

'প্যাসিমভ কোথায়? মিলি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমরা ডুবে যাচ্ছি!' ডেকের কাছ থেকে, উল্টো করা চোখ দুটো বিস্ফারিত, ককিয়ে উঠলো অ্যারোনাফিস। 'আমি মারা যাচ্ছি!'

ইয়টের পিছন দিকে তাকালো রানা, কেউ নেই সেদিকে। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে টলমল করছে ইয়ট। কাত হয়ে পড়লো একদিকে, তাড়াতাড়ি দেয়াল ধরে নিজেকে স্থির রাখলো রানা। ইস্পাতের ভোঁতা একটা রডের সাথে ঠুকে গেল অ্যারোনাফিসের মাথা। তার শরীরটা দুলছে, জাহাজ স্থির না হওয়া পর্যন্ত মাথাটার নিরাপত্তা বলে কিছু নেই।

'বের করো আমাকে!' আর্তনাদ করে উঠলো অ্যারোনাফিস, ইস্পাতের গভীর জঙ্গল থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে টানাটানি করছে পাটা, ফাঁদে পড়া পশুর মতো দু'হাতে ঘুসি মারলো ডেকের ওপর। 'পাটা ছাড়িয়ে দাও! জাহাজ ডুবে যাচ্ছে!'

'জানি,' শান্ত গলায় বললো রানা। 'আগে ওদেরকে বাঁচাতে হবে।'

ডেকের ছ'ইঞ্চির মধ্যে ঝুলে থাকা চোখ দুটো ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকালো অ্যারোনাফিস। 'আমার দাবি...।'

'দাবি নিয়ে দরবার করো ভাগ্যের কাছে, কোস্টাস।' রানা আর সময় নষ্ট করলো না, বিধ্বস্ত হুইলহাউস থেকে পথ করে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। পিছনে খিস্তি করছে অ্যারোনাফিস, লোনা পানির ঝাপটা এসে তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিলো।

বাইরে বেরুতেই আবার ঝাঁঝালো ডিজেল ফুয়েলের গন্ধ পেলো রানা। ইস্পাতের সাথে ঘষা খাচ্ছে ইস্পাত, আগুনের একটা ফুলকি দরকার শুধু, এক পলকে গোটা জাহাজ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

নিকোলাই প্যাসিমভকে খুঁজে পেতে হবে ওর। দেখতে হবে মিলি কোথায়। দু'জনেই হয়তো আহত হয়েছে, শব্দ করতে

পারছে না। নাকি ডুবে গেছে? মারা গেছে সংঘর্ষের ফলে?

অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ালো রানা, আলোড়িত সাগরে যা দেখলো তাতে শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানের চামড়া কুঁকড়ে উঠলো ওর।

নেমিসিসকে চিনতে পারলো রানা পরিষ্কার।

দশ

জাহাজটা এখনো দুই কি তিন মাইল দূরে।

ঢেউয়ের মাথা থেকে ছিটকে বেরোনো ফেনা আর বৃষ্টির ভেতর ভালোভাবে দৃষ্টি চলে না, তবে কাঠামোটা দেখামাত্র নেমিসিসকে চিনতে পেরেছে রানা। পরিষ্কার বোঝা গেল, বিধ্বস্ত কালো ইয়টটার দিকে আসছে ওটা, বো-র নিচে বিচূর্ণ ঢেউয়ের উজ্জ্বলতা।

একটা হ্যাচ লক্ষ্য করে ছুটলো রানা, কাঠের মই বেয়ে নামতে গিয়ে ইয়টের সাথে কাত হলো এদিক ওদিক। নিচে একটা স্টোরেজ হোল্ড, ভাঙাচোরা কাঠের বাক্সে ঠাসা, প্রতিটি বাক্সে ১৫৫ এম এম আর্টিলারি রাউণ্ড। অ্যারোনাফিসের বেসমেন্ট ওয়্যারহাউসে কি ঘটেছিল, পরিষ্কার হয়ে গেল। লোকটা তার

অস্ত্রশস্ত্র ইয়টে তুলে নেয়। একটা স্টেটরুমের ভেতর দিয়ে পথ করে নিলো রানা। এখানে আরো বাক্স রয়েছে। এগুলোয় বাজুকা রকেট আর গ্রেনেড দেখলো ও। ইয়ট তো নয়, ভাসমান একটা অস্ত্রভাণ্ডার।

ফুয়েল অয়েল-এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

জরুরী তাগিদ অনুভব করে বাক্সগুলোকে কখনো পাশ কাটিয়ে, কখনো টপকে দ্রুত এগোলো রানা। অনেকক্ষণ হলো একই দিকে কাত হয়ে রয়েছে ইয়ট, খোলে একের পর এক আঘাত করে চলেছে ঢেউগুলো। স্টীল হোল্ডে পানি ঢোকার শব্দ পেলো ও। ওল্টানো একটা জাহাজে আগুন ধরে গেছে, দৃশ্যটা বারবার ফিরে এলো মনে।

সামনের দরজায় কলকল ছলছল করছে পানি, গোড়ালি ডুবে গেল রানার। দরজাটা খুলতে চেষ্টা করলো, ওর বুকের ওপর বিস্ফোরিত হলো সেটা, কবাট ধরে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলেও হাঁটু সমান পানির তোড় আঘাত করলো ওকে। কারা যেন চিৎকার করছে। একটু বেখেয়াল হতেই কবাট থেকে ছুটে গেল হাতটা, পানির তোড়ে ছিটকে পড়লো রানা, কয়েক সেকেণ্ড হাবুডুবু খেলো, গলায় পানি আটকে যাওয়ায় কাশলো। দুটো কামরায় একই লেভেলে পৌঁছুলো পানির স্তর, থেমে গেল প্রবাহ। পানি কেটে দরজার দিকে আবার এগোলো রানা, ইস্পাতের কর্কশ গোঙানি ঢুকলো কানে, আরেকটা শব্দকে মান্ধাতা আমলের বালব হর্নের মতো লাগলো, নিরেট ও বিপুল ইস্পাত পরস্পরকে পিষছে। আওয়াজগুলো ভেসে আসছে পাশের কমপার্টমেন্ট থেকে। ভেতরে ঢোকার আগেই বিচ্ছিন্ন, ছেঁড়া-ফাড়া, জট পাকানো এইচআরসি বোটের বো-টা দেখতে পেলো রানা। স্টেটরুমের

অর্ধেকটা বেদখল হয়ে গেছে। জোড়া বিছানা সহ একটা খাট সামনের দেয়াল ভেঙে অর্ধেকের বেশি ভেতরে ঢুকে গেছে, কমলা রঙের বালিশগুলো আলোড়িত পানিতে ভাসছে। ক্রমশ উঁচু হচ্ছে পানির স্তর। দ্বিতীয় কোনো পথ দিয়ে বেরুবার উপায় নেই রানার।

কেঁপে উঠলো কালো ইয়ট, তারপর আরো খানিকটা কাত হলো।

বিস্ফোরণের শব্দে খোলের গায়ে আঘাত করছে ঢেউ।

কাত হওয়া ডেকে এখন কোমর সমান পানি। হাত দিয়ে এটা-সেটা ধরে ফিরে আসছে রানা। মইটা পেয়ে উঠে এলো ওয়েদার ডেকে। তুমুল বৃষ্টি আর লোনা পানির ছিটা ভিজিয়ে দিলো ওকে, জ্বালা করে উঠলো চোখ। জাহাজের ওয়েদারসাইডে তাকিয়ে বুঝতে পারলো না কোথায় কয়লা-কালো আকাশের শুরু আর ধূসর সাগরের সমাপ্তি। অনেক কষ্টে, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে উঁকি দিলো বিধ্বস্ত হুইলহাউসের দিকে। বীভৎস দৃশ্যটার ওপর এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো রানার দৃষ্টি। একটা ভাঙা স্কাইলাইট থেকে নিচে তাকিয়ে আছে ও। এখনো ডেক ছুঁয়ে রয়েছে অ্যারোনাফিসের চুল, এক লোক আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে বড় একটা ছোরা দিয়ে ঘষে ঘষে তার পা কাটছে, হাঁটুর ঠিক নিচ থেকে। লোকটার হাত দুটো লাল হয়ে আছে।

এ-ব্যাপারে কিছু করার চিন্তা মনে ঠাঁই দিলো না রানা।

আর বেশি সময় নেই হাতে।

একদিকের রেইল ডুবে গেছে সাগরে।

লক করা ইয়ট উঠছে আর নামছে, যদিও নিয়মিত কোনো ছন্দে নয়। এইচআরসি-র বোট কালো ইয়টের ভেতর সেঁধিয়ে থাকা একটা ছোরা যেন, আহত শরীরের ভেতর মোচড় খাচ্ছে।

তৈজস-পত্র চুরমার হবার শব্দ হলো, ফার্নিচার ভাঙছে, আরেক দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে ভারি কার্গো।

এক মাইলের মধ্যে চলে এসেছে নেমিসিস। বৃষ্টি কমে গেলেও, ফেনা আর পানির ছিটায় দৃষ্টিপথ এখনো ঝাপসা।

আরেকটা হ্যাচ দেখতে পেয়ে নিচে নামলো রানা, জানে, জীবনে আর বেরুতে না পারার ঝুঁকি নিচ্ছে ও। আবর্জনা ভর্তি মেইন সেলুনে নেমেছে। এমনকি এখানেও অ্যামুনিশন ভরা বাক্স দেখা গেল। পিছনে গুলির শব্দ হতে ঝট করে এক পাশে সরে গেল ও, চরকির মতো আধপাক ঘুরলো, হাতের ম্যাকারভ গুলি করার জন্যে তৈরি। এক পলকে দৃশ্যটা দেখা হয়ে গেল রানার–চন্দনের পিঠ, তার সামনে সাদা শার্ট পরা দু'জন ক্রু, সেলুনের পিছন দিকের দরজা থেকে গুলি করছে। একটা বুলেট রানার কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। জবাবে ঝাঁকি খেলো চন্দনের হাত, .৩৫৭ গর্জে উঠলো। পরমুহূর্তে সবেগে ঘুরলো চন্দন, তার হাতের রিভলভার ছিটকে গেল ইয়টের বাইরে, প্রতিপক্ষদের লক্ষ্য করে পর পর তিনটে গুলি করলো রানা। তাদের মধ্যে একজন কুঁজো অবস্থা থেকে স্তূপ-এর আকৃতি নিলো। অপরজনের পা হড়কালো, পিছলে পাশ কাটালো চিমনিটাকে, তারপর ঝাঁপ দিলো বিক্ষুব্ধ সাগরে, আকস্মিক আতংকে নিশ্চিত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

চন্দনের দিকে ঝুঁকলো রানা। একটা হাত ধরে বসে আছে সে, চোখমুখ কোঁচকানো। 'শুধু হাতে লেগেছে?' সমস্ত আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো রানার গলা।

'তেমন কিছু নয়,' বিড়বিড় করে বললো চন্দন। সমস্ত রক্ত

নেমে গেছে মুখ থেকে। তার লালচে গোঁফ খাড়া হয়ে রয়েছে, যেন রঙের দাগ ওগুলো।

'প্যাসিমভ আর মিলিকে কোথাও দেখেছো?'

'নিচে, পিছন দিকে, মাস্টার স্টেটরুমে,' কাতরকণ্ঠে বললো চন্দন। 'প্রায়-নিশ্চিত, মাসুদ ভাই। ক্রু দু'জন পাহারায় ছিলো। আমাকে দেখে ধাওয়া করে।'

ব্যস্ত হাতে চন্দনকে ধরলো রানা, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো, তার জ্যাকেটের কনুই থেকে রক্ত ঝরছে। 'আমাদের ইয়টে ফিরে যাও তুমি,' নির্দেশ দিলো রানা।

'মাসুদ ভাই, আমি...।'

'কথা নয়। যদি পারো ফরওয়ার্ড কমপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে দেবে। যাও!'

চওড়া ধাপ বেয়ে নামার সময় পিছন ফিরে তাকালো না রানা, হোঁচট খেয়ে ঝপাৎ করে পড়লো, সিধে হলো কোমর সমান পানিতে। স্টেটরুমের দরজা বন্ধ, হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো। খুললো না। 'মিলি!'

দরজার ভেতর থেকে অস্পষ্ট গলা ভেসে এলো, মেয়েলি কণ্ঠ বলে চিনতে পারলো রানা, 'রানা? খোলো, প্লিজ, দরজাটা খোলো!'

দরজার গায়ে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা দিলো রানা। পাথরের মতো নিরেট ও অনড়।

ভেতর থেকে নিকোলাই প্যাসিমভের গলা ভেসে এলো, শান্ত ও ভারি। 'কোথাও একটা চাবি আছে। দেখুন খুঁজে পান কিনা।'

'চাবি আছে, পিছিয়ে যান আপনারা,' বললো রানা, পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেলো ইয়ট, ছিটকে দেয়ালের গায়ে পড়লো ও। সিধে হয়ে

তালার ওপর লক্ষ্যস্থির করলো, টেনে দিলো ট্রিগার। বিস্ফোরণের শব্দে তালা লেগে গেল কানে। বারুদের গন্ধ এলো, সাদাটে খানিকটা ধোঁয়া দেখা গেল পানির ওপর। কবাট থেকে বেরিয়ে এসে ডিগবাজি খেলো দরজার হাতল, পানিতে পড়ে তলিয়ে গেল। বিস্ফোরিত হলো কবাট, পানি কেটে বেরিয়ে এলো প্রথমে মিলি, বিস্ফারিত চোখ, মুখটা যেন আতংকের মুখোশ, শরীরের বাঁক আর ভাঁজগুলো ফুটে আছে ভিজে কাপড়ের নিচে। দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরলো সে।

ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো রানা, হাতের অস্ত্রটা তাক করলো। 'ওপরে ওঠো, জলদি!' কঠিন সুরে নির্দেশ দিলো ও।

'রানা, তোমার দোহাই লাগে, ওরা যেন মি. প্যাসিমভকে ধরতে না পারে...।'

'কি বললাম তোমাকে? ওপরে চলে যাও!' রুশ বিজ্ঞানীর দিকে তাকালো রানা। 'আপনিও। আগে বাড়ুন, প্লিজ। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না।'

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বারবার পিছন ফিরে রানার দিকে তাকালো মিলি, বার কয়েক হোঁচট খেলো ধাপের সাথে। 'মহৎ একজন মানুষকে আমি শুধু সাহায্য করতে চেয়েছি, রানা। প্রয়োজন হলে আবার করবো। এটা যদি কোনো অপরাধ হয়...।' ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

'এ নিয়ে পরে কথা হবে,' গর্জে উঠলো রানা। 'মুভ!'

দুটো ইয়টের জন্যেই হুমকি হয়ে উঠেছে সাগর, কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করছে না। বৃষ্টি থেমে গেলেও, তীব্র বাতাস এখন ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে ঝড়ে পরিণত হয়েছে। ঢেউগুলো যেন সাপের ফণা, অনবরত ছোবল মারছে জাহাজ দুটোকে। পোর্ট বোর দিক

থেকে ছুটে আসছে নেমিসিস, দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা, যেন একটা কালো পাঁচিল।

স্কাইলাইট দিয়ে পিচ্ছিল ডেকে বেরুতে হলো ওদেরকে, এই ডেকটাই সেলুনের ছাদ। বেরুতেই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝড়। পড়ে গেল মিলি, পড়েই পিছলে গেল, পানির ওপর ঝুঁকে থাকা সুপার স্ট্রাকচারের দিকে ছুটলো শরীরটা। খপ করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন নিকোলাই প্যাসিমভ, তা না হলে দুর্ঘটনা ঠেকানো যেতো না। হাতের অস্ত্র নেড়ে ওদেরকে তাগাদা দিলো রানা। গা থেকে পানি ঝরছে ওর, একনাগাড়ে বিকট সব শব্দের ভেতর থাকায় কানে খুব কম শুনতে পাচ্ছে। চন্দনের কথা ভেবে মনে মনে উদ্বিগ্ন হলো ও। সে কি নিরাপদে পৌঁছুতে পেরেছে এইচআরসি বোটে? প্রতিটি পদক্ষেপে পিছলে যাবার ভয় রয়েছে, অনুভব করলো ও। ফুয়েল অয়েল-এর গন্ধ আগের মতোই ঝাঁঝালো।

বিধ্বস্ত হুইলহাউসের ছাদ হয়ে এগোলো ওরা। স্কাইলাইটের পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো রানা, প্রায় চমকে উঠলো। কোথায় অ্যারোনাফিস? গেল কোথায়?

অ্যারোনাফিস পালিয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্কশ একটা হাসির শব্দ বয়ে নিয়ে এলো বাতাস। আওয়াজটার মধ্যে উন্মত্ত একটা ভাব লক্ষ্য করে বুকের রক্ত পানি হয়ে গেল রানার। উৎসের দিকে ঘাড় ফেরালো ও। চোখে কাঁটার মতো বিঁধলো কোস্টাস অ্যারোনাফিস।

এইচআরসি ইয়টের বো-র ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, তার একজন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে। হাঁটুর নিচে কাটা পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে সে। রক্তে লাল হয়ে আছে সেটা। চোখে রঙিন

সানগ্লাসটা নেই। চোখ দুটো ছোটো হয়ে রয়েছে, দৃষ্টিটা অশুভ, জ্বলজ্বলে।

'তুমি আমার সর্বনাশ করেছো!' উন্মাদের মতো গর্জে উঠলো কোস্টাস অ্যারোনাফিস। 'আমি ধ্বংস হয়ে গেছি! কিন্তু তোমাকে আমি বাঁচতে দেবো না! তোমরা মারা যাবে, তোমরা সবাই!'

হাত তুলে তেলে ভেজা কিছু ছেঁড়া কম্বল দেখালো সে, উইণ্ডপ্রুফ সিগারেট লাইটার জ্বেলে শিখাটা ছোঁয়ালো কম্বলের গায়ে। কালো ইয়টের গর্তটা লক্ষ্য করে আগুনটা ছুঁড়ে দিলো সে, এইচআরসি জলযানের সামনের দিকে।

গুলি করলো রানা। কিন্তু এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

চোখ ঝলসানো আলো দেখা গেল, সেই সাথে গর্জে উঠলো আগুন।

এগারো

কালো ইয়টের ফাটল থেকে উথলে উঠলো আগুন, সাদা ইয়টের খোল বেয়ে ওপরে উঠলো, জ্বলে উঠলো পানিতে ছড়িয়ে পড়া তেল।

তীব্র আঁচ থেকে বাঁচার জন্যে হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটছে

রানা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার গুলি করলো। লোকগুলোর মুখ আর বুক ছিঁড়ে দিলো ওর বুলেট। কোটিপতির সহকারী ঢলে পড়লো ডেকের ওপর, অবলম্বন হারিয়ে তাল হারিয়ে ফেললো অ্যারোনাফিস। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো, রক্তভরা মুখের ভেতরটা দেখতে পেলো রানা, ঠোঁট ভাঁজ হয়ে আছে ভেতর দিকে। হাঁটুর কাছে বিচ্ছিন্ন পাটা ডেকে ফেলার চেষ্টা করছে সে, এক পায়ে ঘন ঘন লাফাচ্ছে। ভারসাম্য ফিরে না পাওয়ায় দাউ দাউ অগ্নিকুণ্ডের দিকে মাথা দিয়ে পড়ে গেল।

'আমাদের কি হবে?' কাত হয়ে থাকা ডেকে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে হুবহু একটা ব্যাঙের আকৃতি নিয়েছেন নিকোলাই প্যাসিমভ।

চট করে নেমিসিসের দিকে তাকালো রানা। প্রকাণ্ড দেখালো জাহাজটাকে। ঢেউয়ের মাথায় চড়ছে ওটা, চারপাশে গর্জন করছে উত্তাল সাগর। একটা মূক হতাশা গ্রাস করতে চাইলো রানাকে। কালো ইয়টের খোল জুড়ে সবগুলো বিধ্বস্ত পোর্টহোল জানালা থেকে আগুন তার লকলকে জিভ বের করে দিয়েছে। ধোঁয়া লেগে চোখ আর ফুসফুস জ্বালা করছে। আগুন ধরা ফাটলটা পেরিয়ে এইচআরসি ইয়টের বো-তে যাওয়ার কোনো পথ আছে বলে মনে হলো না। অথচ টিএনটি-র একটা পাহাড়ে বসে রয়েছে ওরা।

'এবার তুমি খুশিতো?' চিৎকার করলো মিলি, তার কালো চোখ দুটো রাগে জ্বলছে। 'এখন আর মি. প্যাসিমভের বিনিময়ে নিজেকে বাঁচানোর কোনো সুযোগ নেই তোমার, অনেক দেরি করে ফেলেছো। কে.জি.বি. ওঁকে অনায়াসে তুলে নিয়ে যাবে।'

মিলির কথায় কান দিলো না রানা, সাদা ইয়টের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলো, 'চন্দন! চন-দ-ন!'

কেউ সাড়া দিলো না।

একটা ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, কাত হয়ে থাকা স্ত ূপটা মোচড় খেলো, পানিতে ডুব দিচ্ছে বো, প্রতিটি ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে লালচে শিখা।

যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটবে। একটা পিঁপড়েও বাঁচবে না।

মইটা হঠাৎ চোখে পড়লো রানার। খোলের গায়ে সাঁতারুদের জন্যে যেমন থাকে, এটাও সেরকম একটা। মইটা সেলুনের দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে। ঝট করে নিকোলাই প্যাসিমভের দিকে ফিরলো ও, অস্ত্রটার ভূমিকা গোপন করলো না। 'ওটা নিয়ে আসুন,' দ্রুতকণ্ঠে নির্দেশ দিলো ও, চোখ ইশারায় মইটা দেখিয়ে দিলো। 'পাশের ইয়টের ডেকের সাথে লাগান। তাড়াতাড়ি!'

রানার কথা মতো কাজ করলেন নিকোলাই প্যাসিমভ। ধাপগুলোর মাঝখানে আগুনের শিখা নাচানাচি করছে, তবে খুব বেশি উঁচু হচ্ছে না, দ্রুত পা ফেলে পার হওয়া সম্ভব। দূরত্বটা আট ফুটের বেশি হবে না।

মিলিকে টেনে নিয়ে এলো রানা, মইটার দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'যাও!'

যতোটা সম্ভব দ্রুত ছুটলো মিলি, দু'সারি দাঁত পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে হাত দুটো শরীরের দু'দিকে মেলে দিয়েছে, এক কি দু'বার বিপজ্জনকভাবে এদিক ওদিক কাত হলো, তার জুতোর সোল চাটছে শিখাগুলো। ওপর-নিচে দুলতে শুরু করলো মই, মিলির ভারে ডেবে গেল নিচের দিকে। তবে নিরাপদেই ওপারে পৌঁছুলো সে।

'এবার আপনি,' নিকোলাই প্যাসিমভকে বললো রানা।

মৃদু শব্দ করে সম্মতি প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক, সাবধানে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে মইয়ের ধাপে পা রাখলেন, তারপর দ্রুত ছুটলেন। কোনো রকম অঘটন না ঘটিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলো রানা। 'হুইলহাউসে,' নির্দেশ দিলো ও।

সশব্দে বাতাস টানলো মিলি, থমকে দাঁড়ালো দোরগোড়ায়। তার পিছন থেকে উঁকি দিলো রানা। দেখলো, মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে চন্দন।

জ্ঞান নেই চন্দনের, কারণটা সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। রানা শুধু আন্দাজ করতে পারলো, ওয়াটারটাইট ফরওয়ার্ড কমপার্টমেন্টের দরজাটা যখন বন্ধ করেছিল সে, নিশ্চয়ই ইয়টটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্বীপের দিকে রওনা হবার প্ল্যান ছিলো তার।

ওদের লীওয়ার্ড সাইড পেরিয়ে গেছে নেমিসিস, এই মুহূর্তে কালো ইয়টের দিকে ধীরগতিতে এগোচ্ছে, মাঝখানে খুব বেশি হলে একশো গজ দূরত্ব।

সাদা ইয়টকে পিছন দিকে চালিয়ে ফুল স্পীড দিলো রানা। থরথর করে কেঁপে উঠলো জাহাজটা, গোঙাচ্ছে। নিচের দিকে থ্রটল চেপে রাখলো রানা, ডান আর বাঁ দিকে বন বন করে ঘোরালো হুইলটা। ধীরে ধীরে, ঝাঁকি খেতে খেতে, বিরাট সাদা ইয়ট দোমড়ানো-মোচড়ানো ইস্পাত আর ভাঙা কাঠের স্তূপ থেকে ছিঁড়ে আনলো নিজেকে। ভার মুক্ত কালো ইয়ট সিধে হলো, ধীরে ধীরে নামছে সাগরে। পানির ওপর গড়াচ্ছে কালো আর হলুদ ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বাতাস পেয়ে কঠিন আর নিরেট টানেলের আকৃতি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

সবেগে হুইল ঘুরিয়ে ফুলস্পীডে রোডসের দিকে ছুটলো রানা, দোমড়ানো বো আঘাত করছে ঢেউগুলোকে, থরথর করে কাঁপছে ইয়ট।

পিছনে পড়ে থাকলো অ্যারোনাফিসের ইয়ট, সেটার দিকে এখনো এগোচ্ছে নেমিসিস। কোর্স দেখে মনে হলো, কালো ইয়টটার পাশে ভিড়তে চায় জাহাজটা।

হাতের অস্ত্র কাউন্টারের ওপর রেখে তীরে পৌঁছুনোর সংগ্রামে মন দিলো রানা। ইয়টের বো নিচু হয়ে আছে, এখুনি হয়তো কোনো বিপদ ঘটবে না, তবে পানি ঢুকছে বোটে। ছুটছে ইয়ট, তবে মাঝে মধ্যেই থামার উপক্রম করছে, এঞ্জিনের ইতস্তত ভাবটা ঘন ঘন দেখা দিলো। কে.জি.বি. এজেন্টরা নিশ্চয়ই অবস্থাটা লক্ষ করেছে, জানে ওদেরকে ধরার জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে, যদি অ্যারোনাফিসের ইয়টে খুব বেশি সময় নষ্ট না করে। বোঝাই যাচ্ছে, তারা জানে না দুটো ইয়টের কোন্‌টায় আছেন নিকোলাই প্যাসিমভ। তবে জানতে খুব বেশি সময়ও লাগবে না।

'ফিরে চলো!' রানার পাশে চলে এলো মিলি, উন্মাদিনীর চেহারা। আবার চিৎকার করলো সে, 'এখনো সময় আছে, ফিরে চলো!'

'শাট আপ!' খেঁকিয়ে উঠলো রানা। 'সরো তুমি!'

হুইলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মিলি, ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো রানা। ডেকে বসে রাগে কাঁদতে শুরু করলো মেয়েটা। দূরের তীর লক্ষ্য করছে রানা। সৈকতের ভালো একটা জায়গা আগেই বেছে রাখা দরকার, বিশেষ করে ইয়টের মতিগতি যখন সুবিধের মনে হচ্ছে না।

সম্ভবত মিনিটখানেক পেরিয়েছে।

চোখের কোণে এখন আর মিলিকে দেখা যাচ্ছে না। তবে তার অনুপস্থিতি গুরুত্বের সাথে নিলো না রানা।

অকস্মাৎ একটা হাত সাঁৎ করে এগিয়ে এলো, কাউন্টার থেকে তুলে নিলো ম্যাকারভটা। 'এবার তোমাকে ফিরতে হবে, রানা। আমার কথা শুনতে বাধ্য তুমি। আমি দুঃখিত,' হিসহিস করে বললো মিলি।

উত্তেজনা আর ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে মিলির চোখ, রানার বুক লক্ষ্য করে ধরে আছে অস্ত্রটা। একটু একটু কাঁপছে হাতটা।

রানা কিছু বলার আগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো নিকোলাই প্যাসিমভের চেহারা। হাসলেন তিনি। 'ওটা আমাকে দাও, ডিয়ার,' তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বরে জরুরী তাগাদার ভাবটুকু চাপা থাকলো না।

'অবশ্যই, নিকোলাই।'

রুশ বিজ্ঞানীর হাসিখুশি শান্ত ভাব অকস্মাৎ কর্তৃত্বপূর্ণ, রাশভারী, আর নীরস হয়ে উঠলো। অস্ত্রটা হাতে চলে আসায় সম্পূর্ণ বদলে গেলেন তিনি। অত্যন্ত পেশাদারী ভঙ্গিতে রানার দিকে লক্ষ্যস্থির করলেন। হাতটা কাঁপছে না। তাঁর চোখে পলকও পড়ছে না। 'আপনি আমাকে এখুনি নেমিসিসে নিয়ে যাবেন,' রানাকে বললেন তিনি। 'আমি চাই না আপনি আমার নির্দেশ অমান্য করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনুন।'

ইয়টের কোর্স যা ছিলো তাই থাকলো, বদলালো না রানা। ওর ঠোঁটে এক চিলতে হাসি। 'তোমার মনে হয় না, মিলিকে সব কথা জানাবার সময় হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'কি বলতে চাও তুমি?'

'তুমি ভুয়া লোক, নিকোলাই প্যাসিমভের ডামি, তাই না?' বাস্তব সত্যের বিবরণ, শুধুই একটা প্রশ্ন নয়।

রাশিয়ানের ম্লান সবুজ চোখে ঘৃণা ফুটে উঠলো। 'এখন আর ব্যাপারটা গোপন রাখার কোনো কারণ দেখছি না আমি···।'

মিলির নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার শব্দে বাধা পেয়ে চুপ করে গেল লোকটা। 'নিকোলাই!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো মিলি 'এ-সব কি বলছো তুমি!'

লোকটা মিলির দিকে অস্ত্র তুলে নাড়লো। 'ওদিকে, রানার পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

'কিন্তু···!' বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল মিলি।

'মুভ!' গর্জে উঠলো লোকটা।

'এসো,' তিক্ত হাসি হেসে মিলিকে বললো রানা। 'পাশে জায়গা দিতে রাজি আছি আমি।'

ওদের দু'জনের দিকে অস্ত্র ধরলো লোকটা। 'অনুমতি পেলে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পারি,' বলে নিঃশব্দে, সকৌতুকে হাসলো সে, ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছে। 'আমি ক্যাপটেন মিখাইল বোগডানোভিচ, কে.জি.বি. অফিসার, অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

শুধু শুনলো রানা, চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না। শান্ত, ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইলো, 'তিনি তাহলে কোথায়, আসল নিকোলাই প্যাসিমভ?'

'কোথায় আবার, পরপারে। গতবছর মারা গেছেন তিনি, কিন্তু কাউকে তা জানতে দেয়া হয়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু। কয়েক বছর আগেই সরকারকে আমরা কে.জি.বি-র তরফ থেকে অনুরোধ করেছিলাম, নিকোলাই প্যাসিমভ মারা গেলে খবরটা যেন বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। তার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ না হয়ে পড়ার ওপরই নির্ভর করছিল আমাদের প্ল্যানটা···।'

'আর সেটা হলো, তুমি তোমার বাকি জীবন তাঁর ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমে কাটাবে,' বললো রানা।

'ঠিক তাই। এবার, ইয়টটা ঘোরাও...।'

'সত্যি আশা করো, এ-যাত্রা রক্ষা পাবে তুমি?'

'তোমাকে আমি বোকা বানিয়েছি, বানাইনি?' গর্বিত ভঙ্গিতে হাসলো বোগডানোভিচ।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেছো।'

'তোমাকে গুলি করে নিজেকে আমার হুইল ধরতে হবে?'

কথা না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা।

পিছিয়ে গেল বোগডানোভিচ, পিস্তলটা তুললো, লক্ষ্যস্থির করলো রানার মাথায়।

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো মিলি, আতংকে হাত দুটো বাল্কহেডের ওপর মেলে দিয়েছে সে। 'রানা! যা বলছে শোনো!'

'শোনা না শোনায় আসলে কিছু আসে যায় না, মিলি,' বললো রানা। 'যাই ঘটুক না কেন, দু'জনকেই খুন করবে ও। অনেক বেশি জানি আমরা।'

'কে.জি. বি-র যে অফিসাররা এই অ্যাসাইনমেন্ট রচনা করেন, তুমি তাঁদের চক্ষুশূল, রানা,' বললো বোগডানোভিচ। 'সেজন্যেই তোমার বিরুদ্ধে সোচ্চার একটা গ্রুপকে অ্যাসাইনমেন্টটা দেয়া হয়। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিলো, প্রতিপক্ষদের মধ্যে যদি মাসুদ রানা থাকে, সুযোগ পেলে অবশ্যই তাকে খতম করতে হবে। আমরা সবাই গুস্তাফ তাতাভস্কির শিষ্য, রানা। তুমি শুধু তার পুরুষত্ব কেড়ে নিয়েই সন্তুষ্ট হওনি, শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের হাতে খুনও করেছো। কাজেই প্রতিশোধ নেয়ার এখনই সময়। বিদায়, রানা।' হাসি হাসি চোখ-মুখ নিয়ে ম্যাকারভের ট্রিগার টানলো সে।

হ্যামার পড়লো খালি চেম্বারে।

রানা হাসলো না, গম্ভীর হয়ে আছে। 'তোমার বোঝা উচিত ছিলো, লোড করা একটা অস্ত্র এভাবে আমি ফেলে রাখতে পারি না।'

'ইউ বাস্টার্ড!'

'তবে, তাড়াতাড়ি তথ্য আদায়ে সাহায্য করেছে অস্ত্রটা। তুমি সরে থাকো, মিলি।' হুইল ছেড়ে দিয়ে ঘুরলো রানা, সামনের দিকে ঝুঁকলো, বোগডানোভিচকে খালি হাতে কাবু করবে। অস্ত্রটা ছুঁড়ে মারার প্রস্তুতি নিলো বোগডানোভিচ, মাথার পাশে উঁচু করে ধরলো, চোখ দুটো কুঁচকে ছোটো হয়ে আছে, দাঁতের সাথে সেঁটে আছে পুরু ঠোঁট।

অকস্মাৎ হলুদ-সাদা চোখ-ধাঁধানো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো হুইলহাউস, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। শকওয়েভের ধাক্কায় কাত হয়ে পড়লো ইয়ট। সবাই ছিটকে পড়ে একটা স্তূপ তৈরি করলো। ম্যাকারভের ব্যারেল রানার খুলিতে সশব্দে আঘাত করলো, একই সাথে ওর একটা হাঁটু সবেগে গুঁতো মারলো বোগডানোভিচের তলপেটের নিচে। হিস হিস করে ফুসফুস খালি করলো কে.জি.বি. এজেন্ট, গোঙাতে গোঙাতে হাতের ম্যাকারভ আবার তুললো। হাতটা খপ করে ধরে ফেললো রানা, অনুভব করলো খুলির ক্ষতটা থেকে রক্তের একটা গরম ধারা নেমে আসছে জুলফি বেয়ে। বোগডানোভিচের হাতটা বাল্কহেডের গায়ে সজোরে ঠুকে দিলো ও, আঙুলের গিঁটগুলো ভেঙে গেল।

সোজা হলো ইয়ট। আঁচড়ে খামচে স্তূপের তলা থেকে বেরিয়ে

এলো মিলি। কি যেন বিধ্বস্ত হলো আফটারডেকে। রানার ডান হাতের ঘুসি ডেকের ওপর শুইয়ে দিলো বোগডানোভিচকে। পঞ্চান্ন বছর বয়সে কতো সহ্য হয়, জ্ঞান হারিয়েছে সে।

'রানা, আমি দুঃখিত... ,' শুরু করলো মিলি।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে জুলফির রক্ত মুছলো রানা। দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠলো মিলি। 'দেখো,' বলে একটা হাত তুললো রানা।

ওদের পিছনে কালো ইয়টটার কোনো অস্তিত্ব নেই। তার জায়গায় রয়েছে কালো ধোঁয়ার বিশাল মেঘ। মেঘের ভেতর থেকে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে জঞ্জাল, আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে আগুনের গোলা। কালো ধোঁয়ার ভেতর অর্ধেকটা ঢুকে গেছে নেমিসিস। এরইমধ্যে আগুন ধরে গেছে জাহাজটায়, কিছুটা কাত হয়ে রয়েছে একদিকে। বিস্ফোরণের উৎসের দিকে প্রতি মুহূর্তে আরো কাত হয়ে পড়ছে ওটা। প্রতিটি বিস্ফোরণের আওয়াজ যেন আরো ঝুঁকে পড়ার জন্যে প্ররোচিত করছে জাহাজটাকে।

তীব্র বাতাসে কালো ধোঁয়া বেশিক্ষণ গাঢ় থাকলো না। একের পর এক ভেঙে গেল স্তম্ভগুলো। ভেতরে দৃষ্টি চলার পর দেখা গেল বিস্ফোরণের উৎস বলতে এখন আর কিছু নেই। নেই কালো ইয়টটাও। ওখানে শুধু টগবগ করে ফুটছে সাগর।

দ্রুত ডুবে যাচ্ছে নেমিসিস। ইতিমধ্যে জাহাজের মাঝখানেও আগুন ধরে গেছে।

সৈকতে ইয়ট ভিড়ালো ওরা, পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলো, নেমিসিসের পিছনটা আকাশে উঠে গেছে, ব্রোঞ্জের তৈরি প্রকাণ্ড প্রপেলার দুটো ধীরগতিতে ঘুরছে। তারপর তলিয়ে গেল পানিতে।

বারো

‘আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো,’ বললো কর্নেল রুস্তমভ।

‘হলো,’ বললো রানা।

সোরেৎসেন বারকেইনহেইমারের ইয়ট নিয়ে ওদের তীরে ভেড়ার পর একটা রাত পেরিয়ে গেছে। প্রথম যোগাযোগ করা হয় রানার তরফ থেকে, উদ্দেশ্য: গোটা ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া। কর্নেল রুস্তমভ সাড়া দিলো, আভাস দিয়ে জানালো, মস্কো থেকে ওকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রানার সাথে যোগাযোগ করার। রানা যোগাযোগ না করলে সে-ই যোগাযোগ করতো। এরপর ঘটনার বিবরণ আদান প্রদান করা হলো, সাথে মতামত। তারপর এলো প্রস্তাব। রানা বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার আর রুস্ত মভ কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টারের সাথে পরামর্শ করলো। সবশেষে দেখা-সাক্ষাতের আয়োজন করা হলো। রোডসের ছোট্ট একটা কাফেতে বসেছে ওরা।

‘নিকোলাই প্যাসিমভ কোথায়?’ জানতে চাইলো রুস্তমভ।

‘ক্যাপটেন বোগডানোভিচ, বলতে চাইছো।’

‘তুমি আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছো, বন্ধু।’

'তাহলে ছল-চাতুরি বাদ দাও,' বললো রানা, ওর বলার সুরে কোনো রকম সৌজন্য নেই। 'মিখাইল বোগডানোভিচ তার পরিচয় স্বীকার করেছে। একজন সাক্ষীও আছে।'

'হতভম্ব, দিশেহারা এক লোককে ফাঁদে ফেলেছো তুমি। সে কি বলেছে, গুরুত্ব দিয়ো না। ঘাবড়ে গিয়ে মানুষ প্রলাপ বকে না? কেন তোমার মনে হলো, উনি নিকোলাই প্যাসিমভ নন?'

একটা সিগারেট ধরালো রানা। শান্তস্বরে বললো, 'প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করছিল সে। কে.জি.বি-র হাতে তাকে তুলে দেয়া হোক, তার এই দাবির মধ্যে ভাঁওতাবাজির সুর ছিলো। তোমাদের কাছে নিকোলাই প্যাসিমভ জঘন্য এক লোক, কারণ তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, কিন্তু নেমিসিসে তাকে আমরা দেখলাম ফার্স্ট-ক্লাস কেবিনে। এমন কি দরজাতে তালাও ছিলো না। তবে এ-সবের তেমন গুরুত্ব দিইনি আমি...।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে রানার কথা শুনছে কর্নেল রুস্তমভ, ভোদকা ভরা গ্লাসটার গায়ে হাত বুলাচ্ছে সে, গ্লাসটা যেন তার পোষ মানা আদরের বিড়ালছানা।

রানা বলে চলেছে, 'আমাকে সন্দিহান করে তোলে দুটো ঘটনা।'

'কি কি?' যেন হিসেব চাইছে কর্নেল, নোট করে নিচ্ছে মনের খাতায়।

'গ্রীনের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার। এডওয়ার্ড গ্রীন, এইচআরসি-র তরফ থেকে তথাকথিত নিকোলাই প্যাসিমভের রাখাল। তুমি জানো কিনা জানি না, লোকটা সি.আই.এ-র এজেন্ট ছিলো। সরাসরি একমাত্র এভাবেই সি.আই-এর ভেতরে নাক গলায়।'

'আমি তোমার কাছে ইতিহাস শুনতে চাইনি।'

'নেমিসিসের কার্গো যখন ট্র্যান্সফার করলো অ্যারোনাফিস,' বলে চলেছে রানা, কর্নেলের কথা যেন শুনতে পায়নি, 'গ্রীনকে তখন ছুরি মারা হয়। এটা ধরে নেয়া অযৌক্তিক নয় যে গ্রীন বুঝতে পেরেছিল নেমিসিস কোর্স ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছে। কার্গো খালাসের সময় জাহাজ থেকে পালাবার সুযোগটা নিলো সে, উদ্দেশ্য সি.আই.এ. এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করে সাহায্য চাওয়া।

'কিন্তু মিখাইল বোগডানোভিচ তা হতে দেবে কেন? গ্রীনকে বাধা দিলো সে, অর্থাৎ ছুরি মারলো। গ্রীনের ভাগ্যে এ-ধরনের কিছু একটা ঘটতোই, আগে বা পরে।

'দ্বিতীয় ঘটনার সাথে তুমি জড়িত। বোঝাই যায়, অ্যারোনাফিসের সাথে তোমার একটা চুক্তি হয়। ঠিক হয়, প্যাসিমভকে নেমিসিসে ডেলিভারি দেবে অ্যারোনাফিস–গতকাল। নেমিসিসে তাকে পাওয়া অর্থাৎ নেমিসিসে তার উপস্থিতি তোমাদের জন্যে যেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটার কোনো অর্থ বোঝা যায় না, তিনি যদি সত্যি প্যাসিমভ হন।'

কিছু বললো না কর্নেল, তার নীল সাইবেরিয়ান চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হাসিখুশি রানাকে জরিপ করছে।

সাধারণ একটা কাঠের টেবিলে বসে আছে ওরা। কাফেতে আর শুধু একজন লোক রয়েছে, কুক। কিচেন আর কেবিনের মাঝখানে একটা দেয়াল, দেয়ালের গায়ে ছোট্ট গরাদহীন জানালা, জানালার ওদিকে রান্নায় ব্যস্ত সে। কাফের মালিক, তার স্ত্রী ও

ভাগ্নি, এই তিনজন মিলে ব্যবসাটা দেখাশোনা করে। ভাগ্নিটি সুন্দরী, পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে সে। কর্নেলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনজনই চলে গেছে তারা। একা শুধু কুক রয়ে গেছে, কারণ তাকে চুলোয় চড়ানো রান্নাবান্নার ওপর নজর রাখতে হবে। এ-সব কর্নেলের কাছ থেকে শুনেছে রানা।

ওদের দু'জনের সুটই প্রায় ভিজে বলা যায়, কালকের বৃষ্টি আজও থামেনি। হাতে সময় কম থাকায় ছাতা বা রেনকোট কেনার কথা ভাবেনি ওরা। দু'পক্ষই এই জায়গায় সাক্ষাতের আয়োজন করার জন্যে ন্যূনতম সময়টুকু পেয়েছে শুধু।

খুক খুক কেশে শুধু গলা পরিষ্কার করাই সার, ইতস্তত আর আড়ষ্ট ভাব দূর করা যাচ্ছে না।

কোনো পক্ষই খুশি নয়।

সি.আই.এ. নেপথ্যে ছিলো, সেখানে থেকেই কেটে পড়েছে তারা। পশ্চিমা জগৎ স্বনামধন্য রুশ বিজ্ঞানী নিকোলাই প্যাসিমভকে কোনোদিনই পাবে না, এ-কথা জানার পর চরম হতাশ হওয়ারই কথা তাদের। কে.জি.বি. এডওয়ার্ড গ্রীনের পরিচয় জানা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেনি, এতেই তারা খুশি।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কে.জি.বি-র। দু'ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা। এক ঢিলে কয়েকটা পাখি মারতে গিয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছে শোচনীয়ভাবে। পেরেস্ত্রয়কার কল্যাণে ভিন্নমতাবলম্বীরা বিদেশে পাড়ি জমাবার জন্যে রীতিমতো একটা আন্দোলন শুরু করেছে। দেশ থেকে মেধা পাচার হয়ে যাবার ভয় থেকে কে.জি.বি-র কিছু অফিসারের মাথায় প্ল্যানটা আসে। যেভাবে

হোক আন্দোলনটাকে বানচাল করতে হবে। দেশ থেকে কারা যেতে চাইছে, একবার বেরিয়ে গেলে কি ভূমিকা নেয় তারা, এ-সব নিজেদের ইচ্ছে মতো জনসাধারণকে জানাবার প্ল্যান ছিলো তাদের, দেশের মানুষ যাতে আন্দোলনটার সাথে একাত্মবোধ না করে। কে.জি.বি-র একটা গ্রুপ প্ল্যানটা তৈরি করে, সরকারের ওপরমহলকে কিছু না জানিয়ে। তাদের মিশন সফল হলে কি ঘটতো বলা যায় না, কিন্তু ব্যর্থ হবার পর ব্যাখ্যা দেয়ার ও জবাবদিহি করার একটা কঠিন পরীক্ষা এখন সামনে। ঢাকা থেকে কিছু প্রশ্ন সহ অনুসন্ধান করার ফলে মস্কোর টনক নড়েছে, গোটা ব্যাপারটা জানাবার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কে.জি.বি-কে। রানার ধারণা, রিপোর্ট করার পর আরো কিছু নতুন নির্দেশ পেয়েছে কে.জি.বি., যতোটা সম্ভব ক্ষতি কমিয়ে আনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে তাদেরকে। বোধহয় সেজন্যেই রানার সাথে দেখা করতে উৎসাহ দেখিয়েছে কর্নেল রুস্তমভ। ঢাকা থেকেও সে-রকম ধারণা দেয়া হয়েছে রানাকে।

'দু'ঘন্টা, রানা,' গম গম করে উঠলো কর্নেলের কণ্ঠস্বর।

'জানি। গ্রীক সরকার তার বেশি সময় দিতে রাজি হয়নি আমাদের।'

মোটা, মাংসল হাতটা দ্রুত নাড়লো রুস্তমভ। 'দু'ঘন্টার মধ্যে দেশটা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, তা না হলে ঢুকতে হবে চোদ্দ শিঁকের ভেতর।'

কোনো মন্তব্য না করে কামরাটার চারদিকে আরেকবার তাকালো রানা, সবশেষে বাইরের চৌরাস্তার ওপর চোখ বুলালো। কাফে আর কাফের চারপাশে আধ মাইল জায়গা নিউট্রাল গ্রাউণ্ড বলে একমত হয়েছে দুই পক্ষ। সদলবলে না আসার সিদ্ধান্ত

অনুমোদন করা হয়। প্রাচীন পাথুরে বিল্ডিঙের একটা গথিক খিলানের নিচে কাফেটা। বিল্ডিঙটা গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের আর্চবিশপরা প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার করতেন, তুর্কীরা বিজয়ী হবার আগে পর্যন্ত। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ইহুদী শহীদ সড়ক দেখা যাচ্ছে। উনিশশো তেতাল্লিশ সালে জার্মান সৈন্যরা এই রাস্তার ওপর দু'হাজার ইহুদিকে জড়ো করে, থার্ড রাইখের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর জন্যে। চৌরাস্তার মাঝখানে টালি দিয়ে ছাওয়া একটা ফোয়ারা রয়েছে, একজোড়া ব্রোঞ্জের তৈরি সিন্ধু-ঘোটকের মুখ থেকে বেরোচ্ছে পানির বিপুল ধারা। দৃশ্যটা ট্যুরিস্টদের খুব প্রিয়।

রুস্তমভ বললো, 'আমি একা এসেছি। সেই কথাই ছিলো। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?'

'না,' বললো রানা। প্রতিবাদ জানাতে গেল রুস্তমভ, বাধা দিলো রানা। 'তবু আমরা কাজ শুরু করতে পারি,' বললো ও।

পাবলিক ওয়াল-ফোনের দিকে এগোলো রানা। নীল বাক্সে খুচরো পয়সা ঢুকিয়ে ডায়াল করলো। ভুলেও রুস্তমভের দিকে পিছন ফিরলো না ও। 'চন্দন?' জিজ্ঞেস করলো। 'নিয়ে এসো ওকে।'

'আসছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো রুস্তমভ। রানার মুখে কি যেন খুঁজলো সে।

'কাছাকাছি আছে ওরা, এখুনি পৌঁছে যাবে,' বললো রানা।

ম্লান মুখে ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালো কর্নেল। 'তোমাকে আমি বললাম, প্যাসিমভ দেশে ফিরে যেতে চান। কথাটা যদি বিশ্বাস করতে, ব্যাপারটা এতো জটিল আর তিক্ত হয়ে উঠতো না, অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যেতো। তুমি হয়তো বিশ্বাস করো

না, কিন্তু সত্যি কথা বলছি, তোমার সাথে লাগতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না...।'

'এখনো তুমি ভান করবে লোকটা প্যাসিমভ?'

'অফ কোর্স।'

'এমন গাড়ল তো দেখিনি,' রাগের সাথে বললো রানা। 'এতো করে বলছি, বোগডানোভিচ সব উগরে দিয়েছে! ওটা বাদ দিয়ে তুমি বরং এক জাহাজ ইয়েলোকেক-এর ব্যাখ্যা দাও।'

'হো হো? ব্যাখ্যা দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই আমার! তবু বলছি, তোমার কি বিশ্বাস হয়, ইউরেনিয়ামের মতো একটা পদার্থ অ্যারোনাফিসকে সাপ্লাই দেবো আমরা, সে যাতে একদল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনালের হাতে তুলে দেয় জিনিসটা?' চোখ সরু করে চেহারায় জ্ঞানতাপসের ভাব আনলো রুস্তমভ। 'আমাদের একটা প্রবাদে বলা হয়...'

'রেহাই দাও!' টেবিলে ফিরে এসে বসলো রানা। ঝুঁকে পড়লো রুস্তমভের দিকে। 'শুরু থেকেই জানতে তোমরা, অ্যারোনাফিস তোমাদের কাছ থেকে ইউরেনিয়াম কিনতে চাইছে লিমবেরিতে সাপ্লাই দেয়ার জন্যে, ইটালিতে নয়। শুধু তাই নয়, এ-ও তোমরা অনেক আগে থেকে জানতে যে এইচআরসি নিকোলাই প্যাসিমভকে রাশিয়া থেকে বের করে নিয়ে যাবার প্ল্যান করেছে।'

'তোমার কমনসেন্স কি বলে? এ-ধরনের একটা কিছু ঘটতে দিতে পারি আমরা?' চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল। 'তাছাড়া, ইউরেনিয়াম বিক্রি বা দান করা নিষিদ্ধ রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। বলছো, কে.জি.বি-র কাছ থেকে

ইউরেনিয়াম কিনতে চেয়েছে অ্যারোনাফিস–কি বলছো নিজেই জানো না। কে.জি.বি. কি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাকি? ইউরেনিয়াম কোথায় পাবো আমরা?' হঠাৎ হাসলো রুস্তমভ। 'আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, মিশরে তোমাকে যে ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া এখনো তুমি কাটিয়ে উঠতে পারোনি। মনে বিরূপ প্রভাব পড়লে অনেক সময় আজেবাজে কল্পনা...।'

'ইউরেনিয়াম যোগাড় করা কে.জি.বি-র জন্যে কঠিন কিছু নয়,' বললো রানা। 'পরিমাণটা যখন নেহাতই সামান্য। সে যাই হোক...অ্যারোনাফিস আর এইচআরসিকে থামাতে পারতে তোমরা, সে ইচ্ছে যদি তোমাদের থাকতো।'

'কি বলতে চাইছো?'

'তোমরা চাওনি লোকে বিশ্বাস করুক প্যাসিমভ রাশিয়ায় আছেন, তোমরা চেয়েছিলে সবাই জানুক আফ্রিকায় আছেন তিনি,' বললো রানা। 'ইউরেনিয়াম রাশিয়ায় ফেরত নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে, নেমিসিস কৃষ্ণ সাগরের পথ ধরতো, রোডসের নয়। ওখানে তোমরা নেমিসিসকে পাঠালে স্রেফ একজন লোককে তুলে নেয়ার জন্যে, এটা বিশ্বাস্য নয়–বিশেষ করে তাকে যখন প্লেনে করে রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো পানির মতো সহজ কাজ ছিলো। জাহাজটা আবার সুয়েজ ক্যানেলের দিকে এগোলো। তোমাদের প্ল্যানের মূল ব্যাপারই ছিলো, ভুয়া প্যাসিমভ অর্থাৎ বোগডানোভিচকে নেমিসিসে থাকতে হবে।'

রুস্তমভের চেহারা ক্যারিকেচার হয়ে উঠলো। 'দাঁড়াও হে, বুঝতে দাও কি বলতে চাইছো তুমি–আমরা চেয়েছি ইউরেনিয়াম আর প্যাসিমভকে নিয়ে লিমবেরিতে চলে যাক নেমিসিস? কি ব্যাপার, রানা, সত্যি তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

‘লোকটা বোগডানোভিচ, প্যাসিমভ নন। তবে বোগডানোভিচকে বাকি জীবন প্যাসিমভের ভূমিকায় অভিনয় করতে হতো।’

‘হুম। ভারি গোলমেলে, কমরেড রানা।’

‘আমার ধারণা, সবই তোমার কাছে পরিষ্কার।’

‘তারপর কি?’

‘লিমবেরির চারদিকে অন্যান্য রাষ্ট্র, অর্থাৎ শুধুই মাটি, তার কোনো উপকূল নেই, নেই বন্দর। তার মানে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো বন্দর থেকে লিমবেরিতে পাঠানো হতো ইউরেনিয়ামের চালানটা, বিশেষ করে ওই একটা দেশের সাথেই যখন লিমবেরির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। চালানটা বন্দর থেকে রওনা হওয়া মাত্র হুইসেলে ফুঁ দিতো কে.জি.বি.। অ্যাসাইনমেন্ট সফল হতে যাচ্ছে দেখে কে.জি.বি. সোভিয়েত সরকারকে সব কথা খুলে বলতো, পছন্দ করুক বা না করুক, কে.জি.বি. প্ল্যান অনুসারে নাচতে হতো প্রশাসনকে। মিথ্যে কথা বলে অর্থাৎ ইটালিয়ান ইণ্ডাস্ট্রির নামে ইউরেনিয়াম কিনেছে লিমবেরি, সোভিয়েত সরকার সঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারতো যে জিনিসটা চুরি গেছে।’

‘কিন্তু বোগ…প্যাসিমভ সম্পর্কে ব্যাখ্যাটা কি?’

‘আগেই বলেছি, এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার প্ল্যান ছিলো তোমাদের,’ বললো রানা। ‘ভুয়া প্যাসিমভ সম্পর্কে তোমরা বলতে, তোমাদের অজ্ঞাতে লিমবেরিতে পালিয়েছে সে, উদ্দেশ্য হলো সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুর লিমবেরিকে পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে সাহায্য করা।’

জিভ আর টাকরা সহযোগে বিচিত্র শব্দ করলো রুস্তমভ।

‘ফ্যান্টাসী আর বলে কাকে! তুমি আমার পুরনো দোস্ত, কিন্তু আগে কখনো এই অবস্থায় দেখিনি তোমাকে।’ মাথার চুলে আঙুল চালালো সে, নিচু গলায় আবার বললো, ‘তোমার আসলে সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট দরকার।’

‘যা ঘটেছে, তার আর অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই,’ শান্ত গলায় বললো রানা।

হেসে উঠলো রুস্তমভ। টেবিলের ওপর চাপড় মারলো সে, তারপর হাতটা টেনে নিলো নিজের দিকে, যেন বাজির জেতা টাকাগুলো কাছে আনছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ‘কিন্তু কেন? এ-ধরনের পাগলামি কেন আমরা করতে যাবো?’

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। ‘ভিন্নমতাবলম্বীদের আন্দোলন। সোভিয়েত সমাজে আন্দোলনটা একটা ক্ষতের সৃষ্টি করছে। তোমরা কে.জি.বি-র একটা বিদ্রোহী গ্রুপ, আন্দোলনটাকে ব্যর্থ করার একটা সুযোগ দেখতে পাও। যদি প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে ভিন্নমতাবলম্বীদের একজন নেতা আসলে সুযোগসন্ধানী উন্মাদ, তাহলে তোমরা দাবি করতে পারো বাকি সবাইও তাঁর চেয়ে আলাদা কিছু নয়। ঘটনাটাকে তোমরা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে। অথচ বেচারি নিকোলাই প্যাসিমভ আজ এগারো মাস হলো মারা গেছেন।’

‘হোয়াট!’ কর্নেলের চোখে অকৃত্রিম অবিশ্বাস।

‘ঢাকার সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে, তুমি জানো না?’

‘গল্প তোমরা ভালোই বানিয়েছো দেখছি!’ জোর করে হাসলো কর্নেল।

‘বোগডানোভিচ বাকি জীবন পশ্চিমা জগতে থেকে যেতো,

প্যাসিমভের ভূমিকায়,' বললো রানা। 'কে.জি.বি-র একজন যোগ্য এজেন্ট, পশ্চিমা জগৎকে প্রচুর মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করতো সে। কয়েক বছর বা কয়েক যুগ পর হয়তো, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলে, তোমাদের সাথে যোগাযোগ করতো। পশ্চিমা জগৎ কি করছে না করছে, তার মাধ্যমে সব তোমরা জানতে পারতে। একটা কথা স্বীকার করি,' হাসলো রানা, 'তোমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি করে দিয়েছি আমি।'

মাথা নিচু করে গ্লাসে ভোদকা ঢাললো কর্নেল। 'কাহিনীটা সত্যি ইন্টারেস্টিং, সন্দেহ নেই,' বললো সে। 'তবে দুঃখজনক হলো, ধোপে টেকে না।'

'তাই?'

'ইউরেনিয়াম। লিমবেরিকে ও-জিনিস আমরা দিতে পারি না, কারণ ভালো করেই জানি যে তা ব্যবহার করা হবে আমাদের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠা গেরিলা সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে। না, কক্ষনো না!' ঘন ঘন মাথা নাড়লো সে।

'লিমবেরিকে তোমরা দিচ্ছিলে না আসলে,' বললো রানা। 'চালানটা লিমবেরিতে পৌঁছুনোর আগেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে তোমরা চাপ দিতে, হয় ওরা জিনিসটা নষ্ট করে ফেলতো, না হয় ফেরত পাঠাতো রাশিয়ায়। তোমাদের একটা উপকার করার সুযোগ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অবশ্যই হাতছাড়া করতো না।'

'তবু যদি, ধরো, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাখ্যান করতো আমাদের অনুরোধ?'

'তবু বলবো, আসলে কোনো ঝুঁকিই তোমরা নাওনি।'

'কি?' বিস্মিত হবার ভান করলো কর্নেল।

'ইউরেনিয়াম ছিলোই না, বা থাকলেও তার পরিমাণ নেহাতই সামান্য। কোনোমতেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণ বলা চলে না। ব্যারেলগুলো ভরা হয়েছিলো বালি দিয়ে। শুধু ওপর দিকে সামান্য ইউরেনিয়াম দেয়া হয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দর কর্তৃপক্ষকে বোকা বানাবার জন্যে। বি.সি.আই. ডাইভাররা কাল নেমিসিসে নামছে, তখন আরো ভালো ভাবে প্রমাণ করা যাবে।'

'কিন্তু তুমি তা জানলে কিভাবে?' চমকে গেল রুস্তমভ।

'উপকূল থেকে খানিক দূরে একটা ব্যারেল দেখতে পাই আমি, অ্যারোনাফিসের ভিলার কাছাকাছি। ব্যারেলটায় বেশিরভাগই বালি ছিলো। প্রথমে ভেবেছিলাম, সাগরের তলা থেকে ব্যারেলে ঢুকেছে। কিন্তু পরে দেখি, সাগরের তলায় বালি বলতে কিছু নেই, শুধু কোরাল আর পাথর।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো কর্নেল।

দোরগোড়ায় উদয় হলো চন্দন আর সাযযাদ, ওদের মাঝখানে মিখাইল বোগডানোভিচ। দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, রানার নির্দেশের অপেক্ষায়।

'অ্যারোনাফিস লিমবেরির সাথে বেঈমানী না করলে,' কর্নেলকে বললো রানা, 'অর্থাৎ সে যদি ইউরেনিয়ামটা হাইজ্যাক না করতো, তোমাদের প্ল্যানটা সফল হতে পারতো। কিন্তু কি আর করবে, বিধি বাম!'

চন্দনের হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে, স্লিঙের সাথে ঝুলছে সেটা। বোগডানোভিচের আঙুলের গিঁটগুলোতেও ব্যাণ্ডেজ। কে.জি.বি. এজেন্টের চেহারা ঝুলে আছে, ভিজে জ্যাকেট থেকে পানি ঝরছে। চোখে অনিশ্চিত ভাব।

গরাদহীন জানালা দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কুক।

চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে সিধে হলো কর্নেল রুস্তমভ, তার চোখ দুটো জ্বলছে। 'বুঝেছি!' গর্জে উঠলো সে। 'তাহলে এই আপনার কীর্তি, নিকোলাই প্যাসিমভ? বেঈমান, বেজন্মা!'

বিস্ময়ে চোখ পিট পিট করলো বোগডানোভিচ, তবে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ধরতে পারলো সে। 'ইয়েস, কমরেড,' বললো সে।

ঘরের ভেতর যেন বজ্রপাত হলো। বুলেটের ধাক্কায় বোগডানোভিচের ফুসফুস থেকে হুস করে বাতাস বেরিয়ে এলো। সাথে সাথে মারা গেছে সে, মেঝেতে পড়ার আগেই, হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে বুলেট। গুলির শব্দটা রানার ঘাড় যেন কাফের পিছন দিকে মুচড়ে দিলো, হাতটা পৌঁছে গেল নিজের পিস্তলে। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছে চন্দন আর সাযযাদ, তবে সংবিৎ ফিরতেই যার যার অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ালো তারাও।

'এক ইঞ্চি কেউ নড়লে, মারা যাবে সে!' চিৎকার করলো কুক।

তার দিকেই তাকিয়ে আছে রানা, লোকটার হাতের পিস্তল জানালার ফ্রেমে ঠেকে আছে।

নিজের জায়গায় স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল রুস্তমভ, চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে বোগডানোভিচের দিকে। তারপর লাশটার দিকে পিছন ফিরলো সে, যেন কুকের নির্দেশ তার জন্যে প্রযোজ্য নয়।

লাশের দিকে রুস্তমভকে পিছন ফিরতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো রানা। 'কেন, রুস্তমভ?' জানতে চাইলো ও।

'নিকোলাই প্যাসিমভ বলে কারো যখন কোনো অস্তিত্বই নেই, আমার দেশ তাকে বহন করার খরচটা কেন দিতে যাবে?' রানার

দিকে না ফিরেই পাল্টা প্রশ্ন করে জবাব দিলো কর্নেল। 'যার অস্তিত্বই নেই, তার তো আর বিচার হতে পারে না।'

'তাহলে অস্তিত্ব নেই ক্যাপটেন মিখাইল বোগডানোভিচেরও?'

'কোনো কালেই ছিলো না।'

কে.জি.বি. এজেন্ট দু'জন পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কুকের ইউনিফর্ম পরা লোকটা কাভার দিলো কর্নেল রুস্তমভকে, রুস্তমভ বেরিয়ে যাবার পর পিছু হটে সে-ও বিদায় নিলো।

চোখে বিস্ময় আর প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকালো চন্দন আর সাযযাদ।

'একটা কথাও স্বীকার করেনি সে,' বললো রানা।

'কিছুই না?'

'মস্কোর কড়া নির্দেশ আছে তার ওপর,' বললো রানা।

সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা ঋণ শোধ করতে হবে রানাকে। অথচ সময় আছে আর মাত্র দেড় ঘন্টা।

পুরনো ইটালিয়ান এক ভিলার উঠনে দাঁড়িয়ে আছে ও, ভারি দরজায় টোকা দিলো।

বৃষ্টি থেমেছে বটে, তবে চারদিক থেকে ভেসে আসছে পানি নামার শব্দ। ঠাণ্ডা, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, বাতাসে ফুলের গন্ধ। আকাশ যেন রূপোর তৈরি ছাদ।

দরজা খুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো মিলি। চোখের পানিতে ভিজে আছে তার মুখ। দরজার ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, কারণ সবগুলো পর্দা ঝুলছে। 'কি চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

দপ করে জ্বলে উঠলো মিলির চোখ। 'কেন? কারণটা কি এই যে তোমার জানা নেই, খদ্দেরদের কাছ থেকে কতো নিই আমি?'

'কথাটা রাগের মাথায় বলেছিলাম, নাকি মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল, এখন আর ঠিক মনে করতে পারছি না,' বললো রানা। 'তবে সেজন্যে আমি ক্ষমা চাই।'

'চলে যাও তুমি!' মিলির চিৎকারে ব্যথা আর অভিমান মাথা কুটছে। দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু বাধা দিলো রানা। 'তুমি আমাকে নষ্টা মেয়ে বলেছো! বলেছো আমি নাকি শরীরটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছি!' চিৎকার জুড়ে দিলো সে, মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'বললাম তো, আমি দুঃখিত।'

স্থির চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো মিলি। পায়ে জুতো নেই, লো-কাট ড্রেস পরে আছে, ব্যাকলেস। তার দীর্ঘ কালো চুল কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে চলে এসেছে, ঝুলে আছে নাভির দু'পাশে।

'তুমি কাঁদছিলে,' বললো রানা, জিজ্ঞেস করলো, 'প্যাসিমভের জন্যে?'

'না। ওই ব্যাপারে কেন যেন...আমার কোনো অনুভূতি নেই।'

'আর অ্যারোনাফিস?'

'সে তো একটা দুঃস্বপ্ন ছিলো, শুধু বুঝতে দেরি হয়েছে আমার। অসম্ভব, তার জন্যে কারো শোক হতে পারে না।'

নরম আঙুল দিয়ে মিলির চিবুকটা উঁচু করলো রানা। 'তাহলে?'

'ভাবিনি তুমি আবার আমাকে দেখতে চাইবে। মনে হচ্ছিলো, তুমি একটা নির্দয় পাষাণ!' হঠাৎ সেই আগের স্বভাব ফিরে পেলো

মেয়েটা।

রানাকে দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করলো সে। ওর গলা ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো। 'রানা, আমাকে ক্ষমা করার সম্ভাবনা সত্যি আছে কি?'

'আমি একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করতে এসেছি,' মিলিকে ধরে রেখে বললো রানা।

মুখ তুললো মিলি, দুটো মুখ খুব কাছাকাছি, পরস্পরের নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছে ওরা। 'কি?' জানতে চাইলো মিলি।

উঠনের একধারে বাগান, সেদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলো রানা। 'জায়গাটা মন্দ নয়। অনেক ফুলও ফুটে আছে।' লিনডোসে দেয়া মিলির প্রতিশ্রুতি ভোলেনি ও।

রানাকে নিজের শরীরের সাথে পিষে ফেলতে চাইলো মেয়েটা। 'একটা প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম বটে, ডার্লিং রানা, কিন্তু তার আগে বলো, কেউ আমাদের ধাওয়া করছে না তো? আমাদের মাথার ওপর কুৎসিত মৃত্যু ঝুলে নেই তো?'

'আমার হাতে সময় আছে মাত্র দেড় ঘন্টা, তারপর আমাকে হয় প্লেন ধরতে হবে, নয়তো জেলে ঢুকতে হবে,' বললো রানা।

'তাই? এটাও কম বিপদ নয়,' বললো মিলি, গলার স্বর খসখসে। 'কারণ তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, মাসুদ রানা, নির্ঘাত তুমি প্লেন মিস করবে।' রানাকে ভেতরে টেনে নিলো সে, পায়ের ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করলো রানা।

মনে হলো ঝুঁকি নেয়াটা পোষাবে।

***

মাসুদ রানা-১৭৯

বিষকন্যা-২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

কায়রো থেকে ফিরেই আবার
বিপদে পড়লো রানা। আবার সেই কর্নেল রুস্তমভ।
অযাচিতভাবে রানাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো
বিদেশ-বিভুঁইয়ে কে এই বাঙালী যুবক?

অতিচালাক ডাচ জর্জ—পাওয়ার কথা গলায় দড়ি,
পেল বুলেট।
মিলিকে নিয়ে আরেকবার পালাবার চেষ্টা করলো রানা।
কিন্তু রহস্যময়ী যুবতী, পালিয়ে গেল ফাঁকি দিয়ে।

খোলা সাগরে আক্রমণ করলো রানা ওদের ইয়ট।
এবং সবশেষে মুখোমুখি হলো রুস্তমভের।
তারপর?

বাইশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০